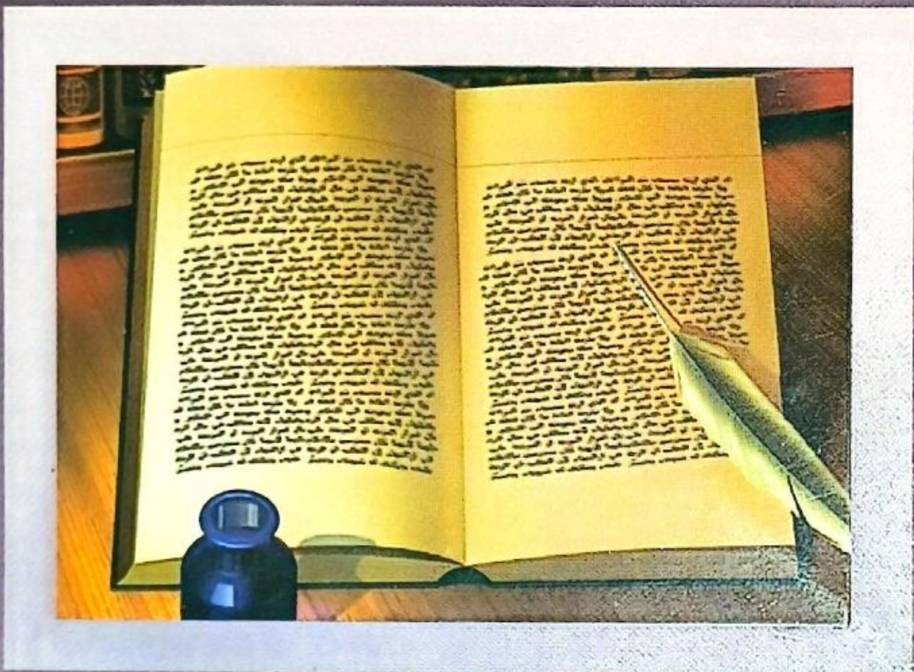
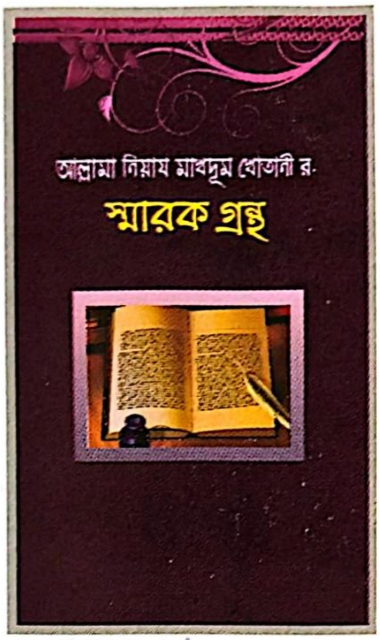
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

স্মারক গ্রন্থ



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

স্মারক গ্রন্থ



সংকলন ও সম্পাদনায়

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

সম্পাদক, মাসিক নতুন বিকাশ

দারুননাজাত প্রকাশনী

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা- ১৩৬১

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.
স্মারক গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৫ ঈসায়ী

প্রকাশনায়
দারুননাজাত প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ আল ইমরান

কম্পোজ
জুনাইদ আহমাদ
মুহাম্মাদ জান্নাতুন নাঈম

বর্ণ বিন্যাস
মানসুর আহমাদ

মূল্য
৩৫০.০০ টাকা মাত্র

Allama Niaz Makhdum Khutani R. Smarak Grontho
Published by Darunnazat Prokasoni, First Publication 2015,
Price : 350 Taka.

উৎসর্গ

বাংলাদেশের প্রথম কামিল মাদরাসা ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামিয়া-ই-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ওলীয়ে কামেল আল্লামা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. এর স্মৃতির উদ্দেশে– যিনি শাইখুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কে প্রথম এদেশে নিয়ে এসেছিলেন।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত বাণী ইলমে হাদীসের নিরলস সাধক অলীয়ে কামেল আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. স্মরণে প্রণীত স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর আলীশান দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন সমকালীন বিশ্বের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম, সীরাত, আদব, ইতিহাস, জোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী অলীয়ে কামেল শাহ সূফি নেছারুদ্দীন র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম টাইটেল মাদরাসা ছারছীনা শরীফে সুদীর্ঘ ৪১ বছর প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ইলমে হাদীসের অনন্য ও অকৃত্রিম খেদমতে।

বর্তমান চীন প্রজাতন্ত্রের সিনকিয়াং প্রদেশের খোতান অঞ্চলে ১৯১৪ সনে আল্লামা খোতানীর জন্ম। স্থানীয় খালাক মাদরাসায় প্রথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ কাশগড়ে অধ্যয়নকালে দেশ ও ঈমান রক্ষায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যে আপন মেধা, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের বলে একটি বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত হন। খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এই অকুতোভয় সেনানায়ক। সাথী মুজাহিদদের অনেকেই শাহাদাত বরণ করলেও আল্লাহর অশেষ রহমতে জীবন রক্ষা পেয়ে আল্লামা খোতানী র. হিজরত করলেন ভারতে। এরপর ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ দারুল উলূম দেওবন্দে যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে দীনের সোহবতে ইলম অর্জনের জিহাদে নিয়োজিত রাখলেন নিজেকে। ১৯৪৫ সনের জুন মাস থেকে ১৯৮৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলার আজহার খ্যাত পুণ্যভূমি ছারছীনা শরীফে ইলমে হাদীসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

আল্লামা খোতানীর জন্ম, জন্মস্থান, ইলম অর্জন, জিহাদ, হিজরত, হাদীসে নববীর দরস দান সবই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর স্বর্ণজ্বোল অধ্যায়। তাছাড়া তাঁর ইলম, তাকওয়া, আখলাক মুসলিম উম্মাহ এর জন্যে এক অনুসরণীয় আদর্শ। তাই দীন ও মিল্লাতের প্রয়োজনেই আল্লামা খোতানীকে জানা দরকার।

আল্লামা খোতানী র. ইন্তেকাল করেছেন ২৮ বছর আগে; কিন্তু তাঁকে নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রকাশনা তুলনামূলক কমই হয়েছে। যা সত্যি দুঃখজনক। আল্লামা খোতানী র. ইন্তিকালের পর তার স্মৃতিকে অম্লান রাখতে, তাকে নিয়ে গবেষণা করার মহান উদ্দেশে তাঁর ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নিয়ায মাখদূম স্মৃতি সংসদ', 'নিয়ায মাখদূম সেবক সমিতি'। আর পরবর্তীতে আল্লামা খোতানীর শাগরিদদের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল্লামা নিয়ায মাখদূম রিসার্চ একাডেমি। অত্র একাডেমি প্রায় প্রতি বছর খোতানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার, আলোচনা সভা, ঈসালে সাওয়াব মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। এ একাডেমির অঙ্গীকার ছিল একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের। রিসার্চ একাডেমির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আজ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত। ফলে আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে এ গুরুদায়িত্ব পালনে তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ নালায়েকের রিসার্চ একাডেমিসহ আল্লামা খোতানী-কেন্দ্রীক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের অদ্যবধি সুযোগ হয়েছে। বর্তমানে বয়সের তুলানায় শারীরিক অসুস্থতা অনেক বেশি। তাই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের তাড়া অনুভব করছি হৃদয়ের গভীর থেকে। নিজের অযোগ্যতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্মারকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ ১৯৮৭ সনে দৈনিক ইনকিলাবে, দুটি প্রবন্ধ অগ্রপথিকে এবং তিনটি প্রবন্ধ পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সাতটি প্রবন্ধ রিসার্চ একাডেমি আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে পঠিত এবং সতেরটি প্রবন্ধ স্মারকে প্রকাশের উদ্দেশে বিভিন্ন লেখকের নিকট থেকে সংগ্রহ করা। আমার জানামতে আল্লামা খোতানীর ওপরে রচিত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রায় সকল প্রবন্ধ স্মারকে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য শুকরিয়া মহান আল্লাহর দরবারে। খোতানীর স্মরণে চারটি কবিতা, তাঁর প্রিয় শাগরেদ ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমানের কাছে খোতানী হুজুরের হস্তলিখিত কয়েকটি পত্র ও আল্লামা খোতানীর মুখনিঃসৃত তাকরীর তার শাগরেদ অধ্যক্ষ কাফিলুদ্দীন সরকার কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার রত্নসম অমূল্য তাকরীর সংরক্ষিত আছে, যার মধ্য থেকে থেকে নমুনাস্বরূপ তিনটি হাদীসের আংশিক তাকরীরও মুদ্রিত হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুস্তাফিজুর রহমানের "মুজাহিদ, মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র." খোতানীর ইন্তেকালের পর জাতীয় দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রথম তথ্যবহুল নিবন্ধ।

আমার প্রিয় উস্তাদ মুফতী আ.ম.ম.আহমাদুল্লাহ মাদারীপুরী হুজুরের লিখিত "উস্তাযুনাল মুকাররাম শামসুল উলামা আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র." প্রবন্ধটি আল্লামা খোতানীর একজন সেরা ছাত্র হিসেবে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের যথাযথ মূল্যায়ন। লেখাটি আমাদের কামিল পরীক্ষা উপলক্ষে ১৯৮৯ সনের বিদায়ী স্মারকে প্রকাশিত হয়েছিল। মাদারীপুরী হুজুর ছিলেন আল্লামা খোতানীর প্রথম পর্যায়ের সুযোগ্য ছাত্র, দীর্ঘ দিনের সহকর্মী এবং নিয়ায মাখদূম সেবক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

আল্লামা খোতানীর মেঝ মেয়ে আমাদের প্রিয় বোন মুহতারামা খালেদা সিদ্দীকা "আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ইলমের নূরে উদ্ভাসিত আল্লামা নিয়ায মাখদূম এর কর্মজীবন" শীর্ষক নিবন্ধে তার তীক্ষ্ণ মেধা-মননের পরিচয়ের সাথে সাথে ব্যক্তিজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লামা খোতানী চরিত্রের বহু দিক উপস্থাপন করেছেন, যা ভাবাবেগপূর্ণ।

মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আল্লামা খোতানীর ইরাক সফরের স্মৃতিচারণ করে আল্লামা খোতানীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, "অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী আল্লামা খোতানী" নামে। প্রবন্ধটি অগ্রপথিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

অধ্যাপক আখতার ফারুক বিরচিত "আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী" শীর্ষক প্রবন্ধটি শিক্ষক হিসেবে আল্লামা খোতানীর পাণ্ডিত্যকে সমসাময়িক সময়ের তুলনামূক বিশ্লেষণ। এটিও অগ্রপথিকে ছাপা হয়েছিল।

মাওলানা রূহুল আমীন খান দৈনিক ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয়তে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র কলামে আল্লামা খোতানী স্মরণে লিখেছেন বিশেষ তথ্যবহুল প্রবন্ধ "মহান মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র."।

অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম.ইয়াহইয়ার রহমানের "আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী" ও "উপমহাদেশে আল্লামা খোতানীর হিজরতের প্রেক্ষাপট ও আজকের মুসলিম বিশ্ব" প্রবন্ধ দুটি রিসার্চ একাডেমির সেমিনারে পঠিত। এছাড়া "আল্লামা নিয়ায মাখদূম : বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধটিও ড. ইয়াহইয়া কর্তৃক লিখিত, যা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৯৯৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ড. এ.এইচ.এম.ইয়াহইয়ার রহমান

আল্লামা খোতানীর অত্যন্ত স্নেহভাজন একজন ছাত্র। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আল্লামা খোতানীর মানবীয় গুণাবলির বর্ণনার সাথে সাথে তার হিজরতের প্রেক্ষাপট ও সমকালিন মুসলিম বিশ্বের করুণ অবস্থা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে।

অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী কাফিল উদ্দীন সরকারের "ছারছীনা মাদরাসা এবং শাইখ খোতানী" শীর্ষক প্রবন্ধটি স্মারকের জন্যে লেখা। যাতে আল্লামা খোতানীর দরসগাহ ছারছীনা মাদরাসার সার্বিক পরিচিতি, আল্লামা খোতানীর দরসের অনুপম পদ্ধতি সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন আল্লামা খোতানীর এ যোগ্য ছাত্র।

অধ্যাপক এ.কিউ.এম.ছিফাতুল্লাহ বিরচিত "আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী" ও "হাদীস বিজ্ঞানের নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী" দুটি প্রবন্ধই রিসার্চ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত। প্রবন্ধ দুটিতে আদর্শ শিক্ষকের যাবতীয় গুণাবলিসম্পন্ন আল্লামা খোতানীর চরিত্র বিশ্লেষণের সাথে সাথে হাদীস প্রচারে তার অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায়।

প্রখ্যাত আলিমে দীন মাওলানা ফরীদ উদ্দীন আত্তার রচিত রিসার্চ একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে সেমিনারে পঠিত "উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রচারে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী ও তার জিহাদী প্রেরণা" একটি ভিন্নধর্মী প্রবন্ধ। মাওলানা আত্তার সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শিরোনামে জিহাদী প্রেরণা সংযোজন বিষয়ে তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছিলেন। উক্ত নিবন্ধে তিনি আল্লামা খোতানীকে আওলাদে রাসূল হিসেবে উল্লেখ করে জিহাদের বর্ণনা এবং ইলম হাসিল ও ইলম শিক্ষা দানকে জিহাদের নিরীখে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের "বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর অবদান" রিসার্চ একাডেমিক কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ আল্লামা খোতানীর প্রথম জীবনী গ্রন্থকার। তিনি বাংলাদেশে হাদীস প্রচারে সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরে এককালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার হাদীসের প্রচারের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন আল্লামা খোতানীকে।

তরুণ ব্যারিস্টার এ বি এম ছিদ্দীকুর রহমানের "আল্লামা খোতানীর জন্মস্থান ও জিহাদ : একটি অনুসন্ধান" প্রবন্ধে কেন আল্লামা খোতানীকে খোতানী, তুর্কীস্থানী,

চীনা হুজুর বলা হয়, কোথায় জিহাদ করেছিলেন– ভৌগোলিকভাবে ইতিহাসের আলোকে উল্লিখিত কৌতুহলপূর্ণ বিষয়সমূহের সন্ধান মিলবে উক্ত নিবন্ধে ইনশাআল্লাহ।

ড. সৈয়দ শরাফত আলী, মাওলানা আব্দুল হালীম শরীফ স্মৃতিচারণ করেছেন আল্লামা খোতানীর। দুজনেই আল্লামা খোতানীর প্রিয় ও মেধাবী শাগরেদ। দীর্ঘদিন খোতানী হুজুরের সোহবত-প্রাপ্তির ও খেদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আল্লামা খোতানীর মহান আখলাকের অন্তরঙ্গ বর্ণনা করেছেন তারা।

ড. মোহাম্মদ আবু সালেহ পাটওয়ারী স্মারকের জন্যে লিখেছেন "মহান জ্ঞান সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র."। তিনি ইলমের বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, আল্লামা খোতানী ছিলেন ইলমে হাকীকির এক মহান সাধক।

ড. মুহাম্মদ মাসউদ আল মাহাদী ছোট বয়সে আল্লামা খোতানীকে দেখার স্মৃতিচারণ করেছেন "স্মৃতির পাতায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী" শীর্ষক প্রবন্ধে।

জনাব এ.বি.এম. ছাইফুদ্দীন ইয়াহইয়ার "কুঁড়ানো মাণিক হারিয়ে গেল" ও অধ্যক্ষ হাফেজ জালালুদ্দীনের "সত্যের সাধক আল্লামা খোতানী" তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের ছাত্রজীবনের লেখা। সে সময় খোতানীর ওপর তেমন কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি। সময় বিবেচনায় এ লেখা দুটোর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

মাওলানা এ.এস.এম.আতহারুদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন– "যুগের ইমাম বুখারী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী"। আহমদাবাদীর স্মৃতিচারণে অনেক ইতিহাস-তত্ত্ব উঠে এসেছে। বিশেষত ছারছীনা মাদরাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস আল্লামা খোতানীর বন্ধু শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুস সাত্তার বিহারীর সাথে ১৯৮২ সনে ভারতের পশ্চিম চম্পারন বেতিয়া শহরে নিজ বাসস্থানে সাক্ষাতের বর্ণনা– এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আমার প্রিয় ছাত্র মাকছুদুল হকের "খোতানীর র. যুগে খোতানের চিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আল্লামা খোতানী র. যে করুণ প্রেক্ষাপটে স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে হিজরত করেছেন, তা অনেকটা অনুভব করা যায়। একমাত্র মাওলানা মাকছুদ আল্লামা খোতানীর ওপর এম.ফিল ডিগ্রি নেয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

অধ্যক্ষ খালিদ সাইফুল্লাহ শিশু বয়সে নিজ বাড়িতে আল্লামা খোতানীর স্নেহ, দুআ ও সোহবতের বরকতপূর্ণ স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন– "হাদীসে নববীর এক মহান খাদেম আল্লামা খোতানী র."।

সদা চঞ্চল, লেখালেখি ও গবেষণায় দীনী খেদমতের স্বপ্নে বিভোর দারুননাজাতের তরুণ শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ জান্নাতুন নাঈম। আল্লামা খোতানীর জীবনগ্রন্থ ও স্মারকগ্রন্থ প্রণয়নে প্রচুর মেধা ও সময় দিয়েছে। আমার সাথে, কখনো একাকী, আবার কখনো বন্ধু-বান্ধবসহ অশ্রুভেজা নয়নে অনেক সময় সে অতিবাহিত করেছে আল্লামা খোতানী র. এর মাযার যিয়ারতে। সেই আবেগ থেকে লিখেছে– "খোতানী হুজুরের মাযারে কিছুক্ষণ"।

আল্লামা খোতানী ভবনে বুখারী শরীফের দরস প্রদানকারী বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ আল্লামা খোতানীর ওপর আরবী ভাষায় এক তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করে নাম দিয়েছেন– فضل الله الغني في ترجمة نياز مخدوم الخوتني رحـ. আরবী ভাষা-ভাষী পাঠকদের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রবন্ধটি স্মারকে ছাপা হয়েছে।

তরুণ গবেষক জনাব মুহাম্মাদ বদরুজ্জামান রিয়াদ স্মারকে প্রকাশের জন্যে আল্লামা খোতানীর জীবন ও কর্মের ওপর ইংরেজি ভাষায় এক তথ্যবহুল নিবন্ধ রচনা করে নাম দিয়েছেন– "Life Sketch of a Great Islamic Scholar of Asia Allama Niaz Makhdum Khutani R".

ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে রিসার্চ একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত "আল্লামা খোতানী হুযুর" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমার। তাছাড়া "স্মৃতির মুকুরে আল্লামা খোতানী" আমার একটি ছোট স্মৃতিচারণমূলক লেখা, যা ১৯৮৭ সনে ফাযিল জামাতে অধ্যয়নকালে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মানের চেয়ে খোতানীর প্রতি আবেগ-ই ছিল লেখাটির মূল বিষয়।

স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞজনদের প্রবন্ধে আল্লামা খোতানীর কয়েকটি জন্মসন উল্লিখিত হয়েছে। মরহুম ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশী পাসপোর্ট সূত্রে আল্লামা খোতানীর জন্মসন উল্লেখ করেছেন ১৯১৭ ইং। ড. আব্দুর রশীদ একই সন উল্লেখ করলেও মন্তব্য করেছেন খোতানীর জন্ম এরও দুই দশক পূর্বে। অধ্যাপক আখতার ফারুখ ও অধ্যাপক এ.কিউ.এম. সিফাতুল্লাহ উল্লেখ করেছে ১৮৯৭ সন। তবে সর্বশেষে আল্লামা খোতানীর স্বদেশী (চীনা) পাসপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়েছে, যেটি তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ব্যবহার করেছেন। সেই সূত্রে প্রমাণিত হয় আল্লামা খোতানীর জন্মসন ১৯১৪ ইং। খালাক মাদরাসায় ১২ বছর অধ্যয়ন, কাশগর মাদরসায় ০৭ বছর অধ্যয়ন, জিহাদে অংশগ্রহণ কাল এবং দারুল উলূম দেওবন্দের ভর্তিতারিখ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে আমাদের কাছে ১৯১৪ সনটিকেই যথাযথ মনে হয়েছে।

মূলত স্মারকগ্রন্থের লেখাগুলোর আমি সংগ্রাহক ও সংকলক হলেও বিজ্ঞজনদের লেখার সম্পাদনা করার দুঃসাহস আমার নেই। দু একটি প্রবন্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে ও আল্লামা খোতানী এবং তার পরিবারের শানের দিকে লক্ষ করে সামান্য পরিবর্তন করেছি মাত্র। অধিকাংশ প্রবন্ধই হুবহু ছাপা হয়েছে। আমার মতো অযোগ্যের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত স্মারকে ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রকাশিত হয়েছে, এটিই অনেক বড় পাওয়া। তবে স্মারকে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে পাঠকবৃন্দ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। স্মারক গ্রন্থটি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে খোতানীকে চিনতে এবং খোতানীর গবেষকদের গবেষণায় কিছুটা হলেও সহায়তা করবে করবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ কবুল করুন।
স্মারকে যাদের মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মুফতী আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আখতার ফারুক, অধ্যাপক এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ এবং মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদ উদ্দীন আত্তার ইতোমধ্যে ইন্তিকাল করেছেন। দুআ করি, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। আর অন্য যাদের লেখা এ স্মারকে প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এছাড়া স্মারক প্রকাশে মাওলানা মুহাম্মদ মাকছুদুল হক ও মুহাম্মাদ জান্নাতুন নাঈমের সার্বিক সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। আল্লাহ তাদেরকে আজরে আজীম দান করুন।
খালেদা সিদ্দীকা, আমাদের বোন, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর র.-এর মেঝ মেয়ে। ১৯৮৬ সনের ৩০ অক্টোবর বিকেল ৩ টার দিকে আল্লামা খোতানীর দাফন শেষে আরমানিটোলার বাসায় ৫/৭ মিনিট তার সাথে আমার দেখা ও কথা। তখন তিনি ছিলেন পিতৃশোকে মূহ্যমান। তারপর বিগত ২৮ বছরে তার সাথে আমার আর কখনো দেখা বা কথা হয়নি। কিছু দিন আগে আল্লামা খোতানীর ওপর আমার একটি ক্ষুদ্র বই প্রকাশের উদ্দেশে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্যে তার সাথে পুনরায় যোগাযোগ। তার আচরণ ও কথা-বার্তা আপন ভাইবোনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শুধু খালেদা আপাই নন; আমাদের সকল বোন বা ঐ ফ্যামিলির প্রত্যেকের আচরণ অতি আপনজনের মতো। স্মারকে খালেদা আপার লেখা এবং সময় সময় স্মারকের খোঁজ নেয়া, সেই সাথে তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা উল্লেখ করার মতো। আল্লাহ তাআলা আল্লামা খোতানীর পরিবারের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অশেষ কল্যাণ ও সম্মান দান করুন। আল্লামা খোতানীর দরজাকে বুলন্দ করুন। তাঁর রূহানী সন্তানদের কবুল করুন। আমীন।

দুআর মুহতাজ

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

সূচীপত্র

এক নজরে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.–এর জীবন পরিক্রমা

নাম	:	নিয়ায মাখদূম
উপনাম	:	খোতানী হুজুর (বাংলাদেশে)
পিতা	:	শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক
মাতা	:	সাইয়্যেদা আয়েশা খানম
দাদা	:	শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ
১৯১৪ খ্রি.	:	জন্মগ্রহণ।
জন্মস্থান	:	চীন সাধারণতন্ত্রের সিনকিংয়া প্রদেশের খোতান অঞ্চলের সিংগাঙ জনপদ।
১৯১৮ খ্রি.	:	প্রাথমিক শিক্ষা শুরু (মাতা–পিতার নিকট)
১৯১৯ খ্রি.	:	পিতার ইন্তেকাল।
১৯২০ খ্রি.	:	মাতার ইন্তেকাল।
১৯২০ খ্রি.	:	স্থানীয় খালাক মাদরাসায় ভর্তি।
১৯২৬ খ্রি.	:	কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ফার্সি ও তুর্কি ভাষা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।
১৯২৬ খ্রি.	:	উচ্চ শিক্ষার জন্য কাশগর গমন।
১৯২৬ খ্রি.	:	তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উসূল, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, আকায়েদ ও প্রকৌশলসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্জন।
১৯৩৩-৩৪ খ্রি.	:	সেনাবাহিনীতে ভর্তি, জিহাদ ও হিজরত।
১৯৩৫ খ্রি.	:	দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি।
১৯৪১ খ্রি.	:	ইলমে হাইয়াতে (জ্যোতির্বিদ্যা) ডিগ্রি অর্জন।
১৯৪২ খ্রি.	:	ইলমে হানদাসাতে (প্রকৌশল) ডিগ্রি অর্জন।
১৯৪৩ খ্রি.	:	দাওরায়ে হাদীছের সনদ লাভ। (প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান)
১৯৪৪ খ্রি.	:	দাওয়ারে তাফসীরের সনদ লাভ। (প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান)
১৯৪৫ খ্রি.	:	দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর গবেষণা। (জুন পর্যন্ত)

১৯৪৫ খ্রি.	: ইলমে হাদীছের খেদমতে ছারছীনা আলীয়া মাদরাসায় যোগদান। (৩০ জুন)
খেদমত কাল	: ৪১ বছর ৩ মাস ২৯ দিন। (৩০ জুন ১৯৪৫ থেকে ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ পর্যন্ত)
সরাসরি ছাত্র	: ২,৮৫৮ জন।
রচনা	: ৭ খণ্ডে সমাপ্ত ৩,৭৭২ পৃষ্ঠার সিহাহ সিত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ (অপ্রকাশিত)।
১৯৫৩ খ্রি.	: বিবাহ।
সন্তানাদি	: সাত জন কন্যা সন্তান। ফাতেমা সিদ্দীকা, খালেদা সিদ্দীকা, হুমায়রা সিদ্দীকা, রাবেয়া সিদ্দীকা, রোকেয়া সিদ্দীকা, আয়েশা সিদ্দীকা, বিলকিস সিদ্দীকা।
১৯৭৪ খ্রি.	: প্রথম বারের মতো হজ্জ পালন।
১৯৮০ খ্রি.	: বাগদাদ সফর।
১৯৮০ খ্রি.	: ওমরা পালন ও রওজা জিয়ারত। (বাগদাদ সফর শেষে)
১৯৮২ খ্রি.	: দ্বিতীয় বারের মতো পবিত্র হজ্জ পালন।
১৯৮৬ খ্রি.	: অসুস্থতাবস্থায় ঢাকা গমন।
১৯৮৬ খ্রি.	: ইন্তিকাল। ২৯ অক্টোবর/ ১১ কার্তিক ১৩৯৩ বাং/২৪ সফর ১৪০৭ হি. বুধবার, বিকাল ৫ টা ৫ মিনিট। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
১৯৮৬ খ্রি.	: সালাতে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন। (৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতি বার, বাদ জোহর)
জানাযার ইমাম	: অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির র.
জানাযার স্থান	: জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররাম।
দাফনের স্থান	: আজিমপুর নতুন গোরস্থান, ঢাকা।
জীবনকাল	: ৭২ বছর (প্রায়)।

মুজাহিদ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ছাঁরছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস ইলমে হাদীসের অনন্য ও অকৃত্রিম খাদেম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. বিগত ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং, ১১ কার্তিক ১৩৯৩ বাংলা, ২৪ সফর, ১৪০৭ হিজরী তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ঢাকার আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ৩০ অক্টোবর বাদ জোহর বায়তুল মুকাররম মসজিদে মাওলানা শরীফ আব্দুল মুহাম্মদ কাদিরের ইমামতিতে মরহুমের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত মানুষ এ জানাযায় শরীক হন। শত-সহস্র অশ্রুস্নাত মানুষের মিছিল বায়তুল মুকাররম থেকে মরহুমের কফিন যখন আজিমপুর গোরস্থানে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন যে মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত। তাঁর বিয়োগ ব্যথায় সবাই ছিল শোকে মূহ্যমান। ইন্তেকালের খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের ঢল নামে তারা মসজিদ সংলগ্ন তাঁর শ্বশুরালয়ে তাঁকে শেষবারে মতো একনজর দেখার জন্যে। তাঁর মৃত্যুতে ধর্মমন্ত্রীসহ অনেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন শোক প্রকাশ করে খবরের কাগজে বিবৃতি দেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্যে অনেক দোয়ার মাহফিল, ঈসালে ছওয়াবের মজলিস, আলোচনাসভা ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ছারছীনার পীর সাহেবের সভাপতিত্বে ১০ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক দোয়ার মজলিসে "নিয়ায মাখদূম ফান্ড" নামে ১১ সদস্যের একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করা হয়। মরহুমের স্মৃতি সংরক্ষণ, তাঁর অবদানের মূল্যায়ণ, তাঁর প্রতি তাঁর ছাত্রদের দায়িত্ব পালন– ছিল এ ফান্ডের মূখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন সমকালীন বিশ্বে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। ইলমে হাদীসের নীরব ও নিরলস সাধনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। জ্ঞানের সাগর নিয়ায মাখদূম হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, কালাম, সীরাত, আদব, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর ইন্তিকালে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে

শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা সহজে পূরণ হবার নয়। তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানার জন্য তাঁর জীবনের কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করা হলো।

জন্মস্থান:

চীন সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম সীমান্তে সিনকিয়াং প্রদেশের খোতানের সীংগাঙ জনপদে মরহুম নিয়ায মাখদূমের জন্ম। সীংগাঙ এর পূর্ব নাম ইচলিকোঁ শহর। রুশীয় তুর্কীস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূখণ্ডে কাশগরের দক্ষিণ-পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের ঊর্ধ্বে ও কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় "খোতান" একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল।

ভাষা:

এ অঞ্চলের মানুষ চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কী ভাষায় বলে। তবে আরবী এখানে বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আরবী ভাষা শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক ছিল।

বংশ পরিচয়:

প্রসিদ্ধ শায়খ পরিবারে আল্লামা নিয়ায মাখদূমের জন্ম। পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ও দাদা শায়খ মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ ছিলেন সে অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা। রেশমী কাপড় তৈরির কারখানা ছিল তাদের। এখানকার তৈরি রেশমী কাপড় ও সূতা ভারতে রপ্তানি হত। নিয়ায মাখদূমের বয়স যখন মাত্র ৫ বছর তখন তাঁর পিতা (৯৭) মারা যান এবং এর এক বছর পর স্নেহময়ী মাতা আয়েশা খানমও ইন্তেকাল করেন। তখন ৬ বছরের ইয়াতিম বালক নিয়ায মাখদূমের কাফীল তত্ত্বাবধায়ক হন চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম। তাঁর মামা শায়খ আহমদ খতীব বদান্যতায় স্থানীয়ভাবে হাতেম তাঈ নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে শিশু নিয়ায লালিত-পালিত হন এবং পরে তাঁরই কন্যার সংগে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু প্রথম সন্তান প্রসবের সময়ই তিনি মারা যান। তাঁর অন্য মামা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল সিদ্দীকী ছিলেন একজন বিখ্যাত হাদীস বেত্তা আলেম। তাঁর ভাইদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ তখনা আখন্দ পারিবারিক ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। অন্যান্য ভাইদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ আলী, শায়খ মুহাম্মদ ইউছুফ, শায়খ মুহাম্মদ, শায়খ আবু বকর ও শায়খ তখনা

আহমদ অপরিণত বয়সে মারা যান। একমাত্র ভাই শায়েখ ক্বারী হাফেজ মুহাম্মদ ওমর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর সংগে খোতানী হুজুরের চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ছিল। তিনি যখন হাসপাতালে। তখন তাঁর এ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর আসে, কিন্তু তিনি তা জেনে যাননি। নেছার খানম, হালীমা খানম, বিবি সারা ও সালীমা খানম ছিল তাঁর বোন।

শিক্ষাঃ

১২ বছর বয়স পর্যন্ত বালক নিয়ায মাখদূম স্থানীয় "খালাক" মাদরাসায় শিক্ষালাভ করেন। তুর্কী ভাষা, আরবী ভাষা, কুরআন, ফিকহ, অংকসহ শরহেজামী পর্যন্ত এখানে শিক্ষালাভ করার পর তিনি বাড়ি থেকে ১৩ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কাশগর যান। এখানে তিনি ৭ বছর অধ্যয়ন করেন। ইত্যবসরে রুশীয় বলশেভিক বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চীনারা তুর্কীদের ওপর চড়াও হয়। চীনা-তুর্কী সংগ্রামে যুবক নিয়ায মাখদূম তুর্কীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কম্যুনিজমের আগ্রাসনের কবল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্য রক্ষার জিহাদে তিনি তুর্কীস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুশমনদের মোকাবিলা করে। কিন্তু অগণিত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সাথীদের অনেকেই শাহাদাত লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম রহমতে মর্দে মুজাহিদ নিয়ায মাখদূমকে মর্দে মুহাদ্দিসের আরদ্ধ ব্রত পালনের নিমিত্ত সুদূর খোতান থেকে দুর্লংঘ হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়ে ভারতের দেওবন্দে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী র., মাওলানা ইযায আহমদ র., মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. প্রমুখের সাহচর্যে হাদীস, তাফসীর, কালাম ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।

অধ্যাপনাঃ

বৃটিশ ভারতে শুধু কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামেল শ্রেণীতে হাদীস পড়ানো হতো। বরিশালের ছারছীনাতে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সহযোগিতায় ছারছীনা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পীরে কালেম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন র. সাহেব কামেল হাদীস শ্রেণী খোলেন। হাদীস পড়াবার জন্য যোগ্য

মুহাদ্দিস প্রয়োজন। পীর ছাহেব দেওবন্দ মাদরাসায় একজন উপযুক্ত হাদীসের শিক্ষকের জন্য পত্র লিখেন।

জবাবে নিয়ায মাখদূম খোতানীকে পাঠানো হয়। ১৯৪৫ সনে তিনি ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিসরূপে যোগদান করেন। তারপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে হাদীসের খেদতম করে গেছেন মুজাহিদ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম র.।

বয়স:

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য দলীল আমাদের কাছে নেই। তবে ১৯৭৪ সনে তিনি প্রথম নায়েবী হজ্জ পালন করেন এবং পাসপোর্টে তখন বয়স লিখিয়েছিলেন ৫৭ বছর। এ হিসেবে তাঁর জন্ম ১৯১৭ সনে।

তার জীবন তিন ভাগে ভাগ করলে দেখা যাবে যে, (১) খোতান ও কাশগরে শিক্ষালাভে কেটেছে ১৯ বছর, (২) প্রতিরোধ সংগ্রাম ও দেওবন্দে কেটেছে ১০ বছর। আর ছারছীনায় কেটেছে ৪০ বছর। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি প্রায় ৭০ বছরের এক বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন-যাপন করে ১৯৮৬ সনের ২৯ অক্টোবর চির বিদায় নেন।

লেখক :

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

উস্তাযুনাল মুকাররম শামসুল উলামা আল্লামা
নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানী খোতানী হুজুর র.

মুফতী আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ র.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখ লাখ শোকর, যিনি এ অধমকে সুযোগ্য পিতা ও মাতার উসীলায় শৈশবকাল হতেই ছারছীনার হযরত পীর ছাহেব র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ করার তাওফীক দান করেছিলেন।

সাতচল্লিশ বছর আগের কথা। ছারছীনার পবিত্র ভূমির তখনকার পরিবেশটা আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসমান। একদিকে যেমন ছিল হযরত পীর ছাহেব হুজুর কেবলার দরবার শরীফে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত উলামায়ে হক্কানীদের সমাগম, ওয়াজ-নসীহত, জিকির-আজকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও তালীম-তাসনীফের সরল সুশৃঙ্খল ও অনাড়ম্বর ব্যতিব্যস্ততা, অন্য দিকে তেমন ছিল মাদরাসার ক্লাস ও ছাত্রাবাসের কামরাসমূহে ও মাঠে-ময়দানে সর্বদা এলমের চর্চা ও আমল-আখলাকের পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা।

ইহইয়ায়ে দীন ও কালিমাতুল্লাহর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে হুজুর কেবলা র. তদীয় কর্মজীবনে যে বিভিন্নমুখী ও সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা ছিল তার-ই অন্যতম অঙ্গ। উপযুক্ত উলামায়ে হক্কানীর সংখ্যা বৃদ্ধি করত দেশ-বিদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়াই ছিল এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঈপ্সিত লক্ষ্য। তাই অনিবার্য কারণেই হুজুর কেবলা র. দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে অতি বিচক্ষণতার সাথে যাচাই-বাছাই করত সুযোগ্য ও বা-আমল শিক্ষক আনয়ন করত মাদরাসার প্রয়োজনীয় পদসমূহ পূরণ করে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

আহা! মনে পড়ে আমার সেই সকল সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ আসাতিযায়ে কেরামের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ প্রবন্ধে তাঁদের শুধু পবিত্র নাম কয়খানা উল্লেখ করার স্থানও আমার নেই। আবার সকলেই উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিধায় শুধু কতকের উল্লেখ করাও সমীচীন মনে করি না। তবে মাদরাসায় তখনো কামিল জামাত খোলা হয়নি। ১৯৪২ ইং সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি আমি এ মাদরাসায় জামাতে নাহমে ভর্তি হয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত এপ্রিল মাসে জামাতে হাসতমে পড়াশুনা আরম্ভ করি। সেই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে মাদরাসায় কামিল জামাত খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।

হতে হতে যখন কামিল জামাতের পড়াশুনা মোটামুটি আরম্ভ হয়ে যায়, তখনই বিদেশ হতে উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখনই আনা হল জনাব মাওলানা আব্দুল জলীল পেশওয়ারী র. ও জনাব মাওলানা নূরে আলম বিহারী র. কে। তাঁরা কে কতদিন এখানে ছিলেন এবং কে কী কারণে চলে গেছেন, তা আমার জানা নেই। মোটামুটি তাঁদের চলে যাওয়ার পর আনা হল উস্তাজুনা হযরত মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী র. কে। ইনি আমার ও আমার সমসাময়িক অনেক ছাত্র ভাইয়ের উস্তাদ। যিনি ১৯৪৫ সাল হতে ১৯৬৫ ইং সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর অতি দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কামিল ক্লাসে বুখারী, তিরমিযি, নাসায়ী ও বায়যাবী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ পড়িয়ে দ্বিতীয় মুহাদ্দিসের পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন। সুযোগ্য উস্তাদ হিসেবে তাঁর নাম আমরা স্মরণ না করে পারি না। তবে এখান হতে বাড়ি চলে যাওয়ার পর তাঁর সাথে যোগাযোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি এখনো জীবিত আছেন কীনা, বলা যায় না। তবে কোন অবস্থাতেই আমরা তাঁর দুআ, ফায়েজ ও বরকত হতে বঞ্চিত হব না, এটি আমাদের একান্ত কামনা।

কিছুকাল পরে অর্থাৎ, ১৯৪৫ ইং সনে আমি যখন তৎকালীন জামাতে পাঞ্জম ও বর্তমান দাখিল ১০ম শ্রেণীতে পড়ি, তখন মাদরাসার উন্নতির সাথে সাথে আরো উন্নত মানের মুহাদ্দিস আনার প্রয়োজন হল। তখনই উক্ত বিহারী হুজুরের পরামর্শ মতে হযরত পীর ছাহেব কেবলা র. খোতানী হুজুরকে দেওবন্দ দারুল উলূম হতে আনার ব্যবস্থা করলেন। উল্লেখ্য, বিহারী হুজুর ও খোতানী হুজুর উভয়ই দেওবন্দ দারুল উলুমের একই জামাতের ছাত্র ছিলেন। উভয়ই দেওবন্দ হতে আনুমাণিক ছয়মাস আগে পরে এখানে তাশরীফ আনয়ন করেছিলেন।

যা হোক, ছারছীনার বেহেশতী বাগানে আগমন করলেন বেহেশতের দূত হযরত খোতানী হুজুর র.। আমি তখন ছোট। তাই হুজুরের মর্যাদার আন্দাজ করার মতো ক্ষমতা আমার আদৌ ছিল না। কেবল আগামীতে তাঁর নিকট পড়বো, এ আশায় মাঝে মাঝে সুযোগ মতো তাঁর চন্দ্র সাদৃশ উজ্জ্বল ও হাসিমাখা চেহারা মুবারকের দিকে তাকাতাম। কোন কথা বলতে সাহস করতাম না। তবে হুজুর জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতাম মাত্র।

দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। হুজুরের দরসে বসার সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু হুজুরের ইলমের আন্দাজ করার ক্ষমতা আমার হয়নি। সত্যি বলতে কি, এখনও আমি জানি না যে, হুজুরের ইলমের মাহারাত কতখানি। আর

তা জানবই বা কী করে? হুজুরতো ছিলেন্ন তৎকালীন প্রসিদ্ধ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী ও মাওলানা এজায আলী র. প্রমুখ উলামায়ে কেরামের দরসগাহে সর্বদাই প্রথমস্থান অধিকার করা ছাত্র। তাই তিনি শুধু ইলমে হাদীসেই মাহের ছিলেন না; বরং তাফসীর, ফিকহ, আকায়েদ, আদব, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, হেকমত ও ইলমে হাইয়াতসহ সকল বিষয়েই তিনি সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন।

মাত্র কয়েকদিন তার হাদীসের দরসে বসেই তাঁর ইলমের আন্দাজ করার দাবি অন্তত আমি করতে পারি না। তবে তার সারগর্ভ সুসজ্জিত ও অনর্গল তাকরীর দ্বারা তার অসাধারণ মেধার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যেত। মেধার পেছনে আবার কাজ করত তার অক্লান্ত পরিশ্রম। যেহেতু ইলমের প্রচার-প্রসারই ছিল তার শিক্ষকজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাই অনবরত পরিশ্রমের দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত মেধাকে কাজে লাগাতে তিনি থাকতেন সদা সচেষ্ট।

তাইতো সকল বিষয়ে বিশেষ করে হাদীসের বিষয়ে দরস দেয়ার সময় মনে হত, যেন সকল শরাহ-শুরুহাতের গ্রন্থাদি তাঁর মুখস্থ। তাঁর তাকরীরের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি কোনদিন এলোপাতাড়ি কোন বক্তব্য রাখতেন না; বরং বিষয়বস্তুসমূহের পরস্পর সম্পর্ক অনুযায়ী সব কথা সাজিয়ে একের পর এক বলে যেতেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা দুইবার বলতেন না। ধৈর্য ধরে তার তাকরীর শ্রবণ করলে, কোন শ্রোতার মনেই কোন প্রশ্নের উত্তর অবশিষ্ট থাকতো না।

আমার জীবনে বহুবার দেখেছি সরকারের তরফ থেকে দেশী-বিদেশী যত বড় আলেম মাদরাসা পরিদর্শনে এসেছেন, তারা সকলেই হুজুরের তাকরীর শুনে অবাক হয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত হুজুরের নিকট হতে কিছু আহরণও করে যেতেন। কিন্তু কিছু দিয়ে যেতে পারতেন না। একবার কোন এক বিদেশী ডিগ্রিধারী আলেম পরিদর্শক নিজে কিছু জানেন বলে গর্বিত হয়ে হুজুরকে কিছু প্রশ্নাদি করলে হুজুর তার এমন দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পরিদর্শক সাহেব লজ্জিত হয়ে হুজুরকে 'বাহরুল উলূম' আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, হুজুরের উক্ত পাঠদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই ছিল কামিল মাদরাসা হিসেবে ছারছীনা মাদরাসার অধিকতর খ্যাতি অর্জনের অন্যতম কারণ। এখন আমি হুজুরের জীবনের আরো কয়েকটি লক্ষণীয়, শিক্ষণীয় দিক নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করবো। কেননা, মূলত অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তা-ই।

যারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হুজুরের জীবনী পাঠ করেছেন, অথবা ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে কিছু জানেন, তারা অবশ্যই বুঝেছেন বা বুঝবেন যে, হুজুরের গোটা জিন্দেগীটিই ছিল জিহাদী জিন্দেগী।

মাতৃভূমি হতে হিজরত করে আসার পূর্বে তো তিনি কম্যুনিজম তথা কুফরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে সশস্ত্র মুজাহিদই হয়েছিলেন। হিজরত করার পরেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করত এলম শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের কাজে পূর্ণ জীবনটি কাটিয়েছিলেন। অতএব এটি সশস্ত্র জিহাদ না হলেও নিরস্ত্র জিহাদ অবশ্যই । মাঝখানে হিজরত করত তিনি হয়েছিলেন মুহাজির, আবার শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারে মৃত্যু বরণ করত তিনি হলেন শহীদ। তাই দেখা যায়, আল্লাহ পাক আমাদের হুজুরকে তাঁর জীবনে মুজাহিদ, মুহাজির, মুআল্লিম ও শহীদ, এ চারটি জান্নাতী সিফাত দ্বারাই ভূষিত করেছিলেন। যার যে কোন একটিই জান্নাতী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

তাছাড়া আমরা তাঁর মুয়াল্লিমী জীবনে যা দেখেছি তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমল ও ইবাদতের দিক দিয়ে হুজুর ছিলেন সুন্নতে নববীর অনুসারী একজন পাক্কা আবেদ, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের অলী। চরিত্রের দিক দিয়ে মহা চরিত্রবান। আলাপ ব্যবহারের দিক দিয়ে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, অমায়িক ও মিশুক। সাথে সাথে ছাত্রগণের শাসনের বেলায় ছিলেন অতি কঠোর। আবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট ছিলেন পূর্ণ অনুগত। একই মাদরাসায় সারা জীবন খেদমতে নিয়োজিত থাকাই তাঁর আনুগত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। পার্থিব জীবন যাপনের বেলায় তিনি ছিলেন অতি আড়ম্বরহীন। একমাত্র ইবাদত ও ইলমী খেদমতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশেই তিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যত্ন না নিয়ে পারেননি। অন্যথায় ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি করার দিকে তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাই যদি থাকত, তাহলে তিনি এত অল্প অজীফায় (পারিশ্রমিকে) তুষ্ট থেকে সারাজীবন একই মাদরাসায় থাকতে পারতেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, দেড়গুণ-দ্বিগুণ বেতন দিয়ে তাঁকে অন্য মাদরাসায় নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ছারছীনা ছেড়ে কোথাও যাননি এ জন্য যে, অন্য কোথাও গেলে তুলনামূলকভাবে ইলমের খেদমত অনেক কম হবে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের দু চারজন আলিমের অস্তিত্ব না থাকলে বোধ হয় আজ পর্যন্ত জগতের বুকে ইলমেরও কোন অস্তিত্ব থাকত না।

লেখক :
সাবেক মুফতী ও মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা

আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ইলমের নূরে উদ্ভাসিত

আল্লামা নিয়ায মাখদূম র. এর কর্মজীবন

খালেদা সিদ্দীকা

জীবন লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে পরম করুণাময়ের কৃপায় তাঁর কন্যাসন্তান হিসেবে জন্ম লাভ করতে পেরে আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি। এই মহান ব্যক্তিকে পিতা বলতে গর্বে সিক্ত হই। অসীম পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তিনি একজন পিতা, স্বামী ও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, তা কিছুটা হলেও সম্মানিত পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই মহাসাধক পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে পালন করেছেন, তা তুলে ধরার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে উপকৃত করার উদ্দেশেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই মহা সাধক সম্ভ্রান্ত সিদ্দীক পরিবারে খোতান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমানে চীন দেশের সিংকিয়াং স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে অবস্থিত। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি খোতান নগরী ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান নামে পরিচিত ছিল। অপরদিকে ইউরোপীয়দের কাছে 'ইলচি নগরী' নামে প্রচলিত ছিল। সিংকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত তিয়েনশানা পর্বতমালা, যার দক্ষিণে তারিম উপত্যকায় তুর্কি ভাষাভাষী ৬টি শহর ছিল, যার মধ্যে কাশগর ও খোতান অন্যতম। খোতানের উত্তরে কারাকাশ বা ব্ল্যাকজেড এবং ইউরোকাস বা ওহাইটজেড নামে দুটি নদী একত্র হয়ে খোতান নদী নামে খোতান শহরের মাঝখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে।

শীতকালে এই নদীর স্রোতে পাথরের সাথে সাদা ও সবুজ রঙের জেড পাথর প্রবাহিত হয়ে আসতো। শ্রদ্ধেয় পিতামহের এ দুই নদীর পাড়ে বড় এলাকা জুড়ে নিজস্ব জমি ছিল। যেখান থেকে মূল্যবান জেড পাথর সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। এর পাশাপাশি এ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী রেশমের বৃহৎ কারখানা ছিল এবং এখানে তৈরী রেশমী কাপড় ও সুতা ও রপ্তানী হতো বিভিন্ন দেশে। পিতা মুহাম্মদ সিদ্দীক ছিলেন সে অঞ্চলের প্রতাপশালী ধর্মীয় নেতা।

স্বাধীনতাকামি এবং ইসলামের প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তখন মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাটিতে স্বাধীনতাকামি বিদ্রোহীরা ১৯৩৩ সালে পূর্ব তুর্কিস্তান রিপাবলিক অফ ইস্ট তুর্কিস্তান

নামে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে বীর সৈনিক নিয়ায মাখদূম একটি দুর্গের সেনাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা মাত্র বছর খানেক স্থায়ি হয়। পরবর্তীতে মাওসেতুং এর কমিউনিস্ট বাহিনী দুর্গটিতে আক্রমণ করে। এই বীর সেনাপতি সাধ্যমতো যুদ্ধ করে অবশেষে দুর্গ ত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একটি নদীর তীরে পৌছান। সেখানে ঘোড়াটি অতি পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুবরণ করে। ঝাঁপ দিলেন নদীতে। দীর্ঘপথ সাতার কেটে একটি নিরাপদ অঞ্চলে পৌছান। ঐ অঞ্চলটি তখনো চীনা কমিউনিস্টদের অধীনে আসেনি। এই অকুতোভয় সেনাপতি স্বদেশকে পুনরায় উদ্ধারের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো সহায়তা প্রদান করছিলো। অপরদিকে স্বাধীনতা যোদ্ধারা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রকে অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে ইসলামবিরোধী কুপ্রথা অনুসরণ করছিল। ফলে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী অকুতোভয় এই সেনাপতি তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তারা তাদের কুপ্রথা ত্যাগ না করে কুরআন ও সুন্নাহর অবমাননা করায়, তিনি পরবর্তীতে সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে তিনি স্থির করলেন উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের। আর এজন্য তিনি ইউরোপে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন (ইস্তেখারাতে) যে, তাঁকে নির্দেশ করা হচ্ছে দীনী শিক্ষায় অগ্রগামী হওয়ার জন্যে। তারপর-ই এই বীর সেনাপতি তাঁর জীবনের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে কাশ্মির হয়ে ভারতের দেওবন্দে ইসলামের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে হিজরত করেন।

আমার বাল্যকালের সুন্দর সময়গুলো কেটেছে বরিশালে, স্নেহময়ী বাবার একান্ত সান্নিধ্যে। আমাদের তিনি শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তীতার মাঝে ইসলামের আদর্শে মানুষ করার প্রচেষ্টায় কোন কার্পণ্য করেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল যত্নবান একজন সার্থক পিতা। তিনি নিজে আমাদের বড় দুই বোনকে কুরআন শিখিয়েছেন এবং প্রতিদিন ক্লাশে যাবার আগে হাদীস থেকে দৈনন্দিন জীবনের ওপর পড়া দিয়ে যেতেন। 'তা'লিমুল ইসলাম' আমার প্রথম হাতেখড়ি বাবার কাছে। আব্বার বড় শখ ছিল আমাকে হাফিজা বানাবেন, কিন্তু স্বভাবগতভাবে খুব চঞ্চল ছিলাম বিধায় সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত না হলেও অনেকটা করিয়েছেন। দেখা যেত বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে, আর তিনি অনেক রাত পর্যন্ত হাদীসের চর্চায়

গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন, আর পাশে আমাকে বসিয়ে রাখতেন কুরআন দিয়ে। আমি তখন অনেক ছোট। ৭-৮ বছরের। মাঝে মাঝে সারারাতও জাগিয়ে রাখতেন। বাল্যকাল থেকে বাবার পেছনে জামাতে নামায পড়ার মাধ্যমে নামাযের হাতেখড়ি। মাঝে মাঝে ছোট শিশুটি সেজদায় ঘুমিয়ে যেতাম। তবুও নিস্তার নেই। নামায পড়তেই হবে।

ইলমের গভীরতার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগী এবং আধ্যত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক অনন্য পুরুষ। বিশেষ করে রমজান মাসে আমাদের বাসায় হতো বিশেষ আয়োজন। উত্তম খাবার এবং বেশি বেশি ইবাদতের প্রতিযোগিতা। আমরা যারা খুব ছোট ছিলাম, তাদের জন্যে রমজান মাসে থাকতো পুরস্কারের ঘোষণা। যে বেশি রোযা রাখে, তার জন্যে। খুব অল্প বয়সে (৫-৬) রোযা রাখার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদেরকে সম্পূর্ণ রোযা রাখতে অভ্যস্ত করে তুলেন। বাবাকে দেখেছি রমজানে আসরের নামাযের পর থেকে ইফতারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। তারাবির নামায জামাতের সাথে বাড়ির সবাইকে নিয়ে, এমনকি বাড়ির কাজের মানুষটিকেও একই কাতারে আমাদের সাথে নামায পড়াতেন। মহান পিতা বাসায় তারাবি শেষ করে ছুটে যেতেন মসজিদে জামাত ধরার জন্যে। এভাবে অতি বাল্যকাল থেকেই আমাদের নামায ও রোযার প্রতি অভ্যস্থ করে তুলেন।

আতিথেয়তায় অতুলনীয় ছিলেন এই মহাপুরুষ। বাসায় কোন মেহমান আসলে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতেন আপ্যায়নের জন্যে। নিজ হাতে মেহমানদারী করতেন এবং মেহমানকে গেইট পর্যন্ত বিদায় দিতেন নিজে এবং আমাদেরকেও নির্দেশ দিতেন। হাসিমুখে আন্তরিকতাপূর্ণ মধুর ব্যবহার আর উষ্ণ মেহমানদারী ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। সর্বদা হাসিমুখে সবার সাথে কথা বলতেন। ছোটবড় সবাইকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি ঘরের কাজের মানুষটির সাথে আপনি করে সম্বোধন করতেন এই বিনয়ী মহাপুরুষ।

বাবা নিয়ায মাখদূম র. ছিলেন একজন শিশুর মতো সরল ও সহজ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ঠাণ্ডা তামাশা, ছলচাতুরী বুঝতেন না। মামা-খালারা মাঝে মাঝে দুষ্টুমী করে আমাদের বকা খাওয়াবেন বলে মিথ্যা অভিযোগ করলে, তিনি তা সত্য বলে ধরে নিতেন এবং তার প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হয়ে যেতেন। তিনি চিন্তাই

করতে পারতেন না, কোন মুসলমান মিথ্যা বা ভুল কথা বলে তামাশা করতে পারে। তা ছিল তার কল্পনার অতীত।

তিনি বাসার কাজের লোকদেরকে পরিবারের সদস্যদের মতো সমান গুরুত্ব দিতেন। তাদের সাথে 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন এবং নিশ্চিত করতেন যাতে সবাইকে একই খাবার দেয়া হয়। অপরদিকে ঈদে আমাদের জন্যে যে নতুন কাপড়-চোপড় কেনা হত, তা তাদের জন্যেও কেনা হত। এটাতে আমাদের কিছুটা আপত্তি থাকলেও বাবার কঠোর নির্দেশ ছিল যাতে তারা গরীব বলে মনে কষ্ট না পায় এবং নিজেদেরকে পরিবারের বাইরের সদস্য বলে না মনে করে। আমাদের মনেও যাতে অহংকারের জন্ম না নেয়, সেক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার জন্যে কঠোর নির্দেশ ছিল।

শ্রদ্ধেয় স্নেহময়ী পিতা প্রায় প্রতিদিন আমাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে বসিয়ে কিছু সময় গল্প করতে পছন্দ করতেন। এই গল্পের ছলে হাদীস ও কুরআনের আলোকে আমাদের আচার-আচরণ ও জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে অতি সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় আমাদের জ্ঞান দান করতেন। পাশাপাশি বাবার নিজের জীবনের অনেক ঘটনা বলে যেতেন। মাঝে মাঝে আবেগাপ্লুত হয়ে বলতেন, "ছোট বেলা থেকে পিতামাতা, ভাইবোন আত্মীয় স্বজনকে হারিয়ে আমার মনে যে পুঞ্জিভূত কষ্ট, তা যদি কোন পর্বতের ওপর রাখা হয়, তাহলে পর্বতও কেঁপে উঠবে।" কিন্তু আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে দীনী ইলমের চর্চায় নিবেদিত এই সাধক সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি সার্থক জীবন অতিবাহিত করেন। আব্বা মাঝে মাঝে আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন– "বেটি যার যার আমল ও কর্ম নিয়ে তাকে আখেরাতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। হাশরের ময়দানে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। যার যার আমল তাকে সাহায্য করবে।" অতএব, ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিতেন। বাবা বলতেন– "মানুষের চলাফেরার বা হাঁটার ভঙ্গি মানুষের চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।" হাঁটাচলার ভঙ্গিতে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাই আব্বা আমাদেরকে দাম্ভিকতা বর্জিত নমনীয়ভাবে হাঁটার নির্দেশনা দিতেন।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ প্রতিবেশী। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ছিল তার অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক। ছুটিতে ঢাকাতে এলেই ছুটে যেতেন প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নিতে। আমরা যেহেতু শেষের দিকে ঢাকাতে থাকতাম, স্বভাবগত কারণে কিছু প্রতিবেশীর সাথে একটু আধটু মনোমালিন্য হতো। কিন্তু আব্বার নির্দেশ ছিল

শত্রুর সাথে আরো বেশি ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার, যাতে সে নিজেই অনুশোচনা করে এবং সংশোধন হতে পারে।

শ্রদ্ধেয় আব্বা নিয়ায মাখদূমের জীবন ছিল নানা চমকপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমাহীন। তিনি এমন কিছু গুণ ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করাকে পছন্দ করতেন না। তার মধ্যে ছিল অসংখ্য বাতেনী গুণাবলি, যা আমি সন্তান হিসেবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমাদের অসুখ-বিসুখে কখনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়নি। আব্বা দম করে দিলেই সুস্থ হয়ে যেতাম। প্রচণ্ড জ্বর। দম করা পানি খেয়ে জ্বর ভালো হয়ে গেছে। বাল্যকালে বরিশালে একবার আমার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা শুরু হয়। আম্মা অস্থির হয়ে ওঠেন। আব্বা ক্লাস থেকে এসে একটা পেরেক আর হাতুরী নিয়ে ব্যথার দাঁতটি চেপে ধরতে বললেন এবং দুআ পড়ে পেরেকে দম করে দেয়ালে ঠুকতে লাগলেন হাতুরী। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যথা ভালো হয়ে গেল।
স্মৃতির পাতায় মনে পড়ে, আমাদের বাসায় কাজ করতো একটা মেয়ে। তাকে জিনে আছর করেছে। তাই ভীষণ পাগলামি করছে। মেয়েটিকে আব্বার কাছে নিয়ে এলো তার পিতামাতা। আব্বা প্রথমে কুরআন ও হাদীসের আয়াত পড়ে শুনালেন। তারপর জীনকে মানুষের ক্ষতি না করে চলে যেতে বললেন এবং সতর্ক করলেন। এভাবে তিনবার। তারপর গুলি ছুড়লেন। মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল এবং তারপর সুস্থ হলো। এরপর আর কখনো তাকে জীনে আছর করেনি।
সুক্ষ্মজ্ঞানী এই সাধক তাঁর সুক্ষ্মজ্ঞান দ্বারা গায়েবী অনেক কিছুই বুঝতে পারতেন। মনে পড়ে আম্মাকে 'মুসিবাত আনে ওয়ালা হায়' এই বলে সতর্ক করতেন। বুঝতে পারতেন কখন চন্দ্রগ্রহণ হবে, কখন সূর্য গ্রহণ হবে। তাঁর 'উসতুরলুব' নামে একটা কাঠের যন্ত্র ছিল। তা দিয়ে তিনি সময় নির্ধারণ করতে পারতেন।

প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন এই জ্ঞানের সাধক। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বছর বাইতুল মুকাররম মসজিদে ঈদের খুৎবা দেন। ২০-২৫ পাতা খুৎবা অনর্গল মুখস্ত করে ফেললেন প্রখর স্মরণ শক্তি ও মেধা দ্বারা।

আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এ সাধক ১৯৮০ সালে ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে বাগদাদে রাষ্ট্রীয় সফরে যান এবং সেখান থেকে উমরা পালন করতে যান। আব্বা পান খেতেন খুব সৌখিনতার সাথে। আমাদের পান বানিয়ে বাক্সে ভরে দিতে হতো। যখন আব্বা ইরাক যাচ্ছিলেন তখন আমাকে বললেন, "পান বানিয়ে দাও এবং এটাই হয়তো শেষ পান বানানো। তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

আমি নিয়্যত করেছি, উমরাতে গিয়ে যমযমের পানি পান করে পান খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করবো যেন আল্লাহ আমার উমরাহ কবুল করেন এবং পানের অভ্যাস ত্যাগ করার তাওফীক দান করেন।" অবশেষে তাই হলো সুদীর্ঘ অনেক বছরের এই অভ্যাস তিনি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর কখনো তিনি পান স্পর্শ করেননি।

মহাসাধক নিয়ায মাখদূমের ছিল মহান স্রষ্টার প্রতি অগাধ আস্থা। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রতিটি কাজে প্রতিটি আচরণে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন। আব্বা সব সময় বলতেন-"কোন কিছু চাইলে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সন্তুষ্ট কর।আল্লাহ সব কুছ দে দেয়েঙ্গে ইনশাআল্লাহ।" পার্থিব জীবন সম্বন্ধে ছিলেন প্রচণ্ড উদাসীন। ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি করার দিকে তাঁর কোন লক্ষ্য বা প্রচেষ্টা ছিল না। সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। বলতেন- "আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে তুষ্ট থাকা মুমিনের কাজ।"

১৯৮৬ সালের ৭ আগস্ট আমার অর্থাৎ, নিয়ায মাখদূমের মেঝ মেয়ের বিয়ে দেন সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার সাথে। যেহেতু বাবা নিজেই একজন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন, সেহেতু এই জামাতাকে খুব পছন্দ করতেন এবং তাকে সামরিক পোষাকে দেখতে খুব পছন্দ করতেন। শ্রদ্ধেয় আব্বাকে যখন প্রোটেস্ট গ্লান্ডের অপারেশনে প্রবেশ করার জন্যে নেয়ার প্রস্তুতি শুরু হল, তখন বাবা দুই জামাতার উপস্থিতি ছাড়া অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন। অবশেষে আমার স্বামী ও বড় বোনের স্বামী আসার পর অপারেশনের জন্যে ঢুকলেন। তিনি এতোটাই স্নেহপ্রবণ ছিলেন যে, তিনি তাঁর জামাতাদের নিজ ছেলের মতো ভালোবাসতেন।

জ্ঞানের সাগর পিতা নিয়ায মাখদূমের ছিল প্রবল জ্ঞানপিপাসা। আমার বাল্যকাল থেকে দেখেছি তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতেন ইলমের অন্বেষণে। বাসায় যখন ক্লাসের প্রস্তুতির জন্যে মুতালাআয় বসতেন, তখন এতোটাই গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন যে, পৃথিবীর কোন চিন্তাই তাঁর ধ্যানকে স্পর্শ করতে পারতো না। অসংখ্য কিতাবের মাঝে হারিয়ে যেতেন। চারিদিকে কিতাবের স্তূপ। তার মধ্যে এমনভাবে হারিয়ে যেতেন, যা চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ফজরের আজানে প্রায়ই তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে যেত। তখন তাঁর পা দুটো ফুলে নীচের অংশ অবশ হয়ে গেছে। আম্মার সাহায্য নিয়ে হাদীসের স্তুপের ভিতর থেকে বার হয়ে আসতেন, আর বলতেন- "হামতো পাতা-হী নাহি চলো কাব সুবেহ হো গিয়া।"

আমাদের দু বোনের রুটিন কাজ ছিল সকাল বেলা প্রচুর সংখ্যক হাদীসের কিতাব ঘর থেকে বয়ে নিয়ে মুতালাআর জায়গায় গুছিয়ে রাখা। আবার রাতে যথাস্থানে ফেরত আনা। প্রায় গোটা পঞ্চাশেরও অধিক কিতাব।

হাদীসপ্রেমিক ও নিরলস এই হাদীস সাধকের শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন– "আল্লাহ যদি আমাকে জীবিত রাখেন তাহলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জীবনের শেষ সময়টুকু তোমার মাকে নিয়ে মদীনা শরীফ কাটাবো।" আমাদের ব্যাপারে বলতেন– "আমি তোমার মাকে নিয়ে মদীনা শরীফে থাকলে আমার সন্তানেরা বারবার নবীজীর সোনার মদীনায় ছুটে আসবে আমাদের দেখার জন্যে।" তিনি চাইতেন, এভাবে তাঁর সন্তানেরা এই পবিত্র ভূমির প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ভূমির সাথে তাদের যোগসূত্র সুদৃঢ় হবে।

অপরদিকে মক্কা ও মদীনা শরীফে বাবার স্বদেশীদের একটা বিরাট অংশের বসবাস রয়েছে। মক্কা ও মদীনা শরীফে 'ওয়াকফুল খোতানী' নামে একটি অতিথি ভবন রয়েছে। সেখানে খোতানীদের জন্যে বিনা খরচে অতিথিদের আতিথেয়তার বন্দোবস্ত রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমারো 'ওয়াকফুল খোতানী' ভিলায় অবস্থান করার সুযোগ হয়েছিল। সেই সূত্রে খোতানের কয়েকটি পরিবারের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাবার একই গ্রামের অনেকের সাথে জানা-শোনার সুযোগ হয়। পবিত্র মক্কাতে প্রথম ২০১০ ইং-এ আমার ফুফাতো ভাই ইয়াকুব আখন্দের স্ত্রীর সাথে এবং তার পুত্র অর্থাৎ, আমার ফুফাতো ভাইয়ের স্ত্রী ও পুত্রের সাথে সাক্ষাত হয়। তারা বর্তমানে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থান করছেন। তাদের যখন পরিচয় হয়, মুহূর্তের মধ্যে আবেগাপ্লুত হয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেন। আমরা বর্তমানে ভিন্ন দেশবাসী হলেও আমাদের ধমনীতে একই বংশের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যার বন্ধন কখনো শেষ হবার নয়।

তারপর থেকে বাবার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। এমনকি আমার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে অংশগ্রহণের জন্যে তারা ২০১২ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাদের বর্ণনা আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে বাবার প্রিয় জন্মভূমি ভ্রমণে। অচিরেই আমার এই সুপ্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেন বাস্তবায়িত হয়, সে জন্যে আমি সকলের কাছে দুআপ্রার্থী।

জীবনের শেষের দিকে আব্বার বাতের ব্যথাটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তবে আব্বার ব্লাডপ্রেসার বা ডায়াবেটিস কোনটাই ছিল না। বাতের কষ্টে খুব কাবু হয়ে গেলেন। তবুও জামাতের সাথে নামায পড়বেন। আমরা বাবাকে ধরে মাসজিদের

জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতাম। পরবর্তীতে 'প্রোস্টেড গ্ল্যানড এডলারজ' আক্রান্ত হলেন। ফলে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অস্ত্রোপচারের পর পরবর্তীতে ইনফেকশন হয়ে গেল। ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর। সকাল বেলা। সেই দিন ছিল 'আখেরী চাহার সোম্বা'। বাবা গোসল করতে চাইলেন। তাঁকে গোসল করানো হল। পরম পবিত্র এই মহা সাধক ঠিক আসরের আজানের সাথে সাথে হাতের স্যালাইনটিকে টেনে খুলে দিলেন। নামাযের জন্যে বুকে হাত বাঁধলেন এবং নামায শেষ করলেন। তারপর এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। আব্বার মুখের কালেমার উচ্চ শব্দে সম্পূর্ণ ওয়ার্ডে সৃষ্টি হল এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের। ডাক্তারদের ছোটাছুটি। সবার চোখে পানি। আমরা বুঝতে পারছিলাম এই মহান সাধকের প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শরীরের নিম্নস্তর থেকে শীতল হয়ে আসছে। কিন্তু তখনো মুখে জিকির। পর্যায়ক্রমে এই মহাসাধক আল্লাহর অলীর মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সমস্ত হাসপাতালে সৃষ্টি হল ভাবগম্ভীর পরিবেশের। সবার চোখে পানি আর মুখে বাবার সাথে কালেমার জিকির। আর এ জিকিরের মাধ্যমে এই মহাসাধক চির বিদায় নিলেন। আমরা ইয়াতীম হয়ে গেলাম। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রেখে গেছেন সাত কন্যা, স্ত্রী আর অগণিত দীনী (পুত্র) সন্তান। অগণিত দীনী সন্তানের মাঝে খোতানী র. হয়ে আছেন চির অমর। অগণিত ভক্ত, আলেমসমাজ ও দীনী সন্তান প্রতি বছর তাঁর জীবন নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে হাদীস বিশারদ ও সুন্নাতে রাসূলের জীবন্ত প্রতীক নিয়ায মাখদূম র. অমর হয়ে থাকবেন যুগ যুগ ধরে। অমর হয়ে থাকবেন আমাদের কর্মের মাধ্যমে। ইলমে হাদীসের জন্যে এই নিবেদিতপ্রাণ বেঁচে আছেন প্রতিটি দীনী তালিবে ইলমের মাঝে, গুণগ্রাহী প্রতিটি ভক্তের মাঝে।

যারা তাঁর জীবনী নিষ্ঠার সাথে চর্চা করছেন, তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আমার লেখার পরিসমাপ্তি টানছি এবং দুআ চাইছি, এই মহা সাধকের জীবনের পরম শিক্ষনীয় বিষয়গুলো যেন নিজেদের জীবনে ধারণ করে উপকৃত হতে পারি। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন যুগে যুগে আলেমসমাজ তথা তাঁর ভক্তকুলের মাঝে চির জীবন উদ্ভাসিত থাকেন। আমীন।

লেখক :

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর মেঝ কন্যা

অন্তরঙ্গ আলোকে একজন মনীষী
আল্লামা খোতানী র.

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হওয়ার মুহূর্তটিতে মধ্য এশিয়ার উজবেক ও তুর্কমেন মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এসব এলাকার মুসলমানগণ হাজার বছরেরও অধিককালের বাসভূমি ত্যাগ করে পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের এ উপমহাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য ছিল গণ–অত্যাচারের লীলাভূমি। খ্রিস্টান জার সম্রাটদের নির্যাতনের হাত মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলিতেও প্রসারিত হতো। এজন্য জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন বলশেভিকদের ব্যাপক গণ–অভ্যুত্থান শুরু হয়, তখন মুসলিম মধ্য এশিয়াও এ আন্দোলনে সমভাবে শরীক হয়। বিপ্লবীরা অবশ্য এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, বিপ্লব সফল হওয়ার পর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। কিন্তু দেখা গেল ১৯১৭ সনে বিপ্লব সফল হওয়ার পর কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সে অঙ্গীকার পালন করার পরিবর্তে খ্রিস্টান প্রাধান্যবিশিষ্ট শ্বেতচর্ম ইউরোপীয় অংশের রুশীয়রা মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলোতে জার সম্রাটদের মতোই চিরকাল পদানত রাখার ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যায়ে আন্দোলন সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হয়। প্রায় এক যুগের এ প্রতিরোধ যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী অংশগ্রহণ করেন আলেম-ওলামা, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের ধর্মপ্রাণ শ্রেণীটি। তাই সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর এ শ্রেণীটিরই হতাবশেষ একটি অংশ প্রায় পর্যদুস্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হন।

আমাদের এ দেশে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে দু'জন বিরল প্রতিভাধর পুরুষ এ বাংলায় মনীষার ক্ষেত্রে কালজয়ী প্রভাব রেখে একের পর এক এদেশের মাটিতেই চির-নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

এঁদের একজন ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান আল কাশগরী। আরবী সাহিত্যের একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতরূপে স্বীকৃত আল্লামা কাশগরী প্রথমে লাখনৌর

নাদওয়াতুল-উলামা, পরে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ও সর্বশেষ ঢাকা আলিয়া মাদরাসার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে গেছেন। এক সময় তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলভীর পদেও বরিত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত কাব্যগ্রন্থ মিশরের আল-আজহারসহ আরব জাহানের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম আরবী বাংলা অভিধান 'আল মুফীদ' তাঁর তত্ত্বাবধানেই সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত 'আল কুরআনুল করীম' এর অনুবাদেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

তিনি নিজে বাংলা বুঝতেন। কথ্য বাংলা কিছুটা বলতেও পারতেন, কিন্তু পড়তে বা লিখতে পারতেন না। দশ কোটিরও বেশী সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও দরদ ছিল সীমাহীন। ছাত্রদের তিনি উপদেশ দিতেন। বলতেন, "যদি তোমরা নিজেদের মাতৃভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন না করতে পার, তবে দ্বীনের কোন খিদমত করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহপাক যখন যে দেশে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সে দেশের ভাষাতেই তাঁদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। নবী-রাসূলগণ সংশ্লিষ্ট জনগণের ভাষাতেই আল্লাহর কালাম জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন।"

আল্লামা কাশগরী ছিলেন আমার একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এবং আমি পুত্র-পরিজনহীন এ মহান জ্ঞানসাধকের নিকট পুত্রবৎ স্নেহলাভে ধন্য হয়েছি। আমি আল্লামা কাশগরীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করি ১৯৫৩ সনে। ঢাকার বাংলাবাজার এলাকায় ছিল তখন আলিয়া মাদরাসার একটি ছাত্রাবাস। আল্লামা কাশগরী ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। আমি ছিলাম সে মাদরাসার ছাত্রাবাসেরই একজন বাসিন্দা। আমার অবসর সময়ের প্রায় সবটুকুই কাটতো আল্লামা কাশগরীর ব্যক্তিগত পাঠাগারে। ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক আরবী, উর্দূ সাময়িকী আসতো তাঁর কাছে। এছাড়া প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসতো একাধিক পার্সেল। নতুন নতুন বই-এর এসব পার্সেল খোলার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর ন্যস্ত।

বিকাল বেলায় আল্লামা কাশগরী দ্বিতল ভবনের ছাদের একটি প্রশস্ত লনে বসতেন। এ সময় অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হতো তাঁর বৈঠকে। টুকটাক ফরমাশ খাটার উছিলায় আমি এবং আমার মত আরও দু'একজন এসব বৈঠকের এক একজন পরোক্ষ শরীকদার হওয়ার সুযোগ লাভ করতাম। এ সুযোগেই ছারছীনার মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন র., মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী, মুফতী দ্বীন মুহম্মদ খান প্রমুখ অনেক যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেছি।

আল্লামা কাশগরীর বৈঠকেই আমি দেখেছিলাম একদিন এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে। ইয়া চওড়া সিনা, প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত চোয়াল বিশিষ্ট গৌরকান্তি এ বিরাট পুরুষকে প্রথম দেখে মনে হচ্ছিল, হয়ত বা তিনি শিশুতোষ গল্পের অতি মানবীয় চরিত্রবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি। তাঁকে দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, স্বাভাবিক সালাম নিবেদন করতেও বুঝি ভুলে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য পরিচয় পেয়েছিলাম যে, ইনি আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী। আল্লামা কাশগরীর দেশের মানুষ। প্রায় একই সময়ে দেশ ত্যাগ করে এসেছিলেন এ উপমহাদেশে। প্রথম জন নদওয়ায় এবং দ্বিতীয়জন দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেছিলেন।

উস্তাদের বিশিষ্ট বন্ধু প্রথম প্রথম আল্লামা খোতানীকে উস্তাদের মতো সমীহ করে চলতাম। কিন্তু পরবর্তীতে কখন কিভাবে যে তিনি আদব-কায়দার সে আড়ালটুকু উড়িয়ে দিয়ে আমাকে প্রীতি ও বন্ধুত্বের উষ্ণ নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখন আর মনে করতে পারছি না। তবে মনে আছে, যখন তিনি আসতেন, আমার খোঁজ-খবর নিতেন। ডেকে জিজ্ঞেস করতেন। কী করছি, ভবিষ্যতে কী করবার ইচ্ছা, এসব বিষয় আলাপ করতেন।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার বাইরে সর্বপ্রথম হাদীসের উচ্চতর শিক্ষা টাইটেল জামাত খোলা হয় ছারছীনায়। টাইটেল পড়ানোর মত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক চাই। কিন্তু কে যাবেন তদানীন্তন বরিশাল জিলার অস্বাস্থ্যকর সেই পাড়াগাঁয়ে টাইটেল পড়াবার জন্যে? বিশেষত শহরেই যেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

কিন্তু গেলেন তিনি। আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী। ছারছীনার আজীবন সেই খোতানী হুজুর। অবশ্য শুনেছি, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ছিলেন ছারছীনার দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। শেরে বাংলার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন আল্লামা কাশগরী। কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকতা গ্রহণ প্রধানত শেরে বাংলারই অনুরোধের ফলশ্রুতি।

এই শেরে বাংলাই যখন আল্লামা কাশগরীকে ধরলেন ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার একজন যোগ্য হাদীসের উস্তাদ সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য, তখন আল্লামা কাশগরীই তাঁর বন্ধু আল্লামা খোতানীকে সম্মত করিয়েছিলেন এ খেদমতের জন্য।
আল্লামা খোতানী যে কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, তা মূল্যায়ণ করার যোগ্যতা বা সুযোগ আমার নেই। কারণ, তাঁর নিকট পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এ

ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেন তাঁর কৃতী ছাত্ররাই। যাঁরা আজ ছড়িয়ে আছেন সারা বাংলার বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে। তবে উস্তাদগণের নিকট শুনেছি যে, একমাত্র আল্লামা যফর আহমদ উসমানী ও আল্লামা মুফতী সৈয়দ আমীমুল এহসান ছাড়া খোতানী হুজুরের ন্যায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিস তদানীন্তনকালে আর কেউ এদেশে ছিলেন না। প্রথমোক্ত দু'জনের তিরোধানের পরও প্রায় একযুগ তিনি বেঁচেছিলেন এবং হাদীসের দরসেই নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় জীবনের সমাপ্তি অধ্যায়ে আল্লামা খোতানীই ছিলেন এ দেশের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ হাদীস বিশেষজ্ঞ।

আল্লামা খোতানীর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের এককালীন চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল সাহেব। দেওবন্দে পড়ার যামানায় নাকি দুজন একই কামরায় থাকতেন, একই জামাতে পড়তেন। এ বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত পারিবারিক বন্ধনের মতোই সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। জামিল পরিবারের সদস্যগণ আল্লামাকে তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যরূপে গণ্য করতেন। এককালে কর্ম সুবাদে উক্ত কোম্পানীর সাথে জড়িত হয়েই বোধ হয় আমি আল্লামা খোতানীর আরও কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তখন জামিল গ্রুপেরই একটি শাখা প্রতিষ্ঠান উর্দূ দৈনিক পাসবান-এ কর্মরত। আল্লামা ছুটিছাটায় ঢাকায় আসতেন এবং এসেই পাসবান কার্যালয়েও পদার্পণ করতেন। এখানে এসে সর্বপ্রথম খোঁজ করতেন আমার। সেদিন আমার আর কোন ডিউটি থাকতো না। আমার কাজ হতো তাঁর সান্নিধ্যে থাকা। এ সুবাদে আমি তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেতাম।

আমার কিন্তু বরাবরই কৌতূহল ছিল তাঁর প্রাথমিক জীবন এবং কমিউনিস্ট কবলিত তাঁর জন্মভূমি সম্পর্কে কিছু জানবার। কিন্তু যখনই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতো, তখনই তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ চেহারা কেমন যেন বেদনায় নীল হয়ে যেতো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। কিন্তু আল্লামা কাশগরীর মুখে শুনেছিলাম আল্লামা খোতানীর প্রথম জীবনের ছিটেফোঁটা কিছু ঘটনা। আর এসব ঘটনা যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি একজন আদর্শ মর্দে মুমিনের পরিচায়কও বটে।

আল্লামা কাশগরীর মুখেই শুনেছি যে, আল্লামা নিয়ায মাখদূম র. ছিলেন মধ্য-এশিয়ার খোতান এলাকার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান। কমিউনিস্টরা যখন মুসলিম এলাকাগুলোতে ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে, তখন আল্লামা খোতানী নতুন

যুবক। চোখ বুজে তিনি এ নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত হলেন না। জনপদের যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তিনি একটি গণবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং দীর্ঘ অর্ধযুগ ধরে সশস্ত্র জেহাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন মুসলমানদের রক্ষাব্যূহ পর্যুদস্ত হয়ে যায়, তখন মারাত্মক আহত অবস্থায় সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে তিনি চলে এসেছিলেন এ উপমহাদেশে। পেছনে তিনি রেখে এসেছিলেন প্রিয়তমা স্ত্রী এবং একটি শিশু সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে। এরপর তিনি আর তাদের কোন খবর পাননি। বোধ হয় এ কারণেই অতীতের সে প্রসঙ্গটি ছিল তাঁর জন্য খুবই বেদনাদায়ক একটি স্মৃতি। আর এ জন্যই বোধ হয় তিনি এ সম্পর্কিত কোন আলোচনাই করতে চাইতেন না।

আল্লামা খোতানী জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তাঁর সাক্ষাত পেতাম ঘনঘন। এ সময় তিনি 'মাসিক মদীনা' কার্যালয়ে তাশরীফ আনতেন।

১৯৮০ সালের ঘটনা। বাগদাদে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আরও কয়েকজন আলেম-ওলামার সাথে আমাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে বাগদাদ যাওয়ার জন্যে। সফরের ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত করার জন্য একদিন ঢাকাস্থ ইরাক দূতাবাসের জনৈক কর্মকর্তা মুহাম্মদ নূরী আসলেন 'মাসিক মদীনা' কার্যালয়ে। এর কিছুক্ষণ আগে আল্লামা খোতানীও তাশরীফ এনেছিলেন এখানে।

আমি বাগদাদ যাচ্ছি শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। বিশেষত হযরত ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম আবু ইউসুফ র., হযরত জুনায়েদ বাগদাদী র., হযরত সাররী সিকতী র., সাহাবী হযরত হুজায়ফাতুল ইয়ামান রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের রা., হযরত সালমান ফারেসী রা., প্রমুখ অনেকের মাযারে হাজিরা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। একটু আক্ষেপের সুরেই তিনি বললেন, আমার খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারলাম না।

মুহাম্মদ নূরী এসেই আমার সামনে উপবিষ্ট খোতানী হুজুরকে দেখলেন। তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেই কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলেন।

সালাম-মুসাফাহা এবং কুশল বিনিময়ের পর খোতানী হুজুরের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সারার পর নূরী বললেন, এইমাত্র যে উঠে গেলেন, এ বুযুর্গ লোকটি কে? তিনি আরও বললেন, জীবনে আমি এমন পবিত্র চেহারার মানুষ বোধ হয় আর দেখিনি। আমি হুজুরের

পরিচয় দিলাম। তখন তিনি বললেন, এ বুযুর্গকে কি তুমি বাগদাদ সফরের জন্য সম্মত করাতে পারো? যদি তিনি রাজী হন, তবে আমি তোমাদের সাথেই তাঁকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। একটু ধরা গলায় তিনি বলতে লাগলেন, ভাই! ইরাকের অধিকাংশ লোকই তো সে সব মহাপুরুষের আওলাদ। কিন্তু আমরা আজ অতীতের সে সব মহাপুরুষের রক্তধারার মর্যাদা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার মনে হয়, আমার দেশে এমন বুযুর্গ ব্যক্তির পা পড়লে এ যুগের ইরাকীরা কিছুটা অনুভব করতে পারবে, তাদের মহান পূর্বপুরুষেরা কেমন ছিলেন।

আমার মনে তখন অন্য অনুভূতি। ভাবছিলাম, আল্লাহ পাক তাঁর মকবুল বান্দাদের ছোট খাটো আকাঙ্ক্ষাগুলোও কি এমনিভাবে এমন ত্বরিৎ পূরণ করে থাকেন। মুহাম্মদ নূরীর আবেগময় কথাগুলো শুনে আমি বললাম, চল তাঁর আস্তানায় গিয়ে বলে দেখি তিনি রাজী হন কিনা।

যেইকথা সেই কাজ। মাত্র ঘণ্টখানেকের ব্যবধানে যখন আমরা তাঁর মসজিদের পাশে তাঁর আস্তানায় গিয়ে পূনরায় মিলিত হলাম, তখন প্রথমে তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেন। স্বভাবসুলভ আতিথেয়তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাওয়াতের কথা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

মুহাম্মদ নূরীকে বিদায় দেয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, আমার যে পাসপোর্টই নাই, যাবো কী করে? আমি দায়িত্ব নিলাম দ্রুত তাঁর পাসপোর্ট তৈরী করে দেয়ার। জামিল গ্রুপের আলহাজ্ব বশিরউদ্দীন তাঁর এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে লাগালেন পাসপোর্ট বের করার কাজে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সুপারিশও করেছিলেন। কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি হলো তিনি বাংলা বা ইংরেজিতে দস্তখত করতে পারেন না। ফরমে দস্তখত দিয়েছেন আরবীতে। কর্মকর্তা জানালেন, আরবী দস্তখত হবে না। অনেক ছুটাছুটি করার পর শ্রান্ত-ক্লান্ত মোজাফফর চৌধুরী এসে বললেন, না আর হলো না।
আমি বললাম, নিরক্ষর লোকেরাও তো পাসপোর্ট পায়। বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে তো পাসপোর্ট নেয়ার রেওয়াজ আছে বলে জানি। সুতরাং আরবী দস্তখতে যদি কাজ না হয়, তবে না হয় তিনি টিপসই দিয়েই পাসপোর্ট নিবেন।

মাত্র দু'দিন পর যাত্রা। এখনো পাসপোর্ট সংগ্রহ করা যায়নি। কিন্তু হুজুরের যেন তাতে কোন উদ্বেগ নেই। তিনি আসলেন পরামর্শ করতে 'পান নেয়ার কি ব্যবস্থা করা যাবে?' সে বাজারে পান কিনতে পাওয়া যাবে কিনা? আমি তাঁর সরলতা দেখে কৌতুক বোধ করলাম। কিছুটা বোধ হয় বিরক্তও হলাম। বিরক্ত চেপে

রেখেই বললাম, হুজুর! পাসপোর্টেরই তো কোন খবর নাই। যাওয়া হয় কিনা, তার ঠিক ঠিকানা নাই। আপনি চিন্তা করছেন পান-সুপারী নিয়ে।

তিনি হাসলেন! বললেন, আমি তো যেতে চাইনি। আল্লাহ তা'আলাই সুযোগ করে দিয়েছেন। বাকী ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তবে পানের ব্যবস্থাও আল্লাহতা'আলা করবেন, এমন কোন দলীল নাই। কারণ, এটা আবশ্যকীয় ছামানের মধ্যে পড়ে না। কথা কয়টি বলে তিনি হাসতে লাগলেন। এরপর তিনি একখানা হাদীস শোনালেন। যার মর্ম হচ্ছে, তোমার আয়ত্তে যতটুকু আছে, সেটুকু তুমি নিষ্ঠার সাথে কর। অবশিষ্টটুকু আল্লাহা তা'আলাই পূর্ণ করে দিবেন। এ ধরনের কথাবার্তার পর মোজাফফর চৌধুরী হুজুরকে নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে গেলেন। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাতে পাসপোর্ট নিয়ে ফিরে এসে বললেন, বুঝতে পারলাম না, কী থেকে কী হলো! সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হুজুরের চেহারা দেখেই কেমন যেন হয়ে গেলেন। পরম যত্নে তাঁকে বসিয়ে আর একটি কথাও না বলে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়ে দিলেন। আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে ভাবি, কী ছিল পবিত্র হাদীসের এ মহান খাদেমের চেহারায়?

শিশুর মত সরল এ মহাপুরুষের সাথে দীর্ঘ সফর করার সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা ক জন। তার মধ্যে দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক ও মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও তাঁর শাগরেদ। সফরের একান্ত সান্নিধ্যে হাসি-তামাশার অবতারণা হতো। কিন্তু খোতানী হুজুর হালকা প্রসঙ্গের মধ্যে কোন না কোন আলোচনা নিয়ে আসতেন। মনে হতো এমন কোন কথাও তিনি বলেন না, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যে কথাটির জন্য পরকালে তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে হবে।

হাসি-তামাশার মধ্যে তিনি একবার বললেন, দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতাবীকে একবার জনৈক পাশ্চাত্যদেশীয় পাদ্রী প্রশ্ন করেছিল– মাওলানা সাহেব! আমরা ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা এক বর্ণের সাদা মানুষ। আর এ দেশীয় মুসলমানরা কেউ গোড়া, কেউ শ্যামলা, কেউবা কালো, এমনটি কেন? এতেই কি বোঝা যায় না যে, আমরা এদেশীয় মুসলমানদের চাইতে উত্তম? মাওলানা কাসেম নাকি সাথে সাথে জবাব দিয়েছিলেন যে, "হ্যাঁ, বিষয়টি আমিও ভেবে দেখেছি। আমি এ পর্যন্ত যত গাধা দেখেছি, সবগুলিই প্রায় একবর্ণের। কিন্তু ঘোড়া সব একবর্ণের হয় না। কোনটা লাল, কোনটা কালো, কোনটা বা লাল-কালোর সংমিশ্রণ আবার কোনটা সাদা-কালোতে মিশানো।" কথা কয়টা বলে তিনি শিশুর মতো হাসলেন।

বাগদাদে অবস্থানকালে সকাল-বিকাল দুবেলাই তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন বিভিন্ন অলি-দরবেশ বা মহাপুরুষগণের মাযারে। ইমাম আবু হানিফা র. এর মাযার সংলগ্ন মসজিদে বসে তিনি হানাফী ফিকহ'র যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন, তা আমার নিকট একটা অনন্য বিশ্লেষণ বলে মনে হয়েছিল। সাথে সাথে 'এলমে ফিকহ'র ক্ষেত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষরও আমাদের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল।

আমাদের রাখা হয়েছিল 'বাগদাদ টাওয়ার' হোটেলে। ডাইনিং রুমে প্রতি ওয়াক্তেই দেয়া হতো খুব বড় বড় গোশতের টুকরাসহ পাকানো বিরিয়ানী। আমাদের অন্য এক সফরসঙ্গী মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী খোতানী হুজুরের কানে কানে একবার বললেন, হুজুর, আমার মনে হয় গোশতের এ বড় বড় টুকরাগুলো ঘোড়ার গোশত। বাগদাদের লোকেরা বোধ হয় ঘোড়ার গোশত খায়। দেখলাম, হুজুর বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। রাতের বেলায় আর খেতেই গেলেন না। সকালে নাশতার সময় আমাকে ডেকে বললেন, হানাফী মাজহাবে অবশ্য প্রয়োজনে ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু তা জেহাদের ময়দানে। আমরা তো আর জেহাদের ময়দানে নই। সুতরাং আমাদের পক্ষে এটা না খাওয়াই ভাল। আমি আর খাচ্ছি না। প্রথমে আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুপুরে খেতে গিয়ে দেখলাম, মেনু পরিবর্তিত হয়েছে। এবার মুরগীর বিরিয়ানীর সাথে মাছ এবং পর্যাপ্ত সবজি রয়েছে। খাবার টেবিলে বসেই শুনলাম মাওলানা কাসেমীর দুষ্টুমীর খবর। হাসলাম! মনে পড়লো হযরত আওরঙ্গজেব আলমগীরের উস্তাদ মোল্লা জীয়নের কথা। একবার মোল্লাজীকে কে যেন এসে খবর দিয়েছিল যে, হুজুর! আপনার বিবি-সাহেবানী বিধবা হয়ে গেছেন। এ কথা শুনে মোল্লা সাহেব পড়ানো ছেড়ে হুজরায় গিয়ে বসলেন। বিবি সাহেবার এত বড় একটা দুঃখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অনেকে এসে বুঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কে শুনে কার কথা? শেষটায় স্বয়ং সম্রাটকে আসতে হলো শ্রদ্ধেয় উস্তাদকে বুঝানোর জন্যে। সম্রাট আলমগীর বললেন, হযরত! কোন স্ত্রীলোকের বিধবা হওয়ার জন্য তার স্বামীর মৃত্যু হওয়া জরুরী। কিন্তু আপনি তো আল্লাহর রহমতে এখনো জীবিত আছেন। এমতাবস্থায় আপনার স্ত্রী বিধবা হলেন কী করে? মোল্লা সাহেব মাথা তুললেন। একটু চিন্তা করে বললেন, যে লোকটি আমাকে খবর দিয়ে গেল, সে একজন মুসলমান। কোন মুসলমান কি এমন ডাহা মিথ্যা একটা খবর দিতে পারে? তোমরা বরং ব্যাপারটা আরও একটু যাচাই করে দেখ।

খোতানী হুজুরের মধ্যে ছিল আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সে ধরনের সরলতা। কেউ কোন ফালতু কথা বলতে পারে, এটা যেন তাঁর ধারণাতেও আসতো না। বাগদাদ সফরের শেষ পর্যায়ে খোতানী হুজুর একদিন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন ফেরার পথে পবিত্র মক্কা-মদীনায় হাজিরা দিয়ে ওমরাহ ও যিয়ারত পালন করার সুযোগ গ্রহণ করতে। রাতের বেলাতে বোধ হয় এ আলোচনাই হয়েছিল। সকাল বেলায় শুনলাম, ওয়াকফ মিনিস্ট্রি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতীয় মেহমানগণের জন্য ফেরার পথে ওমরাহ ও যিয়ারতের সুযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। যাঁরা যেতে চান, তাঁরা যেন পাসপোর্ট জমা দেন।

আল্লামা খোতানী আমাদের মধ্যেই ছিলেন। তিনি এত বড় ছিলেন যে, তাঁকে মূল্যায়ন করার মতোও বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেউ নেই। ইলমের গভীরতার পাশাপাশি এবাদত-বন্দেগী এবং আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক অনন্য পুরুষ। আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং একমাত্র মাওলার সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনাচরণের লক্ষ্য। যাঁরা হাদীসের খেদমত করবেন, তাঁদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ সা. -এর প্রাণভরা দোয়া রয়েছে। তাই পবিত্র হাদীসের একজন আজীবন সেবক হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. একজন মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে কত বড় অলী ছিলেন, সে প্রশ্ন উত্থাপন করাই অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

লেখক :
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

অধ্যাপক আখতার ফারুক

ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর ইন্তিকালের সাথে সাথে বাংলাদেশ ভারত এমনকি উপমহাদেশের দীনী ইলমের গৌরব রবি অস্তমিত হলো। "একজন আলেমের মৃত্যু যেন গোটা আলম তথা জগতের মৃত্যু"–এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে এমন আলেমের বেলায়ই প্রযোজ্য। ইলমে হাদীসের অর্ধশতাব্দী কালের সেবক এ মহান মুহাদ্দিসের অন্তর্ধানের ফলে ইলমের জগতে যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল কতকাল চলবে তার জের, তা একমাত্র আলিমুল গায়েবই জানেন।

রুশীয় তুর্কীস্তানের সমরকন্দের খোতান অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী জন্ম গ্রহণ করেন। নিজ এলাকার শিক্ষায়তনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দীনী শিক্ষা শেষ করে তিনি তাঁর রাজ্যের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সেনানায়কত্ব লাভ করেন। তখন খোতান কেন্দ্রীয় জার শাসনের শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ এলাকার শাসকরা ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ইত্যবসরে রাশিয়ান মূল ভূ-খণ্ডে জার শাসন উৎখাতের যুদ্ধ শুরু হয় এবং এ যুদ্ধে তারা মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহায়তা গ্রহণ করে। কথা ছিল, জার শাসন উৎখাতের পর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু জারের পতনের পর কম্যুনিস্টরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের ওপর হামলা শুরু করে। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাজ্যগুলোর একদলকে হাতে নিয়ে অন্যদলকে শায়েস্তা করার কূটকৌশল অবলম্বন করে তারা একের পর এক রাজ্য জয় করে। বীর সেনানায়ক নিয়ায মাখদূম মুসলিম রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে কম্যুনিস্ট অগ্রযাত্রা রুখে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ঐক্য এত বিলম্বে সাধিত হলো, যখন তা আর ফলপ্রসূ হলো না। অগত্যা তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় দুর্গে অবস্থান নিয়ে শেষ লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হলেন। মাসাধিক কাল এ দুর্গে থেকে তিনি লড়াই অব্যাহত রাখলেন। এ ফাঁকে চতুর্দিক থেকে পঙ্গপালের মত কম্যুনিস্ট সেনারা এই অজেয় দূর্গ জয়ের জন্যে ছুটে এলো। দূর্গের চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য বেষ্টনী সৃষ্টি করে তারা প্রবল গোলা-বর্ষণের

সাহায্যে দূর্গপ্রাচীর ধসিয়ে দিলো। বীর সেনানায়ক নিয়ায মাখদূম তখন আত্মসমর্পণের বদলে শাহাদত বরণকেই শ্রেয় ভেবে সম্মুখ সমরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁর অধিকাংশ সহচর শাহাদাত বরণ করলেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন। সম্ভবত আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দেয়াবেন বলেই তাঁকে অভাবিতভাবে বাঁচিয়েছিলেন।

বেঁচে গিয়েও তাঁর সামনে হিজরত ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বেঈমান হয়ে দাসত্বের জীবন নিয়ে বাঁচার চাইতে তিনি দীন-ঈমান নিয়ে হিজরত করাকেই উত্তম ভাবলেন। তাই তিনি এমনকি স্ত্রী ও তাঁর সদ্যজাত সন্তান দর্শনের দুর্বলতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে হিজরতের জন্যে পাড়ি জমালেন। অশ্বারোহণে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে অশ্ব পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, কিন্তু তাঁর অটুট সংকল্পে তিলমাত্র ঘুন ধরল না। পদব্রজে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পথ অতিক্রম করে অবশেষে ভারতের সাহারানপুর পৌঁছলেন এবং অচিরেই দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিলেন। দেওবন্দে দাওরা হাদীস সমাপনান্তে তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ছারছীনার মরহুম পীর-এ কামেল মাওলানা শাহ নেছার উদ্দিন সাহেবের আমন্ত্রণক্রমে ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস হয়ে বাংলার জমিনে পদার্পণ করলেন। তারপর একটানা চল্লিশ বছর একই মাদরাসায় হাদীসের দরস দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র, ভক্ত ও অনুরক্ত বানিয়ে অবশেষে তিনি তাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর বুধবার নশ্বরধাম ত্যাগ করে আজিমপুর গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। মনে হয় বাংলার জমিনের উপাদান নিয়েই তিনি তুর্কীস্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর বাংলার জমিনে দেহ দান করে তিনি জীবনের সেই ঋণটুকু শোধ করে গেলেন।

মরহুম খোতানী হুজুর ছিলেন একাধারে মুজাহিদ, মুহাজির, মুহাদ্দিস ও উস্তাজুল আসাতিজা। তিনি শুধু শিক্ষাদাতাই নন; স্নেহপরায়ণ পিতারও দায়িত্বে সমাসীন- মরহুম তাঁর গোটা জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর অপরিসীম স্নেহের পরশে যে একবার স্নাত হয়েছে, তাঁর এ অন্তর্ধান তাদের প্রত্যেককে পিতৃহারা শিশুর মতই কাঁদিয়েছে। তাঁর অনুপম চরিত্রের সাথে তুলনা হতে পারে কেবল প্রাথমিক যুগের ঐতিহ্যবাহী মুসলমানদের। শরিয়তের হুবহু অনুসরণ ও ঈমান-আকীদার প্রশ্নে তিনি এতই মজবুত ছিলেন যে, স্বয়ং পীর সাহেবের দরবারেও

তিনি তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখলে বরদাশত করতেন না। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক আপোষহীন সৈনিক। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌড়বর্ণের সৌম্য শান্ত চেহারার এ ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাংলাদেশে সর্বদিক থেকেই অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিলেন। যেখানেই তিনি হাজির হতেন, সেখানে তাঁকে পাশ কাটিয়ে কিংবা পেছনে রেখে কারও কিছু করার বা না করার যোগ্যতা ছিল না; হিম্মত ছিল না। ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদের পার্শ্ববর্তী তাঁর বাংলাদেশী শ্বশুরালয়ে এসে কখনও বায়তুল মুকাররমে এলে সম্ভ্রমে তাকে সবাই ইমামতিতে বরণ করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। উল্লেখ্য, তাঁর এ স্ত্রীর গর্ভের সাতটি কন্যা সন্তানই তাঁর বংশধারা রক্ষার অনন্য মাধ্যম হিসেবে বেঁচে আছেন।

মরহুমের অসাধারণ ও অপরিমেয় জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে জ্ঞান সম্পর্কে নিউটন তাঁর জীবন সন্ধ্যায় যা বলেছিলেন, "আমি সবেমাত্র জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমির বালুকারাজী নিয়ে খেলা করছি"– ঠিক এ কথাটিই আজ আমার বারংবার মনে পড়ছে। মূলত সেই অগাধ জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে নিউটনের মত বালু নিয়ে খেলা করার দুঃসাহস আমার কখনও হয়নি, হয়েছে শুধু সমুদ্রের সেই বিশালতা মৌনমুখে বিস্ময় নিয়ে সসংকোচে নিরীক্ষণ করার। পড়াতেনও তিনি হাদীস ঠিক ঠিক মতই। তবে যে অসীম জ্ঞানের আধার মহানবী সা. এর হাদীস তিনি পড়াতেন, মনে হতো যেন স্বয়ং হাদীসকর্তার মুখেই আমরা তাঁর হাদীসের সকল রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের বিস্ময়কর লীলা অবলোকন করছি। কি সাইন্স-ফিলোসফী, কি বায়োলজী-এস্ট্রোলজী এক কথায় বিজ্ঞান ও দর্শনের যে-কোন দিক থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হতো, প্রশ্নকর্তা যেন ফলভারাবনত বৃক্ষে এক এক বার লোষ্ট্র নিক্ষেপণে এক একশ' ফল পেয়ে আশাতিরিক্ত ফল লাভে হতভম্ব হয়ে যেত। তাঁর কাছ থেকে বিদ্যালাভের পর এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুদের কাছে বিদ্যা নিতে গিয়ে কেন জানি মনে হতো, "আল্লা আল্লা বল ভাই ফিরে এলাম গোড়ায়।" বাংলার মাটির সৌভাগ্য যে, এমন এক মহান মনীষীকে তাঁর বুকে ঠাঁই দিতে পেরেছে। আল্লাহ পাক তাঁর চল্লিশ বছরের হাদীসের খিদমত কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে ঠাঁই দিন, এটাই আমার আজকের শোকাহত হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা।

লেখক :
বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক

মহান মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

দৈনিক ইনকিলাবের পাতায় তিন তিন বার তাঁর অসুস্থতার খবর ছাপা হওয়ায় না দেখলেও তিনি এখানকার সবার একরকম পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পাদকীয় বিভাগে বা নিউজ, রিপোর্টিং সেকশনে প্রবেশ করতেই অনেকে সাগ্রহে প্রশ্ন করতেন, কেমন আছেন তুর্কিস্তানী সাহেব? তাঁর কথা শুনে শুনে তাঁর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল অনেকেরই। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যাওয়ার। বলেছি– একটু সুস্থ হোক নিয়ে যাব। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক কথা শুনবেন, লিখে নিয়ে আসবেন। আমিওতো তাঁর জীবনের অনেক কিছুই জানি না। আমিও শুনব, নোট করে নিয়ে আসব। কিন্তু সে সুযোগ যে আর হবে না– তাকি আর জানতাম! এত তাড়াতাড়ি অমন একজন বীর পুরুষ বার্ধক্যে পৌঁছলেও সুঠাম সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী অমন অমিত তেজা মুজাহিদ– এভাবে যে বিদায়ের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন– তা বুঝতে পারিনি।

তাই ২৯ (অক্টোবর, ১৯৮৬) তারিখ সন্ধ্যের পরে মাননীয় ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এম. এ. মান্নানের টেলিফোনে যখন সংবাদ পেলাম যে, মাওলানা নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানী খোতানী হুজুর আর নেই– তিনি কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছেন, তখন নিজেকে যেন আর সামলে রাখতে পারছিলাম না। কেন যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না মন। যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল, যদিও রোগে ভুগে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তার সম্পূর্ণ জীবনী শক্তি, তবুও সুস্থ সুঠাম পৌরুষদীপ্ত এক বীর বাহাদুরের উজ্জ্বল মূর্তি তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। বার বার মনের কন্দর থেকে যেন একটা চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসতে চাইছিল, না, না- তিনি মরেননি, তিনি মরবেন না, মরতে পারেন না। আসলেও তিনি শুধু আমার কাছে কেন, এমনি আরও অনেকের কাছে, বহুজনের কাছে, হাজার হাজার মানুষের কাছে, ছাত্রের কাছে, গুণগ্রাহী ভক্তের কাছে বহু বহু দিন বেঁচে থাকবেন– অমর হয়ে থাকবেন। অমর হয়ে থাকবেন– একজন জ্ঞান-তাপস বিশারদ–মুহাদ্দিস হিসেবে, একজন সাহাবি চরিত্রের মহান মানুষ হিসেবে। প্রাচীন জ্ঞানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত তর্কশাস্ত্রবিদ, প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেমে দীন হিসেবে– সর্বোপরি একজন স্নেহপরায়ণ উস্তাদ হিসেবে। একজন ছাত্রের কাছে এই শেষোক্ত পরিচয়ই সবচে

বড় পরিচয় বলে আমার ধারণা। সেই পিত্রাধিক স্নেহ সত্যিই জীবনে ভুলবার নয়। আমরা তখন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবাসিক মাদরাসা ছারছীনা আলিয়ার ছাত্র। লিল্লাহ বোর্ডিং এর খানা খাই। হোস্টেলের চালটা ছিল নিম্নমানের। খেতে খুব কষ্ট হত। ৬শ'র মত ছাত্র। একদিন স্ট্রাইক করে বসলাম- ভাল চাল না দেয়া হলে আমরা ভাত খাব না। খানা পাক হয়ে গেছে সকাল ৯ টায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ দারুণভাবে উদ্বিগ্ন, তারা অসামর্থতার কথা বললেন, নানাভাবে বোঝালেন। কিন্তু সবাই অটল। এ সময় ডাকলেন খোতানী হুজুর- সবাইকে বললেন ছাত্র জীবনে নিজ ত্যাগের কথা। দিল কিছুটা নরম হল। সন্ধ্যায় শুনলাম তিনিও সারাদিনে কিছুই খাননি। শুধু তাই নয়। তাঁর বাসায়ও খানা পাকান বন্ধ রেখেছেন। তাঁর কঁচি কঁচি বাচ্চারাও না খেয়ে আছে।

বাসায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন- আমার ছেলেরা কেউ খায়নি। যতক্ষণে ওরা না খায় তোমরা কেউ খেতে পাবে না। এর পর কি আর স্ট্রাইক চলে? চল্লোও না।

ঐ যে তিনি নিজের জীবনের ত্যাগের কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে দু'এক সময় প্রসঙ্গক্রমে তাঁর দু'একটা কথা তিনি বলতেন। তাঁর জীবন ইতিহাস জানবার অসীম কৌতূহল ছিল আমাদের সবার। আমরা বলার জন্য আবেদনও জানাতাম মাঝে-মধ্যে। কিন্তু তিনি বলতে চাইতেন না। বলতেন, সময় নষ্ট না। করে কিতাব পড়। নিজেও তিনি পড়তেন প্রচুর। এমন একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধক জীবনে আমি আর দেখিনি। সর্বদাই তিনি রত থাকতেন অধ্যয়নে। একদিন ফজরের জামাতে চলেছি। দেখলাম, তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। ব্যাপার কি, কোন আঘাত পেলেন নাকি? না, তেমন কিছু নয়। বলতে চান না- বার বার অনুরোধের পর জানা গেল এ'শার নামাযের পর হাদীস খুলে দেখতে বসেছেন। এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না, খেয়াল ছিল না নড়ে বসবারও। মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আজান দিয়েছেন তখন ধ্যান ভাঙ্গল। বাঁ পায়ের ওপর একটু বেশী ভর করে বসে ছিলেন। এখন সে পা আর নাড়াতে পারছিলেন না। কি যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, তা যারা তাঁর সংস্পর্শে না এসেছেন, তাঁর ক্লাসে না বসেছেন তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। একটা হাদীস নিয়ে আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সপ্তাহর পর সপ্তাহ কেটে যেত। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে এ যুগের প্রখ্যাত আলেমদের কী মত তা অনর্গল বলে যেতেন। রেফারেন্স দিতেন সব কিতাবের। বলতেন- এ থেকে কোন মাসয়ালা বা বিধান বের করা হয়েছে- তা

বিশদভাবে। তিনি ছিলেন পাক্কা হানাফী। কিন্তু পাঠদানকালে কোন মাসয়ালা বা বিধানের আলোচনাকালে দেখতাম, এ সম্পর্কে এক এক করে সবার দলীলই সমানভাবে তিনি পেশ করে যাচ্ছেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে, যার মত যখন বলতেন, তখন তা এমন বিশদভাবে, তাদের সব যুক্তি-প্রমাণসহকারে বলতেন যে, মনে হতো এর বুঝি কোন উত্তর নেই। এভাবে ১০/১৫ বা ২০টি মত থাকলে তা বিস্তারিতভাবে পেশ করে তার পরে তিনি হানাফী ব্যারিস্টাররূপে অবতীর্ণ হতেন। মনে হত যেন, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী, আহলে হাদীস, শিয়া, মোতাজেলী, খারেজী এমনি সব মতবাদের ইমামরা তাঁর সামনে উপস্থিত। একটি একটি করে তাদের সব দলিল-প্রমাণ, কুরআন, হাদীস, দর্শন, যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করে আবার প্রত্যেকের সামনে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরতেন। ধরনটা এমন– যদি এই না হবে, তবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কী? আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হত তিনি যেন কোন যুদ্ধের ময়দানে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সমানে যুঝে চলছেন। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতেই হবে। এবং করতেনও। এমনভাবে করতেন যে, আর মাথা উঠাবার কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকত না। মনে পড়ে, ছোট্ট একটি হাদীস নিয়ে তিনি একাধারে একমাস এভাবে লেকচার দেয়ার পর বলেছিলেন, "ছোড়ো ভাই, আগে চলো, এয়সা আগার চলতে রাহে তো নেসাব খতম নেহী হোগা।" জ্ঞান সমুদ্রের এই ডুবুরী একটা মুহূর্তও ইলমী আলোচনা ছাড়া নষ্ট করতে চাইতেন না। এজন্য আমরা যখন তাঁর জীবন ইতিহাস জানতে চাইতাম, এড়িয়ে যেতেন।
তবু আমাদের জানতে ইচ্ছে হত কী করে তিনি এদেশে এলেন, সেসব কথা। আমাদের গভীর আগ্রহ দেখে কিছু কিছু তিনি বলে গেছেন তাঁর বিস্ময়কর জীবন ইতিহাস থেকে।

তুর্কজাতীয় লোক ছিলেন তিনি। মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ ও খোতান (রুশ-চীন) সীমান্তবর্তী এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দেশীয় রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং অল্প দিনের মধ্যে স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের বলে সেনাপতির আসন লাভ করেন। চীনের তীব্বতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল তুর্কিস্তান তখন কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র রাজা আর উপজাতীয় সর্দার শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সময় বিশ শতকের প্রথম ভাগ। কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তীব্রগতিতে। তারা

একের পর এক এলাকার ওপর নিজেদের.নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসক আমীররা তখন নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত, একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর। সুযোগ বুঝে কমিউনিস্টরা কখনও এর পক্ষ অবলম্বন করে ওকে ঘায়েল করছে, একের সঙ্গে দুস্তির ভাব করে অপরের উপর চড়াও হচ্ছে। এ সময় মুসলিম শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সাধারণ দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারলে রাশিয়া-তুর্কিস্তানের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখা হত। কিন্তু তারা তা করতে পারল না, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের শিকার হল। তারা একের বিপদে অন্যে শুধু চুপ করেই থাকল না; বরং নাস্তিক্যবাদী ধোঁকাবাজদের ছলনায় পড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জার শাসনের অবসান ঘটাতে পারলে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, তাদের ধর্মের ওপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের সে ওয়াদা কতদূর রক্ষিত হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাঁচ কোটি মুসলমানের লাশের ওপর কায়েম হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। যাক সে অন্য কথা। মরহুম তুর্কিস্তানী সে সময়কার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কখনও চোখের পানি ফেলেছেন, কখনও ক্রোধারক্ত রুদ্ধবাক হয়ে পড়েছেন। তখন মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা চেষ্টা চালানো হয়েছিল, সে চেষ্টায় তাঁরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। যদিও সামন্ত রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসেনি।

আমাদের খোতানী হুজুর যে রাজ্যের সেনাপতি– একদিন কমিউনিস্ট বর্গিরা সে রাজ্যে হানা দিল। লড়াই চলল মাসের পর মাস। কয়েকটা লড়াইতে জয়যুক্ত হয়ে তারা প্রধান দুর্গে যখন অবস্থান করছিলেন, এ সময় তিনি বাড়ি থেকে খবর পেলেন তাঁর একটি ছেলে জন্ম হয়েছে। জীবনের প্রথম সন্তান। স্ত্রী ও সন্তানের মুখ দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ছুটি নিলেন কিছুদিনের। ইত্যবসরে এল মারাত্মক দুঃসংবাদ। কমিউনিস্ট বাহিনী পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসছে পথের জনপদে আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে। কাছেই এসে পড়েছে তারা। লক্ষ্য তাদের এই দুর্গ। ছুটি বাতিল হল। সাহায্যের আবেদন পাঠানো হল বিভিন্ন স্থানে। প্রস্তুত হল মোকাবেলার জন্য। কমিউনিস্ট বাহিনী এসে অবরোধ করল দুর্গ। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অবরোধ চলল। এর মধ্যে সাহায্য এলো না। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট সৈন্যরা দুর্গের দেয়াল ধসিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শিলা ঝড়ের মত বুলেটের ঝড় বয়ে যাচ্ছে শাঁ শাঁ

করে। একে একে ধসে পড়ছে দুর্গের ওয়াল। বুলেটবিদ্ধ হয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করছেন সাথী মুজাহিদরা। মাথার ওপর দিয়ে, কাঁধের পাশ দিয়ে বুলেট চলে যাচ্ছে। পাশের সহকারী সৈন্যরা বুলেটবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। প্রচণ্ড গোলাগোলীর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন তিনি তিনতলা থেকে নিচে। দেখে ফেলেছে দুশমন। গুলী চালাচ্ছে তাই এদিক তাক করে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানী এদিকটা ফাঁকা। দৌড়ে চললেন তিনি সামনের দিকে। দুশমন তখন পিছু ধাওয়া করেছে। ঠিক এ সময় তিনি দেখতে পেলেন একটি তাজী ঘোড়া, জ্বিন পরানো সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে সওয়ার হলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে। পেছনের দিকে আর তাকালেন না। ছুটলেন সামনে– আরো সামনে। দিন-রাত বিরামহীন-বিশ্রামহীন একটানা দু'দিন। এসে পৌঁছলেন একটা নদীর তীরে। পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে ঘোড়াটা মারা গেল এখানে এসেই। কিন্তু তাঁকে তো আর থামলে চলবে না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি নদীবক্ষে। সাঁতরে পার হলেন নদী। এবার কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। চললেন ভারতের দিকে। অচেনা-অজানা পথ ধরে, সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছলেন তিনি ভারতের সাহারানপুরে– বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়। পেছনে পড়ে রইল জন্মভূমি, পড়ে রইল আত্মীয়-স্বজন।

একমাত্র ছেলে– শিশু-সন্তানের মুখ দেখ আর হল না, সাক্ষাৎ হল না আর প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনীর সাথে।

শুরু হল নতুন জীবন– সাধনার জীবন। এ জীবনকে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না, পৌঁছাতেই হবে সাফল্যের স্বর্ণ তোরণে।

ইচ্ছে ছিল তাঁর সমরবিদ্যা বিশারদ হওয়ার। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে ছিল তাঁর থেকে তাঁর পেয়ারা হাবীবের হাদীসের সেবা নেয়ার। তাই নিজের ইচ্ছে আর পূরণ হল না। তিনি দারুল উলূমের জ্ঞান সমুদ্রে মুক্তা আহরণে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মানতিক হিকমত ফালসাফা, ইলমে হায়াত ইত্যাদি বহু বিষয়ের সর্বোচ্চ সনদ হাসিল করলেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অগাধ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। দারুল উলূমের অধ্যয়ন ছাড়াও এ সময়ে তিনি আর্য পণ্ডিতদের নিকট গিয়ে এ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনে সচেষ্ট হন। যে বিষয় তাঁর ভাল লাগতো, তাতে পূর্ণতা অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি থামতেন না; তৃপ্ত হতেন না। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছিল

তাঁর অন্যতম হবি। এ কাজের সুবিধার জন্যে তিনি নিজে বেশ কয়েকটি 'উসতুরলুব' তৈরী করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উসতুরলুব থেকে এগুলো ছিল অনেক উন্নত ধরনের। মনে পড়ে, এ শাস্ত্র সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি এ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করেছিলেন, আমি এক নতুন নক্ষত্রের উদয় লক্ষ্য করেছি। এ নক্ষত্র বিশ্বব্যাপী বহু পরিবর্তন-বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করে; ইঙ্গিত বহন করে বিশ্বে এক মহান নেতার আবির্ভাবের। এ ছিল তাঁর বাংলাদেশে আগমনের অনেক পরের কথা। তাঁর এ দেশে আগমনের কাহিনীও চমকপ্রদ।

বরিশাল জেলার ছারছীনার পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারউদ্দীন আহমদ র. তখন এদেশে দ্বীনী সংস্কার ও ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের সাধনায় নিয়োজিত। তিনি খাঁটি নায়েবে রাসূল পয়দা করার মহান লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক আবাসিক মাদরাসা গড়ে তুলেছেন ছারছীনায়। তাঁর আশা, এখানে টাইটেল মাদরাসা খুলবেন, নবীর হাদীস পড়াবেন। কিন্তু বাধ সাধল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের আইন। সে আইনে তখন কোলকাতার বাইরে টাইটেল খোলার অনুমতি ছিল না। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। পীর ছাহেব শেরেবাংলাকে জানালেন তাঁর বাসনা। বাংলার বাঘ উদ্যোগ নিয়ে অচিরেই এ আইনগত বাধা অপসারণ করে ইসলামী উচ্চ শিক্ষার অর্গলিত দ্বার মুক্ত করে দিলেন। টাইটেল খোলা হল ছারছীনায়। এখন হাদীস পড়াবার জন্যে দক্ষ মুহাদ্দিস পাওয়া যাবে কোথায়? তিনি স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দে চেয়ে পাঠালেন মুহাদ্দিস। তাঁরা সেখান থেকে প্রধান মুহাদ্দিসরূপে পাঠিয়ে দিলেন জনাব নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানীকে বাংলাদেশের বরিশালের ছারছীনায়। তুর্কিস্তানের সেনাপতি, দারুল উলূমের সনদ নিয়ে বাংলার নিভৃত পল্লী-নারকেল-সুপারি বীথি বেষ্টিত ছারছীনায় এসে শুরু করলেন হাদীসের অধ্যাপনা। এই যে ইলমে হাদীসের জ্ঞান বিতরণ শুরু হল, মৃত্যু রোগের পূর্ব পর্যন্ত তা চলেছে একটানা অব্যাহত গতিতে প্রায় অর্ধশত বছর।

যেহেতু কোলকাতার বাইরে এটাই প্রথম ও প্রধান কামিল মাদরাসা- তাই বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর কাছে ইলমে হাদীসের তালীম ও সনদপ্রাপ্ত হাজার হাজার মুহাদ্দিস। তাঁর কাছে হাদীস অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করাটা ছিল

গৌরবের, মর্যাদার। সার্টিফিকেটে তাঁর দস্তখত বিবেচিত হয় সম্মানের প্রতীক হিসেবে। দেশের শত-সহস্র প্রখ্যাত আলেমের উস্তাদ, ইলমে হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ইসলামী উলূম-ফুনূনে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেই মহান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আজ আর নেই। গতকাল (৩০ অক্টোবর ১৯৮৬) অপরাহ্নে আজীমপুর গোরস্থানে কঠিন মাটির আবরণে তাঁর পবিত্র দেহ চিরদিনের মত ঢেকে দেয়া হয়েছে। আর কোন দিন তাঁকে দেখা যাবে না; আর কোন দিন তাঁর অমীয় কণ্ঠে রাসূলের হাদীস শোনা যাবে না– এ যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মন। তবু মানতেই হবে। প্রকৃতির এ যে চিরন্তন বিধান!

আজ এই বেদনাবিধুর মুহূর্তে তাঁর বিস্ময়কর জীবনের কত অলৌকিক ঘটনা, কত কথা, কত স্মৃতিইনা মনে পড়ে! কিন্তু গুছিয়ে বলার মত মানসিক অবস্থাও নেই; আর এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভবও নয়।

এদেশের নাগরিকত্ব লাভ সত্ত্বেও মূলত বিদেশী হওয়ায় তিনি কোন দিন এদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপেই অংশ নেননি। তবু দেশ স্বাধীন হবার পর পর কেন জানি না ঢাকায় তারা মসজিদের সন্নিকটে তাঁর বাসায় একদল সশস্ত্র ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাইফেল, লাইন মেশিন গান, এসএলআর প্রভৃতি আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত একদল লোক এসে আমার বাড়ির চারদিক ঘেরাও করে। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আমার বাসায় প্রবেশ করত 'খোতানী হুজুর কোথায়, খোতানী হুজুর কোথায়' এই বলে হাঁক ডাক শুরু করে দিল। আমি একটি কামরায় তখন দাঁড়ানো। কামরাটির দরজা খোলা। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বললাম, হে আল্লাহ! এ বিপদে তুমি ছাড়া রক্ষাকারী আর কেউ নেই! আমার স্মরণ পড়ল হিজরতকালীন রাসূলে পাক সা. এর ঘটনা। আমি পেয়ারা নবীর অনুসরণ করে হাতের কাছে যে ধুলোবালি পেলাম তা কুঁড়িয়ে নিয়ে সূরা ইয়াসীনের একটি বিশেষ আয়াত পড়ে তাতে ফুঁক দিয়ে চারদিক ছিটিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সশস্ত্র ব্যক্তিরা আমার ঘরের প্রত্যেকটি কামরা, পাকের ঘর, ঘরের সামন, পেছন, প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তন্নতন্ন করে আমায় খুঁজে বেড়াল। এমনকি ঘরের আলমিরা, বাক্স, প্যাটরা খুলে পর্যন্ত আমায় খুঁজলো। আমার সম্মুখ দিয়ে তারা আসা-যওয়া করছে। নিকট থেকে আমি তা দেখছি, কিন্তু আমায় তারা দেখছে না। এভাবে বহু সময় অনুসন্ধান করে তারা চলে গেল।

আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে আমি রক্ষা পেলাম। কী অলৌকিক ঘটনা! এযুগেও এমনটি হয়! হয়। যুগের তো দোষ নয়, দোষ মানুষের। ফেরেস্তা আজও নেমে আসতে পারে, তোমার সাহায্যার্থে এই জমিনে, যদি গড়ে তুলতে পার বদরের মত পরিবেশ। সে যুগের মানুষের মত মানুষ হলে এ যুগেও ঘটতে পারে অলৌকিক ঘটনা। আর তুর্কিস্তানী হুজুরতো এ যুগের অন্যদের মত ছিলেন না। স্বভাবে-চরিত্রে, জ্ঞানে-গুণে, স্পষ্টবাদীতায়, ন্যায়-নিষ্ঠায়, নির্ভিকতায় সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাহাবা চরিত্রের মানুষ।

তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ চেহারায় বিচ্ছুরিত হত নূরের আভা। কী করে তাকে এ যুগের মানুষ বলি? তাঁর ছিল বাংলাভাষা শেখার অসীম আগ্রহ। আমার ছোটভাই তখন ঐ মাদরাসায় পড়তো। তাকে ধরলেন বাংলা শেখানোর জন্যে। প্রথম শ্রেণীর বই থেকে বর্ণমালা এবং আরও দু'চার পৃষ্ঠা তিনি পড়ে ফেললেন। এরপর আর পড়া হয়নি তাঁর। কিন্তু কী আশ্চর্য! যখনই আমার ছোটভাই তাঁর কামরায় প্রবেশ করত, তখনই তিনি উঠে দাঁড়াতেন, উপস্থিত সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতেন- এ আমার ওস্তাদ- বলে। অথচ তথাকথিত এই ওস্তাদ তাঁরই বহু বছরের নগণ্য ছাত্র। তাঁর এ ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়ে বহু বার বলেছে, হুজুর! আপনি এরূপ করলে আমি খুব লজ্জা পাই, অনুগ্রহ করে এভাবে আমাকে গোনাহগার করবেন না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? তিনি এ আচরণ অব্যাহত রেখেছেন বছরের পর বছর।

এমনকি আমাদের সাথে দেখা হলেও তাঁর সেই ক্ষুদে ওস্তাদের কথা স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। আপত্তি করলে বলতেন, এক অক্ষর শেখালে সেও ওস্তাদ, তার তাজিম করা কর্তব্য। আজ ভাবি, হায় যদি আজ সেই ওস্তাদ-শাগরেদের সম্পর্ক থাকত, তবে বুঝি শিক্ষাঙ্গনে বেহেশত নাযিল হত। তিনি ছিলেন ওস্তাদ; সত্যিকারের ওস্তাদ। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর এই পরিচয়ই আমার কাছে আজ বড় বলে মনে হয়। আজ তাই আমার শেষ মুনাজাত– আয় আল্লাহ! তুমি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব কর। আমীন।

লেখক :
নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

আদর্শ মানুষ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান

প্রারম্ভিক কথাঃ

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 'খোতান' এর সীংগাঙ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

সীংগাঙ-এর পূর্ব নাম ছিল 'ইচলিকো' শহর। রুশীয় তুর্কীস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তবর্তী চীনের ভূ-খণ্ড কাশগরের দক্ষিণ পূর্বে 'খোতান' অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের উর্ধ্বে ও কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় 'খোতান' একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানেই তিনি লালিত পালিত হয়েছেন।

পারিবারিক জীবনে আদর্শঃ

পারিবারিক জীবনে আল্লামা খোতানী র. আদর্শ ছিলেন। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে, একজন স্বামী হিসেবে সর্বক্ষেত্রে আমরা তাঁকে আদর্শ মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। দৈনন্দিন প্রয়োজনে তিনি প্রায় সব কিছু নিজেই করতেন। নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার ঘাট, তরি-তরকারী ও মাছ-গোশত তিনি নিজ হাতেই ক্রয় করতেন। ছারছীনায় ছাত্র থাকাকালীন এ দিকটি সর্বদা লক্ষ করেছি। পরে শিক্ষক থাকাকালীনও এ বিষয়টি দেখেছি। ঢাকার বাসাতে অবস্থানকালেও তিনি সর্বদা নিজের কাজ নিজে করতেন, নিজেই বাজার করতেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সর্বদা নামায ও তিলাওয়াতের জন্য ভীষণ তাকিদ করতেন। নামাযে অবহেলা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। পবিত্র রমজান মাসের তারাবির সালাতে তাঁকে বিলম্বে জামাতে আসতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! আপনি বিলম্বে আসেন কেন? তিনি জবাব দিলেন-

گھر میں جو لوگ ہیں انکو لیکر جماعت سے نماز پڑھتا ہوں تاکہ کوئی غافل نہ بن جائے

"বাড়িতে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে জামাতের সাথে একত্রে নামায আদায় করি, যেন তারা অলস না হয়ে যায়।" প্রতি রমযান মাসে তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করাকে গুরুত্ব দিতেন।

আদর্শ শিক্ষক হিসেবে:

একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, তা আমরা আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর জীবনে দেখতে পাই। আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, পাঠদান পূর্ব প্রস্তুতি, শিক্ষাদানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ, দৃঢ় প্রত্যয়, সময়ানুবর্তিতা, ছাত্রাবাসের তদারকী এবং সুস্পষ্ট উপস্থাপনা ও সুবিন্যস্ত পরিবেশন ইত্যাদি গুণাবলি তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি ইলমে হাদীসের মধ্যে বুখারী শরীফ পাঠদান করতেন। কোন কারণ বশত যদি তিনি রাত্রে মুতালাআ (পূর্ব প্রস্তুতি) করতে না পারতেন, তাহলে ক্লাসে যেয়ে বলতেন,

آج مطالعہ کی فرصت نہیں ملی، آج میں نہیں پڑھونگا

"আজ রাত্রে পড়তে পারিনি, তাই আজ পড়াব না।" আমরা বলতাম, আপনি সর্বদা এ কিতাব পড়ায়ে থাকেন, তা আপনি পড়াবেন না কেন? তিনি জবাব দিতেন, "যদি কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয় তাহলে তোমরা তাই রেকর্ড করবে।"

দরস দেয়ার সময় প্রতিটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপন কালে তিনি প্রথমে কুরআন, হাদীস অতঃপর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের মন্তব্য উল্লেখের পর যুক্তির অবতারণা করতেন। একটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপনকালে মনে হতো, এটাই সঠিক মাযহাব। এর বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। আবার যখন অন্য মাযহাবের দলীল উল্লেখ করেতেন, তখন ঐ মাযহাবকেই যথাযথ মনে হতো। প্রথমে একে একে প্রতিটি মাযহাবের প্রতিটি দলীল পূণঃ উল্লেখ করে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে তার যথাযথ উত্তর দানকালে তাদের দলীলের অসারতা প্রমাণ করতেন। অতঃপর হানাফী মাযহাবের দলীল, কুরআন, হাদীস, ইমামদের মন্তব্য ও যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করে সকল মাযহাবের ওপর হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য প্রমাণ করতেন। সকল তাকরীর শুনলে কোন শ্রোতার মনে কোন প্রশ্ন থাকত না।

তিনি সারাটি জীবন হাদীসে জিব্রীলের ওপর আমল করে গেছেন অর্থাৎ, হাদীসের দরস দানের সময় অত্যন্ত আদবের সাথে নামাযে বসার ভংগীমায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন। হযরত ইমাম মালিক র. যেমন হাদীসের দরস দানকালে বিষাক্ত চেলার দংশনে যন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া সত্বেও দীর্ঘক্ষণ দরস দিয়েছিলেন, তারই অনুরূপ প্রমাণ আমরা আল্লামা খোতানী র. এর মধ্যে দেখতে পাই।

হাদীসের প্রতি আদব তাঁর মধ্যে এমন ছিল যে, যখনই হাদীস গ্রন্থ সাথে নিয়ে দরস দানের জন্য ক্লাসে যেতেন বা দরস শেষ করে স্বীয় বাসা বা কক্ষে ফিরে যেতেন তখন হাদীস গ্রন্থ সর্বদা তাঁর বুকের ওপর করে ক্লাসে যাতায়াত করতেন।

বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীসের দরস দানের নিমিত্ত বহু লোকজন তাঁর দরবারে ভীড় জমাতেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা এবং আরো অন্যান্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানে তিনি বহুবার খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে দরস দানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। বায়তুল মুকাররাম মসজিদের খতিব এবং ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন হেড মাওলানা মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক র. তাঁকে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় আনার জন্যে বহুবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছারছীনা ত্যাগ করতে পারেননি।

সামাজিক জীবনে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

ছারছীনার বিশ্ববিখ্যাত পীর মরহুম মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. ১৯৩৮ সনে ছারছীনা মাদরাসায় কামিল হাদীস (টাইটেল) ক্লাস চালু করলে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক-এর সহায়তায় কামিল (টাইটেল) মঞ্জুরী প্রাপ্ত হন। উঁচু স্তরের একজন মুহাদ্দিস চেয়ে মরহুম পীর সাহেব ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পত্র প্রেরণ করলে দেওবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লামা নিয়ায মাখদূমকে ছারছীনা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লামা খোতানী র. উস্তাদগণের নিকট আরো কিছুদিন গবেষণা করার আগ্রহ ব্যক্ত করলে প্রধান উস্তাদ বলেছিলেন,

تم میں جو علم عطاء فرمایا خود دیوبند بہی تمہارا محتاج ہے.

“তুমি যাও, তুমি যা শিখেছ, স্বয়ং দেওবন্দ তোমার মুখাপেক্ষী।”

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা খোতানী র. ছারছীনায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। **দীর্ঘ ৪০/৪১ বছর তিনি ছারছীনায় ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।** ইলমে হাদীসের অধ্যাপনার সাথে তিনি জন সাধারণের সাথে মেলামেশা করতেন। আগ্রহী ব্যবসায়ীদেরকে তিনি অর্থ-পুঁজি দিতেন। তাঁরা ব্যবসায়ের নির্ধারিত পরিসরে লভ্যাংশ আল্লামা খোতানী র. কে প্রদান করতেন। তাঁর সংসারে প্রচুর খরচ হতো। অধ্যাপনার পাশাপাশি ব্যবসায় দ্বারা সংসার চলতো। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর রেজিস্ট্রারে দেখা যায়, তিনি অনেক লোকের নিকট মোটা অংকের টাকা পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, (আমার জানামতে) সেই সকল লোক সকল অর্থ ফেরত দেননি।

তিনি সাধারণত আদর্শ খাদ্য গ্রহণ করতেন। তাঁর খাবার তালিকায় মুরগী এবং ঘি প্রায়ই থাকত। তিনি প্রায়ই বলতেন, ...تم اچھا کھانا کھاؤ" তোমরা ভাল খাবার গ্রহণ করো।" সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করত।

সেনাপতি হিসেবেঃ

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করেছিলেন, তখন তাকিয়ে দেখলেন, কম্যুনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় হতে চলেছে। খোদাদ্রোহী কম্যুনিস্ট হায়েনারা মুসলমানদেরকে খতম করার নেশায় উম্মাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করছে। ইসলাম, ঈমান ও মাতৃভূমির জন্য জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক ফুলে উঠলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মুজাহিদ হবেন। রক্ত দিবেন দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য। তিনি যোগদান করলেন মুসলিম সেনাবাহিনীতে। মেধা ও দক্ষতায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। খোতান ও তার সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের প্রচেষ্টা ও বাহিনী নিয়ে কম্যুনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারছিলেন না। তখন সেনাপতি নিয়ায মাখদূম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একজন সেনাপতির জন্য যা যা করণীয় তা তিনি করেছিলেন।

অতিথিপরায়ণ হিসেবে আদর্শঃ

আল্লামা খোতানী র. খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর নিকট কেউ সাক্ষাতের জন্য আসলে কিছু না খেয়ে কেউ ফিরে আসতে পারতনা। তিনি নিজ হাতে সকলকে আপ্যায়ন করতেন। নিজ হাতে গ্লাস-বাটি অন্দর মহল থেকে আনতেন বলে অনেক সময় আমরা সাক্ষাৎ করেই দ্রুত প্রস্থান করতে চাইলে তিনি বলতেন,

کیا کروں! اور تو کوئی گھرمی نہیں ہے

. "কি করবো! আর তো কোন পুরুষ মানুষ নেই।"

ব্যক্তিগত জীবনে খোতানী র.

ব্যক্তিগত জীবনে আল্লামা নিয়ায মাখদূম র. খুবই সরল-সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর চরিত্র মাধূর্য অত্যন্ত উন্নত ছিল। তিনি কাউকে কখনো ব্যথা দিয়েছেন বলে আমরা জানিনা। তাঁর সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি শোয়া থাকলে বসে পড়তেন। সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাঁর মধ্যে ব্যাপক ছিল।

আমি ছাত্রজীবন কাটিয়ে ছারছীনায় শিক্ষক নিযুক্ত হলাম। একদিন অভ্যাস অনুযায়ী আমি ছাত্রদের বাথরুমে যাচ্ছিলাম। হুজুর আমাকে ঐ দিকে যেতে দেখে ছাত্র মারফত ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে গেলে তিনি আমাকে বললেন,

دیکھوا بھائی اساتذہ کی دفتر میں جب تمہارا نام آگیا تو تم ادھر جایا کرو

"দেখ ভাই, শিক্ষকদের তালিকায় যখন তোমার নাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, এখন থেকে তুমি এদিকে যাবে। অর্থাৎ, শিক্ষকদের বাথরুমে যাবে।"

এমনি ধরণের বহু ঘটনা রয়েছে, যা তাঁর মহত্ব প্রমাণ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েঃ

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. দেশে-বিদেশে খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ উপলক্ষে যখন সৌদি আরব গমন করেছিলেন, তখন মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে একদিন কয়েকজন বাংলাদেশী ছাত্র (যারা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত) কয়েকটি বিষয়ে (যেমনঃ رفع يدين) প্রশ্ন করেছিল। হুজুরের জবাবে তারা প্রথমত সন্তুষ্ট না হওয়ায় হুজুর তাদের সাথে আসর হতে ঈশা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হজ্জের সফরে গিয়ে তিনি নিজের দেশ 'খোতান' এলাকার লোকজনের সাথে মিলিত হন এবং আপন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য আর্থিক সাহায্য ও উপহার-সামগ্রী প্রেরণ করেন।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. একজন বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুজাহিদ, মুহাদ্দিস ও মুহাজির। ইসলাম তথা ইলমে হাদীসের জন্য নিবেদিত প্রাণ আল্লামা খোতানী র. এর জীবন চর্চা করলে আমরা একজন নিষ্ঠাবান সাহাবীর জীবন ও চরিত্র লক্ষ করি। তিনি মুহাদ্দিসের পিতা ও শিক্ষা গুরু উস্তাদ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন এবং আমাদেরকে তাঁর রূহানী ফয়েয ও বরকতে ধন্য করুন। আমীন! আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আদর্শ মুসলিম হিসেবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারি।

و صلى الله على خير خلقه وعلى أله واصحابه اجمعين.

লেখক :

সাবেক অধ্যাপক ও ডীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ছারছীনা মাদরাসা এবং শায়খ খোতানী র.

-অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ কাফিল উদ্দীন সরকার সালেহী

সারাবিশ্বে কুরআন-সুন্নাহর প্রচার এবং প্রসারে শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে মুহাদ্দিসীনের অতুলনীয় ভূমিকা থাকলেও উপমহাদেশের ছোট একটি দেশ বাংলাদেশে হাদীসে রাসূল সা. এর প্রবেশের সুযোগ হয় পীর-ওলীগণের আগমনের মাধ্যমে। এ ধরণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওলীগণের দুঃসাহসিকতায় বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকালে ইসলাম প্রবেশ করে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর সূচনাকালে জগৎবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু এবং মুলতান জয় করার কারণে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রবেশ করলেও তখনো বাংলাদেশে ইসলাম প্রবেশ করেনি। এ অঞ্চলটিতে হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রভাব ছিল এতই বেশী যে, বিশাল এ এ্যরিয়া জুড়ে বীর বিক্রম আদিত্য, লক্ষণ সেন, গোবিন্দরাজ, জৈন্তা রাজা এবং রাজা পরশুরামের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। এ অঞ্চলসমূহের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হযরত ওমর রা. এর শাসনামলে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের অভিযানের প্রস্তুতি থাকলেও অত্যধিক নদ-নদীর দেশ হওয়ায়, সাহাবাই কেরামগণের সাঁতার না জানার কারণে অভিযান ব্যর্থ হয়। হযরত ওসমান রা. হাকীম ইবনে জাবালাকে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের পরিবেশ জরিপ করার জন্য প্রেরণ করলে তিনি হযরত ওসমান রা. এর নিকট নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করেন-

ماءها وشل ولصها بصل ان قل الجيش ضاع وان كثر جاع

"এটি হলো লোনা পানির এবং চোরের দেশ,যদি সৈন্য কম হয়, তাহলে তারা মেরে ফেলবে। আর যদি বেশী হয় হলে না খেয়ে মরবে।"

যে কারণে হযরত ওসমান রা. এর অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। আরব বণিকরা ব্যবসায়ের উদ্দেশে চট্টগ্রাম আগমন করলে বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আরব ব্যবসায়ীদের সাথে কতিপয় ইসলাম প্রচারক সূফী দরবেশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং তারা ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১২০৫ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গদেশে মুসলিম রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। (আব্দুল করীম, Social History of the Muslim in Bengal)

বাংলাদেশে হাদীস চর্চাঃ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশকে ইলমে কুর'আন, ইলমে হাদীসসহ ইলমে তাফসীর, ফিক্‌হ, আদব এবং আধ্যাতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশে, পথহারা বিভ্রান্ত মানুষগুলোকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ইলমে বাতিন তথা ইলমে মা'রিফাত এর শিক্ষায় নবী করীম সা. এর সুন্নাতের আদর্শে মরদে মু'মিন তৈরী করার মহান লক্ষ্যে পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ থানাস্থ এক কিলোমিটার উত্তরে, ছারছীনা গ্রামে সন্ধ্যা নদীর তীরে নয়নাভিরাম, মনোরম পরিবেশে যুগশ্রেষ্ঠ মুরশিদে কামিল হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী র. এর স্নেহধন্য খলীফা ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দীকী র. এর প্রধান খলীফা পীরে তরীকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত হযরত শাহ সূফী নেছারুদ্দীন র. (মৃ. ১৯৫২ খ্রি.) ক্ষুদ্র পরিসরে ১৯১৫ ইং সালের ১৫ জানুয়ারি "ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামিয়া-ই-ইসলামিয়া" নামে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। সিলসিলায়ে ত্বরীক্বতের সাথে সাথে প্রকৃত জীবন যেন আমলে-আখলাকে সুন্নাতের রাসূলের আদর্শে গড়ে ওঠে এজন্য তিনি তাঁর পীরের দু'আ ও এজাযতে ইলমে শরীয়ত এবং ইলমে মা'রিফতের সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরবনের গোলপাতা দ্বারা তৈরী হয়েছিল। এতে জামাতে উলা পর্যন্ত শিক্ষা চলতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এর উন্নতি এতই বেগবান হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে এই মাদরাসাটি পরিদর্শনে গেলে স্বপ্নের মত মনে হবে। একটি গাছ বড় হলে যেমন তার ভেতরে শৈশব হারিয়ে যায়, তেমনি বর্তমানে "ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামিয়া-ই- ইসলামিয়া" দেখলে একটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় মনে হবে যেন, এর বর্তমান অবয়বের মধ্যে শৈশব লুকিয়ে গেছে। ১৯৪৬ ইং সনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব সৈয়দ মুয়াজ্জেম হোছাইন ছারছীনা পরিদর্শন করে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, তা হলঃ "আমি এ বিষয় নিশ্চিত যে, সরকার এই প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবেন। এই মাদরাসার যথার্থ পরিচর্যা করিলে এবং সরকার উপযুক্ত যত্ন নিলে ইহা ভবিষ্যতে বাংলার "জামে আজহারে পরিণত হইবে"।

তাঁর এই মন্তব্যটি নিতান্তই মনের গহীন স্থান থেকে আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে বের হয়েছিল। তার বাস্তব প্রমাণ যে, 'ছারছীনা দারুসসুন্নাহ জামেয়া-ই-ইসলামিয়া' আজ বাংলার 'জামে আযহার 'এ পরিণত হয়েছে, এতে জ্ঞান পিপাসুদের দ্বিমত নেই।

তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা ছাড়া বাইরে কোথাও কোন হাদীসের সর্বোচ্চ দরসের ব্যবস্থা ছিল না । হযরত শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. গরীব মেধাবী ছাত্রদের কথা ভেবে এবং সহজে যেন শিক্ষার্থীরা ইলমে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, এজন্য তিনি মাদরাসা পরিচালনা কমিটির কোন এক সভায় এ ভাবে বলেছিলেন "গরীবের ছেলেরা জামাতে উলা পাশ করে হাদীস শরীফ শিক্ষার সুযোগ পায় না। অতএব আমার ইচ্ছা আমাদের এখানে হাদীস শরীফ পড়ার জন্য দাওরায়ে হাদীস খোলা হোক ।" শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. এর ইচ্ছানুযায়ী ১৯৩৮ইং সনে কোলকাতা থেকে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই এতে টাইটেল ক্লাস খুলে হাদীসের (1st year) শিক্ষাদান শুরু করা হয়। অতঃপর এখানে টাইটেল হাদীস দ্বিতীয় বর্ষ (2nd year) ও খোলা হয়।

১৯৩৯ ইং সনে মাস্টার এমদাদ আলী সাহেব, ১৯৩৪ সনের অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী জনাব নজিমুদ্দীনের ছারছীনা পদির্শন, স্যার এ কে ফজলুল হক, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দীকী র. এবং এ যাবৎকাল ছারছীনায় সরকারী-বেসরকারীভাবে সম্মানিত পরিদর্শকগণের ভিজিট নোটসহ কোলকাতার ডিরেক্টর জনাব মাওলা বখস এর নিকট এই বলে টাইটেল মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করেন "ছাত্রগণ দুই বৎসর টাইটেল পড়িয়াছেন, এখন পরীক্ষা মঞ্জুর না হইলে তাহাদের নিকট কী জওয়াব দিব?" ডিরেক্টর মাওলা বকস এই বছর কোলকাতা সেন্টারে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করায় হাদীস ক্লাসের পরীক্ষার্থীরা ১৯৩৯ ইং সনে কোলকাতা সেন্টারে পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করেন।

১৯৪২ ইং সনে বাংলার তৎকালীন মন্ত্রী স্যার এ কে ফজলুল হক শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় শর্ত রহিত করে মফস্বল এলাকা ছারছীনায় বাংলার সর্ব প্রথম সর্বোচ্চ হাদীসের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে টাইটেল বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করেন।

হযরত শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থেকে আজো এই বিশালাকারের বিশ্ববিদ্যালয় মানের দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার স্বকীয়তা হারায়নি। ইলমে হাদীসের চর্চার পাশাপাশি হাদীসে নববী সা. এর প্রকৃষ্ট আমল এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ ধরে রেখেছেন । বিশেষত মুরীদ মহলেও এর নমুনা দৃশ্যমান। ইলমে হাদীসের চর্চাকে বাংলাদেশের প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলমানের ঘরে পৌছে দিতে এই দরবারের পীরে কামিল ও প্রতিষ্ঠাতা শাহ সূফী

মাওলানা নেছারুদ্দীন র., তদ্বীয় পুত্র মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবু জা'ফর মুহাম্মদ সালেহ র. (মৃ. ১৯৯০ খ্রি.) এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সূফী হযরত মাওলানা মুহিব্বুল্লাহর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে পুরোদমে ইলমে হাদীসের খিদমত জারী আছে। বর্তমানে এই বৃহৎ দীনী প্রতিষ্ঠানটিতে কামিল জামাতে হাদীস, ফিকহ এবং তাফসীর বিভাগ রয়েছে।

কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার পর গবেষক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর ভাষায় "ইহাই একমাত্র অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় টাইটেল মাদ্রাসা" এবং একথাও স্বীকৃত যে এটি বাংলায় হাদীসের সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রথম টাইটেল মাদরাসা। মদীনার মসজিদে নববীর সংযুক্ত আসহাবে সুফফা রা. যেমন সার্বক্ষণিকভাবে রাসূল সা. এর থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গনে পা রাখলে এমনটি অনুভূতিতে আসে। ছারছীনা মসজিদের সংযুক্ত আজকের বিশাল তিন তলা ছাত্রাবাস (পূর্বে দ্বিতল ছিল) সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। এটি তৎকালীন সময়ে মূল মাদরাসা ছিল। ছারছীনার মসজিদের সাথেই প্রথমত দারুল হাদীস এখানেই ছিল। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতানী আত্-তুর্কিস্তানী র. এখানেই হাদীসের দরস দিতেন। উপমহাদেশের হাদীসের দরসগাহগুলো প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, অধিকাংশ তাসাউফ পন্থী আলিম ও পীর -মুরশিদগণ এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। খোদ ছারছীনা দরবারের পীর সাহেবগণ দ্বারা বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় সাড়ে চার হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কোন জ্ঞানপাপী মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত কারামতে পরিপুষ্ট অলী-আওলিয়াদের 'জিহাদ মা'আন-নাফস'এর মত সর্বোত্তম জিহাদের স্থানগুলোকে কোন গুনাহর জায়গা বানাতে না পারে এ জন্য ইলমে মা'রিফাতের সাথে ইলমে জাহির তথা ইলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁরা তাঁদের হালকায়ে জিকরের দরবার এবং খানকাহগুলোর পাশাপাশি এধরণের উচ্চস্তরের দ্বীনী শিক্ষা লাভের মহৎ উদ্দেশে এই বিশাল বিশাল দারসে হাদীসের প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট্ট শিশুর মত লালন করে বড় করেছেন। তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের যোগ্য উত্তরসুরিরা এর হাল ধরে রেখেছেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর দীনের খিদমত যেন কারো হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এজন্য দেশ বরেণ্য-জগৎ বরেণ্য মুহাদ্দিসদের নিয়োজিত রেখে ইলমে হাদীসের দারসকে সজীব রেখেছেন।

ফারেগে দেওবন্দ মেধাবী মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর সন্ধান লাভ করেন। নিয়ায মাখদূম খোতানী র. তখন দেওবন্দে অবস্থান করে সেখানে কুর'আন ও হাদীসের উচ্চ গবেষণায় রত ছিলেন।

পীরে কামিল আল্লামা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন র. উক্ত খোতানী র. এর যোগ্যতার কথা বুঝতে পেরে এবং তাঁর দ্বারা বাংলার হাদীসের মুখ উজ্জ্বল হবে উপলব্ধি করে ১৯৪৫ ইং সনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবের সহযোগিতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী এদারা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কে ছারছীনায় নিয়ে আসেন এবং "ছারছীনা দারুস সুন্নাত জামিয়া-ই- ইসলামিয়া" এর 'শায়খুল-হাদীস' পদে ৩০ জুন ১৯৪৫ ইং সনে নিয়োগদান করেন। তিনি নিয়োগ লাভের তারিখ হতে সুদীর্ঘ ৪১টি বছর শায়খুল হাদীস পদে অত্যন্ত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে বাংলার আলিমদের জ্ঞানভাণ্ডারকে ইলমে হাদীসের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। তাঁর এই ৪১ বছরে ইলমে হাদীসের খিদমতের পাশাপাশি তিনি পীরে কামিল হযরত শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন র. এর নিকট দশ লতীফার ফয়েয অর্জন করেন এবং নিয়মিত ইলমে তাসাউফ চর্চা করেন। লেবাসে-পোষাকে ও আমল-আখলাকে তিনি ছারছীনার মুরশিদে কামিলকে অনুসরণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তকে অযথা নষ্ট করেন নি। প্রতিটি মুহূর্তে কোন না কোন হাদীসের কিতাব তাঁর হাতে দেখা যেত। ছারছীনার আবুবকর হলের দু'তালায় ২২ নং কক্ষে অবস্থান করতেন। নিচ থেকে তাঁর রুমের দিকে তাঁকালে দেখা যেত যে, তিনি তাঁর পেটের উপরে কিতাব রেখে মুতালায়া করছেন। এ ধরনের অবস্থা হরহামেশাই দেখা যেত। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাদীসের জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা পঙ্গপালের মত ছারছীনায় ছুটে আসত এবং তাঁর দরসে শামিল হত। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে তাঁর হাদীসের দারস শোনার জন্যে দেশের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর দরসে হাদীসের ক্লাসে (মজলিসে) হাজির হতেন। তিনি তাঁদেরকে নিজের পার্শ্বে বসিয়ে হাদীসের দারস শুরু করতেন। মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর ভাব-গাম্ভীর্য ছিল ভিন্ন ধরণের। তাঁর প্রতি নজর দিলেই যে কোন ব্যক্তির উপলব্ধিতে আসত যে, তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি নন; বরং কোন বড় মাপের আলিম হবেন। পাগড়ী পরিধেয় অবস্থায় আমি তাঁকে আমাদের দরসগাহে আসতে দেখেছি। তিনি এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। দরসে হাদীসে তাঁর দরস বে-মিছাল ছিল। ইলমে হাদীসকে তিনি এতই মন্থন করেছিলেন যে, খৈ এর মত তাঁর যবান থেকে হাদীসে রাসূল সা.

আজ তাদের সেই জ্ঞানের বাগান থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু মধু-মক্ষিকার ন্যায় এই বাগানগুলোতে এসে জ্ঞান আহরণ করে দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই জ্ঞান পিপাসু মৌ -এরা জানেনা যে, এসকল জ্ঞানের বাগানের প্রতিষ্ঠাতাগণ ছিলেন এ দেশেরই যুগশ্রেষ্ঠ পীর -মাশায়খ ওলামায়েকেরাম।

হযরত শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. শুধু তাসবীহ ওয়ালা দরবেশ ছিলেন না বরং ইলমে জাহের এবং ইলমে বাতিনের সমন্বয় সাধন করে তালীম তারবিয়াতের বাতেনী কেন্দ্র খানকা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইলমে জাহেরের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া-এ ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইলমে জাহির ও বাতিনের মহান মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতেই মূলত ছারছীনা মাদরাসার জন্ম ইলমে বাতিনের বাগানে শ্রেষ্ঠ অলীর অবস্থান নিশ্চিত হলেও ইলমে জাহির তথা ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামিয়া ইসলামিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ আমলী মুহাদ্দিসের প্রয়োজন উপলব্ধি করায়ই মূলত শায়খ খোতনী র. এর ছারছীনায় আগমন।

<u>শায়খুল হাদীস নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এবং দরসে হাদীসঃ</u>

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া-ই-ইসলামিয়া' মাদ্রাসার শায়খুল -হাদীস । হাদীয়ে বাঙ্গাল আল্লামা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন (র.) দরসে হাদীসের খিদমতকে সজীব করে তুলতে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের বিষয়টি দারুনভাবে উপলব্ধি করেন । এত বিশাল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার যেমন বাংলার যমীনকে ইলমে তাসাউফের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, ইমাম মালিক র. এর ভাষায় ঃ

"من تفقـه و لم يتصوف فقد تفسـق ومن تصوف و لم يتفقـه فقد تزنـدق, ومن جمع بينهما فقد تحقق".

'যে ব্যক্তি ইলমে ফিক্‌হ (ইলমে জাহির) অর্জন করল কিন্ত ইলমে তাসাউফ (ইলমে বাতিন) অর্জন করল না, সে ফাসিক (নাফরমান)। আর যে ব্যক্তি ইলমে তাসাউফ অর্জন করল, কিন্তু ইলমে ফিকহ (শরীয়ত) অর্জন করল না, সে নাস্তিক (অবিশ্বাসী)। আর যে ব্যক্তি উভয়জ্ঞানের অধিকারী হলো, সে সঠিক কাজটি করল।'

তেমনি বাংলার মাটিতে ইলমে হাদীসের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে ইলমে শরীয়তের একজন সেরা মুহাদ্দিস খুঁজতে গিয়ে তিনি মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী তুর্কিস্তান অন্তর্গত খোতান অঞ্চলের সীংগাঙ গ্রামে জন্ম গ্রহণকারী সদ্য

ফুটে উঠত। মনে হয় মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নবী করীম সা. এর সরাসরি ফায়েযে হাদীস বর্ণনা করছেন। তাঁর জেহেন-যাকাওয়াত দেখলে ইমাম বুখারী র. এর কথা মনে পড়ত। যেহেতু তিনি বুখারা এলাকার নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে ইমাম বুখারী র. এর প্রেম অত্যধিক পরিমাণে ফুটে উঠত। কখনও ইমাম বুখারী র. এর বুখারী শরীফ পড়াতে গিয়ে নিজে বুখারী সেজে যেতেন। আজো তাঁর দরসে হাদীসের কথা মনে পড়ে। তিনি ইলমে নুজুমেরও পন্ডিত ছিলেন।

ছারছীনা দরবার সম্পৃক্ত "ছারছীনা দারুস সুন্নাত জামিয়া-ই- ইসলামিয়া". মাদরাসায় শায়খুল-হাদীস হিসেবে তাঁর স্থায়ীত্ব অন্যান্য মুহাদ্দিসের তুলনায় অনেক বেশী। ইলমে হাদীসের দরসে তাঁর অবদানও অনেকগুণে বেশী। এ জন্য তিনি বাংলাদেশের অসংখ্য মুহাদ্দিসের উস্তায ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৪৬ -১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তাঁর নিকট সর্বমোট ২৮৫৮ জন ছাত্র হাদীস শিক্ষা করেন।

শায়খ খোতানী র. এর সহীহ বুখারী শরীফের পাঠদান পদ্ধতি :

"ছারছীনা দারুস সুন্নাত জামিয়া-ই- ইসলামিয়া "-এ শায়খ খোতানী (র.) প্রধানত বুখারী শরীফ পাঠদান করতেন। আমি যখন ছারছীনায় কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তখন দেখেছি যে, তিনি প্রথমত সনদের রাবীদের পরিচয় তুলে ধরতেন। রাবীদের জীবনেতিহাস এতই তাঁর জানা ছিল যে, অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাঁকিয়ে শোনা ছাড়া আর উপায় ছিলনা। অতঃপর তিনি হাদীসের সরল তরজমা বলে তারজমাতুল-বা'বের সাথে হাদীসের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে গিয়ে যে জ্ঞানের অবতারণা করতেন, তা কাছে থেকে না দেখলে বুঝিয়ে বলা বড়ই মুশকিল। হাদীসে বিদ্যমান কোন জটিল শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানসহ তিনি এর উপরে আলোচনা করতে গিয়ে যখন মাসাইলের ইখতিলাফ বলা শুরু করতেন তখন, মনে হত তিনি হাফিযে ফিক্‌হ। হাফিযে কুর'আনের মত অসংখ্য ইমামের অভিমত, তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন, এবং তাদের আপত্তি খণ্ডন করে সহীহ মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেন।

শায়খ খোতানী র. র. এর জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, "মাহমূদুল হাসান দেওবন্দি এর পর খোতানী

হুজুরের মত বড় মুহাদ্দিস আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে সৃষ্টি হয় নি।" তিনি শুধু বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস 'হাদসে নিয়্যতের' উপরে ১৫ টি দারস দিয়ে বলেছিলেন যে, এই একটি হাদীসের উপরে ৩০ দিন একমাস তাকরীর করলেও শেষ হবে না । কারও কারও মতে " إنما الأعمال بالنيات হাদীসের উপরে নাকি হুজুর একাধারে প্রতিদিন ২/৩ ঘন্টা করে এক মাস, কেউ বলেন তিন মাস আলোচনা করেছেন যাতে কোন দ্বিরুক্তি ছিল না।[১]

ইলমে হাদীসে হযরত খোতানী র. এর জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায ছারছীনা মাদরাসার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুললাহ র. (মৃ.১০ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি.) বলেন : "দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল । হুজুরের দরসে বসার সুযোগ আল্লাহ পাক দিলেও হুজুরের ইলমের আন্দাজ করার মত ক্ষমতা আমার তখন হইল না । সত্য বলিতে গেলে এখনও আমি জানি না যে, হুজুর কতখানি এলেম রাখিতেন। আর তাহা জানিবই বা কি করিয়া? হুজুরতো তৎকালীন উন্নত দেওবন্দ দারুল উলূম মাদরাসার মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা এজাজ আলী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এর দরসগাহের প্রথম স্থান অধিকারক ছাত্র। তাই তিনি যে শুধু ইলমে হাদীসেই মাহের ছিলেন, তাহা তো নয়। তাফসীর, ফিকহ, আকায়েদ, আদব, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতেক, হেকমত ও ইলমে হাইয়াত, এ সকল বিষয়েই তিনি সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাই মাত্র কয়েকদিন তাহার হাদীসের দরসে বসিয়াই তাহার ইলমের আন্দাজ করার দাবী অন্তত আমি করিতে পারি না।"

তিনি মূলত অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীসের ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর ধারণা এতই স্বচ্ছ ছিল যে, তাঁর আলোচনা শ্রবণ করে সহজেই হাদীসের মর্মার্থ বুঝে আসত। ইলমে হাদীসের সমকালীন জগতে তাঁর নজীর বড়ই বিরল। তিনি আলোচনা করলে মনে হত যে, হাদীসের ব্যাখ্যা জীবনভর শেষ হবে না। হাদীস বর্ণনায় তিনি এতই পারঙ্গম ছিলেন যে, নির্ঝর প্রস্রবণের ন্যায় তাঁর চারু ওষ্ঠ পল্লব হতে অভাবনীয় কথাগুলো মণি-মুক্তার মত বের হতে

---

[১]. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ , শায়খুল হাদীস আললামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতানী আত্ তর্কিস্তানী (রহঃ) , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

থাকত । চাতক পাখির মত চেয়ে থাকা জ্ঞান পিপাসুরা তম্ময় হয়ে শ্রবন করতে করতে হাদীসে রাসূল সা. এর মহাসমুদ্রে তলিয়ে যেত। তখন হাবীবে খোদা রাসূলে মুস্তফা সা. এর আশেক হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকত না।
শায়খ খোতানী বুখারী নিয়মিত খতম করতেন। দৈনিক তিলাওয়াত করতে করতে খতম হত ৩০পারা। আবার শুরু করতেন প্রথম থেকে। এভাবে চলছিল মৃত্যু অবধি। জানতে পারিনি এ ভাবে তিনি কতবার বুখারী শরীফ খতম করেছিলেন। শায়খ খোতানীর অনেক ছাত্রের নিকট শুনেছি, স্বয়ং ইমাম বুখারী র. এর নিকট স্বপ্নে বহুবার বুখারী শরীফ পড়েছেন তিনি। শায়খ খোতানী র. এর শেষ বয়সের ছাত্র আমরা। তিনি তাঁর এই বার্ধক্য বয়সে কখনও পা মেলে দারস দিতে দেখিনি। সুস্থ-অসুস্থ সকল ডান হাতে সহীহ বুখারীর মত ভারী কিতাব ধারণ করাবস্থায় তিনি বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে ঠেস দিয়ে দারস চৌকিতে বসে আত্তাহিয়্যাতু সূরতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাদীসের দারস দিতেন।

শায়খ খোতানী র. এর ইলমে তাসাওউফে দীক্ষা:

গায়ে ছিল কাবলী পোশাক, টুপি ছিল দেওবন্দী- দরসে হাদীসে শায়খ খোতানী জ্ঞানে অতুলনীয় হলেও আমল সহীহ হওয়ার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছারছীনায় এমন একজন মুহাদ্দিস বেমানান । যে কারণে আমলী ইসলাহ করার উদ্দেশে দাদা হুজুর কিবলা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ রহ. তাকে একদিন বাদ মাগরিব মসজিদে জিকিরের হালকায় জিকিরে বসার অনুরোধ জানান। জনাব শায়খ খোতানী র. হালকায়ে জিকিরে বসলেন। জিকির- আজকার শেষ হলে দাদা হুজুর কিবলা র. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন "কিয়া খোতানী কুচ সামজ মে আয়া"? 'খোতানী কিছু বুঝে এসেছে? তিনি পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিলেন "কুচ নেহি", কিছুই বুঝি নাই।

ইলমে বাতিনের এতবড় মার্কাযের পাশে. ইলমে জাহিরের মারকায ছারছীনা মাদরাসার এমন একজন মুহাদ্দিসের পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। এজন্য আল্লাহর মাকবুল ওলী হযরত দাদা হুজুর কিবলা তাঁকে আগামী কাল বাদ ইশা কুতুবখানায় আসার জন্য অনুরোধ জানান।
পরদিন বাদ ইশা দাদা হুজুরের দরবারে খোতানী হুজুর হাজির হলে দাদা হুজুর কিবলা তার সাথে কুশল বিনিময় করেন। অতঃপর তিনি তাকে আত্তাহিয়্যাতু সূরাতে বসার অনুরোধ জানান। শায়খ খোতানী র. অত্যন্ত আদব ওয়ালা আলিম

ছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় সেভাবে বসলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মাটিতে পড়ে গিয়ে ডাঙ্গায় তুলে আনা মাছের মত মাথা এবং হাত পা ঝাঁকাতে লাগলেন। এভাবে ১৫-২০ মিনিট যাবার পরে দাদা হুজর কিবলা র. তাকে ডেকে তুললেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন "কিয়া খোতানী কুচ সমজমে মে আয়া"। খোতানী সাহেব কিছু বুঝে এসেছে? প্রতি উত্তরে তিনি বলে উঠলেন-

মাই মক্কা ভী গেয়া, মদীনা ভী গেয়া। আওর সারী দুনিয়া মাইনে তায় কিয়া। "আমি মক্কাও গিয়েছি মদীনা মুনাওয়ারাও গিয়েছি, গোটা বিশ্ব আমি ঘুরে এসেছি।

সেখানে দাদা হুজুর র. এর খাদেম পটুয়াখালী জেলার চৌদ্দবুড়িয়া এলাকার হযরত মাওঃ সূফী আব্দুল মালেক র. একমাত্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি দাদা হুজুরকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এমন একজন মুহাদ্দিসকে পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতে নববীর ধারায় প্রতিষ্ঠা করতে বহু বছরের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী তার প্রতি দশ লতীফার ফায়েজ দিয়ে কয়েক মিনিটে কয়েক বছরের পথে এগিয়ে এনেছি। اولیاء را هست قدرت باخوا

এভাবে ইলমে বাতিনে তথা তাসাওউফের জগতে শায়খ খোতানী র. প্রবেশ করেন এবং এক সময়ে শ্রেষ্ঠ বুযুর্গে পরিণত হন।

<u>আমার দেখা আল্লামা খোতানী র.</u>

শায়খ খোতানী র. বড় মাপের একজন কোমল মেজাযী ব্যক্তি ছিলেন। আমি কাছে থেকে একদিন ছাড়া তাকে কখনো রাগ করতে দেখিনি। শায়খ খোতানী র. একদিন গোস্বা করে ফেললেন- গোস্বার কারণ ছিল, তিনি চেয়েছিলেন একমাস ধরে শুধু বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস انما الاعمال بالنيات এর ব্যাখ্যা করে পড়াবেন। ক্লাসে সহীহ বুখারীর ইবারত অধিকাংশ সময়ে আমি পড়তাম। কিন্তু সেদিন আমাদের এক ক্লাসমেট নিয়্যতের হাদীসের তিলাওয়াত না করে পরবর্তী মা আয়েশার হাদীস তিলাওয়াত করলে খোতানী হুজুর রাগ করে ক্লাস থেকে এই বলে উঠে যান যে, আমি চেয়েছি তোমাদেরকে নিয়্যতের হাদীস পড়াব একমাস। আর তোমরা পনের দিনের মাথায় পরবর্তী হাদীসের ইবারত পড়লে।

আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনি কতবড় মাপের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। একটি নিয়্যতের হাদীসের তাকরীর ১৫ দিন পার হওয়ার পরেও শেষ হয়নি, একমাস লাগবে। পরবর্তীতে আমরা হুজুরকে রাজী করাই । আজো তার স্মৃতি বিজড়িত নিয়্যতের হাদীসের তাকরীর আমার নিকট আছে।

তিনি জন্মগতভাবে সৈনিক ছিলেন। তিনি দরসে হাদীসের শুরুতে নিজের পরিচিতি দিতে গিয়ে বলতেন যে, ছোটকালেই মা-বাবা আমাদেরকে কুফর এবং কাফিরদের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর জন্য কচু গাছের নিকট নিয়ে তা কেটে ফেলে ঘৃণার উদ্রেক সৃষ্টি করতেন।

আমি তার জীবদ্দশায় ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত জামিয়ায়ে ইসলামিয়ার শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। চাকরির প্রথম দিনে ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে তার অনুমতি নিতে গেলে তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তুমি একদিন বাংলার হাদী হবে, তোমার দ্বারা মহান আল্লাহ ইলমে হাদীসের খিদমত নেবেন। তিনি আবেগী কণ্ঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্লাসে যাবার অনুমতি দিলেন।

তিনি ইলমে নজমের মহাপণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছারছীনা ছাত্রাবাসের ছাদে উঠে আসরের পরে হুজুরের সাথে পায়চারিতে শরীক হতাম। তিনি ছারছীনা মাদরাসার মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ করে বলতেন "আযানটি আর একটু পরে দিলে ভাল হত।"

লেখক :
অধ্যক্ষ, ঢাকা নেছারীয়া কামিল মাদরাসা

আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

অধ্যাপক এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ

প্রাথমিক কথা:

বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষাদান, হাদীস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রূহানী ও জিহাদী চেতনায় প্রভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ ও সৌম্য দর্শন লাবণ্যময় দেহের অধিকারী ছিলেন কালজয়ী অমর প্রতিভাধর আল্লামা খোতানী র.। তিনি ছিলেন ইলমুল হাদীসের জীবন্ত চলমান বিশ্বকোষ। সুন্দর সুঠাম লাবণ্যময় দেহ, মিষ্টভাষী, অমায়িক দেহের অধিকারী এ মহান ব্যক্তির ঈমানী রূহানী ও ইলমে জ্যোতির্ময় প্রভাদীপ্ত মুখমণ্ডল এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দর্শনেই যে কোন ব্যক্তি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়তো।

এ অনুপম ও দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন একজন আদর্শ মুহাদ্দিসের প্রতিকৃতি। তিনি ছিলেন জ্ঞান রাজ্যের নীরব সাধক ও আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক। চার দশকের অধিককাল যাবত তিনি ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে জ্ঞান চর্চা, অতুলনীয় শিক্ষা দান, দক্ষ উপস্থাপনা, কল্যাণকামী অভিভাবক, নিষ্ঠাবান বন্ধু, স্নেহপরায়ণ পিতা, অমায়িক আচরণ, বাৎসল্য ও মমতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। এ মর্দে মুজাহিদ, জ্ঞানসাধক, সিংহপুরুষ, আদর্শ শিক্ষকের সকল বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে আদর্শ শিক্ষকতার বাস্তব নিদর্শন রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমস্ত মানবকুলের জন্য জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিখুঁত নির্ভুল ও পরিপূর্ণ আদর্শ হচ্ছেন সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন খাতামুন নাবিয়্যীন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূল এর জিন্দেগীতেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ ।" (আলআহযাব-২১)

বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব জীবনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ অভিভাবক, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ শিশু, আদর্শ কিশোর, আদর্শ যুবক, আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ও আদর্শ চরিত্র সংগঠক এবং আদর্শ রূহানী প্রশিক্ষক। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যে ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ তিনি রেখে যাননি।

যে সকল মূর্খ বলে থাকে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্খ ছিলেন, তাদের চেয়ে গবেট-মূর্খ দুনিয়ার বুকে আর কেউ হতে পারে না। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তরফ হতে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ যার শিক্ষক, তার চেয়ে মহান আদর্শ শিক্ষক সৃষ্টি জগতে আর কেউ হতে পারে না।

কুরআন হাকিমে ইরশাদ হচ্ছে:

(الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ)

"দয়াময় প্রভু। যিনি আল-কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আররহমান, ১-২)

শিক্ষকতা ছিল রাসূলের (সা.) জিন্দেগীর অন্যতম মিশন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)

"আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ মুমিনদের প্রতি, যিনি তাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন; যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে সুসভ্য, মার্জিত ও বিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব, বিজ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা দেন, যদিও এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।" (আলে ইমরান-১৬৪)।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বর্ণনা করেন যে, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে মসজিদের দু কোণে দুদল লোক উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর যিকর ও দুআয় লিপ্ত ছিল। অপর দল ইলম শিখছিল এবং অপর লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল সা. বললেন, এরা উভয়েই ভাল কাজে লিপ্ত কিন্তু এদের একদল অপর দলের চেয়ে অধিকতর

উত্তম। এরা, যারা দুআ ও যিকিরে লিপ্ত, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাদের দুআ কবুল করতেও পারেন, নাও পারেন। আর অপর দল যারা ইলম ও ফিকহ শিক্ষা করছেন ও জাহিল-মূর্খদের শিক্ষা দিচ্ছেন এরাই অধিকতর উত্তম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সা. শিক্ষাদানরত দলে উপবিষ্ট হয়ে বললেন, আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (দারামী, মিশকাত-কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা ৩৬।)

বহু সংখ্যক আয়াতে কুরআন ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, প্রিয় নবীর ইকামাতে দ্বীনের মহান দায়িত্বের সাথে অন্যতম মিশনই ছিল শিক্ষকতা তথা প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পাদন করা। মূলত আল্লাহর রাসূল সা. যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক ও ইলমুল কুরআন ও ইলমুল হাদীসের উৎস। আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা খোতানী র. তাঁর চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রত্যয়, চরিত্র, আখলাক ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও ইলমে নবুওয়াত এর প্রচার-প্রসারে ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ। তাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ শিক্ষকের পূর্ণ অনুসরণের কারণে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক।

আমরা আগেই বলেছি, একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য যে সকল গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য, তা পূর্ণমাত্রায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

০১. ইলমুল হাদীসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তিঃ

একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে বিষয় তিনি অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন, সে বিষয়ে তাকে গভীর পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তির অধিকারী হতে হবে। বিষয় সম্পর্কে গভীর ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ছাড়া সে বিষয়ে অধ্যাপনার হক আদায় করে দায়িত্ব সম্পাদন করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লামা খোতানী হুজুর হাদীসশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরবীভাষার ওপরও তাঁর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ছাত্র আজ দেশের অধিকাংশ কামিল মাদরাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতার সাথে মুহাদ্দিস ও অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শীর্ষ স্থানীয় আদর্শ মুহাদ্দিসের জীবন্ত প্রতীক হওয়ার কারণেই অসংখ্য মুহাদ্দিস ও অধ্যাপক তিনি তৈরী করে যেতে পেরেছেন।

০২. পাঠদান পূর্ব প্রস্তুতি:
উচ্চশিক্ষার স্তরে একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাঠদানের পূর্ব প্রস্তুতি। আমরা অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, আমাদের প্রিয় উস্তাদ ৪১ বছর হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতার সাথে অধ্যাপনা-জীবনে একটি পিরিয়ডও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষা প্রদান করেননি। ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর জন্যে নির্ধারিত কক্ষের চতুপাশে সাজানো কিতাবের স্থান থেকে আহার, সালাত এর সময়টুকু ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন। বছরে ২/১ দিন যদি কোন আকস্মিক কারণে তিনি মুতালাআর সুযোগ না পেতেন তবে নিশঙ্কচিত্তে ক্লাসে বলতেন,

اج مجھے مطالعة كى فرصت نہى هونى اج ميں نہيں پڑھاؤنگا

অর্থাৎ: আজ আমার মুতালাআ করার সুযোগ হয়নি, তাই আমি আজ পড়াবনা। আমরা এ দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন করেও তিনি যে একজন আদর্শ শিক্ষকের মূর্তপ্রতীক ছিলেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি।

০৩. নির্ধারিত পেশা ও বিষয়ের প্রতি গভীর প্রেম, আগ্রহ, আবেগ ও অনুরাগ:
একজন আদর্শ শিক্ষক তার নিজস্ব বিষয়ের ওপর গভীর অনুরাগ, মহব্বত, আগ্রহ ও আবেগ না থাকলে এবং অধ্যাপনাকে জীবন ও জীবিকার সংস্থান ও পেশা মনে না করে, জীবনের নেশা ও ব্রত মনে না করলে কখনো তিনি আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ তাঁর দেশের আযাদী প্রিয় মুসলিম জাতি সত্ত্বার বিলুপ্তির সমাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রাম, এরপর দারুল উলূম দেওবন্দ এর ডিগ্রি লাভের পর ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা জীবনের সূচনালগ্ন হতে আমরণ হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনার দায়িত্বকে জীবনের প্রধানতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইলমে নবুওয়াতের প্রতি ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় মহব্বত, অনুরাগ, প্রেম, আবেগ ও গভীর আগ্রহ। হাদীস শাস্ত্রের দারস প্রদানকালীন বিভিন্ন ঘটনারাজির বর্ণনা প্রদানকালে ইলমে নবুওয়াত, নবী সত্ত্বার মহব্বতে তাঁর নয়নযুগল হতে মুক্তার মতো অশ্রু ঝরে পড়তো। ইলমে নবুওয়াতের প্রেরণা ও হুব্বে রাসূলের চেতনা সৃষ্টিমূলক বর্ণনার আগেও অনুরাগে তাঁর বাকশক্তি স্তম্ভিত হয়ে ওঠতো। অনেক সময় তিনি মহব্বতের আবেগে হু হু

করে কেঁদে ফেলতেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি মুতাবেক তাঁর নির্ধারিত বয়স অতিক্রমের পরেও তিনি হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনা হতে অব্যাহতি নিতে পারেননি। স্বীয় পেশার প্রতি আগ্রহ, আকর্ষণ ও হাদীস শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ও মূল্যায়নে আমাদের প্রিয় উস্তাদ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন আদর্শ মুহাদ্দিসের জীবন্ত প্রতীক।

০৪. বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব:

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাশীল হওয়া ছাড়া আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাআলা জালিম শাসক জালুতের বিরুদ্ধে হযরত দাউদ আ. এর সংগ্রামে তালুতের জ্ঞানের প্রাচুর্য ও বলিষ্ঠ সুঠাম সুশ্রী দেহ বল্লরীর বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

(بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)

আমাদের প্রিয় উস্তাদ কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষণের জিহাদে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সুঠাম দেহ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তি ছিলেন। বস্তুত একজন শিক্ষক যদি তার শিক্ষাদানকালীন সময়ে নিজের জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী না থাকেন, যদি তিনি মনস্তাত্বিক দুর্বলতা ও হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকেন, তবে তার উপস্থাপনা বিন্যাস ও পাঠদান কখনো শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনা। আদর্শ শিক্ষকের বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহ এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতম। আমাদের প্রিয় উস্তাদ খোতানী হুজুর র. এ মূল্যায়নের দৃষ্টিতে একজন আদর্শ শিক্ষকের বাস্তব প্রতীক ছিলেন।

০৫. পরিমার্জিত রুচিশীল ও অমায়িক আচরণ:

একজন আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পরিমার্জিত রুচিশীল জীবনাচরণের অধিকারী হবেন। সুমিষ্ট কথাবার্তা, অমায়িক আচরণ, উন্নত চরিত্র, পরিচ্ছন্ন পোশাক ও পরিমার্জিত সংস্কৃতির অধিকারী হবেন। একজন আদর্শ শিক্ষকের পক্ষে অপরিচ্ছন্ন অগোছালো জীবন, নোংড়া ও ময়লাযুক্ত পোশাক, রুচিহীন এবং অমার্জিত সংস্কৃতির কল্পনাও করা যায় না।

আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে একজন সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। সুদীর্ঘ জীবনে পোশাকের ক্ষেত্রে পূর্ণ সুন্নতে রাসূলের পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও তিনি

কখনো এবরো থেবরো পোশাকে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন নি। হাসিমুখে আন্তরিকতাপূর্ণ আঙ্গিক ও সুমিষ্ট মধুর সম্বোধন ছাড়া কোন ছাত্রের সাথে কখনো মিলিত হননি। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক।

০৬. কল্যাণকামী অভিভাবক:

আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যিকার কল্যাণকামী অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, তার শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ, সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ ও তাকে আদর্শ মুসলিম, আদর্শ নাগরিক মানুষরূপে গড়ে তোলার যথার্থ তদারকির দায়িত্ব আদর্শ শিক্ষককেই পালন করতে হয়। **আদর্শ মুসলিম, আদর্শ মানুষ গড়ার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গড়ার ব্রত যদি শিক্ষক গ্রহণ না করেন, শিক্ষার্থীর আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, মেধা ও প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশকে যদি শিক্ষক শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করেন, তবে তিনি একজন শ্রমিক হতে পারেন। তিনি আদর্শ শিক্ষক হওয়া দূরের কথা; বরং শিক্ষক নামের কলংক।** উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমাদের প্রিয় উস্তাদ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। খোতানী হুজুর যে কতভাবে শিক্ষার্থীদের যথার্থ অভিভাবকের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁর বিস্তারিত ফিরিস্তি লিপিবদ্ধ করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সমকালীন বন্ধুবর ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক কমরুদ্দীন, অধ্যাপক আখতার ফারুক, শামসুল হক, মুযাক্কিরুল বারী, মুস্তফা হামিদী, অধ্যাপক আ. ম. ম. আহমাদুল্লাহ, মাও. ইসমাঈল, অধ্যক্ষ আব্দুল ওয়াহেদ; পরবর্তী পর্যায়ের অধ্যাপক আলী হায়দার, অধ্যক্ষ আব্দুর রব খান, অধ্যাপক আব্দুল মালিক, কবি রূহুল আমিন খান, ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান, অধ্যাপক আনসার উদ্দীন, এ.বি.এম ছিদ্দীকুর রহমান, মাও. মুহাম্মদ আলী, অধ্যক্ষ মাও. মুহাম্মদ সালেহ, মাও. রেদওয়ানুল করীম, অধ্যক্ষ কাফিলুদ্দীন সরকারসহ অগণিত অসংখ্য ছাত্র তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণরূপে আজো বেঁচে আছেন।

০৭. স্নেহশীল পিতা, অকৃত্রিম বন্ধু:

শিক্ষার্থীদের প্রতি হৃদয়ের গভীর মমতা, পিতৃত্বের স্নেহ, অসীম প্রীতি, হৃদয়ের গভীর দরদ ছাড়া কোন শিক্ষকই সত্যিকার আদর্শ শিক্ষক হতে পারেনা। একজন শিক্ষক তার শিক্ষাসুলভ গাম্ভীর্য, মর্যাদা রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত পরামর্শদাতা

বন্ধুত্বে পরিণত না হলে, তার ভুলত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে দরদী, স্নেহশীল পিতার মতো বুকভরা প্রত্যাশা পোষণ না করলে, তিনি কখনো আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন না।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকেও একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সরাসরি শ্রেণীকক্ষের ছাত্রত্বের আসন হতে বিদায়ের ৩/৪ দশক পরো যে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে পিতার চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন; তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

আমি ১৯৫৪/৫৫ সেশনে তাঁর ছাত্র ছিলাম। ১৯৮৪ সালের রমযানে এক জুমাবারের অপরাহ্ণে ৩টা থেকে ৪:৩০মি. বায়তুল মুকাররকম মসজিদের দক্ষিণ প্লাজায় আমি তাফসীর অনুষ্ঠান পরিচালনার পর দেখতে পেলাম খোতানী হুজুর দক্ষিণ বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে দুহাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে কপালে চুমো খেয়ে বললেন, "تم صفات الله هے" তিনি ছাত্রদের এমন মমতা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন যে, তাঁর সকল ছাত্রের হৃদয়েই এ ভাবের উদয় হতো যে, হুজুর বোধ হয় আমাকে সবচে বেশী আদর স্নেহ করেন। তিনি তাঁর নাস্তা করাকালীন সময়ে কাছে কোন ছাত্রকে দেখলেই ডেকে নাস্তা করাতেন।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় তিনি শায়খুল হাদীস ও সেকেন্ড মুহাদ্দিস ছিলেন (বিহারী হুজুর) আল্লামা আব্দুস সাত্তার বিহারী ও থার্ড মুহাদ্দিস কুমিল্লার হুজুর আল্লামা আব্দুল লতিফ কুমিল্লাভী, মুফতী আব্দুল করীম রুপশা হুজুর, মাও. আব্দুল আউয়াল হুজুর, প্রিন্সিপ্যাল হযরাতুল আল্লামা তাজাম্মুল হোসাইন খান সাহেব। তৎকালীন সকল শিক্ষকই অভিভাবকত্ব, পিতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভূমিকা পালন করতেন।

০৮. সময়ানুবর্তিতা:

আদর্শ শিক্ষকদের অপর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষাদানে নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা। এ ক্ষেত্রে খোতানী হুজুর ছিলেন এক উজ্জ্বল আদর্শ। মারাত্মক ধরণের অসুস্থতা ছাড়া তিনি ক্লাসে কখনো অনুপস্থিত থাকতেন না। অবশ্য মৃত্যুকালীন অসুস্থতা ছাড়া তিনি জীবনে খুব বড় ধরণের কোন রোগে আক্রান্তও হননি। খোতানী হুজুরকে ক্লাসে দেরীতে উপস্থিত হতে কেউ দেখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে ক্লাসে উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক।

০৯. সুশৃংখল ও নিয়ম মাফিক জীবনঃ

সুশৃংখল ও নিয়ম মাফিক জীবনযাপন করা আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করলেও আমরা খোতানী হুজুরের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য অতি মাত্রায় দেখতে পাই। তাঁর আহার বিহার, গোসল, সালাত, বিশ্রাম-নিদ্রা সবকিছুই নিয়ম মাফিক ছিল। তিনি সময় অসময় গল্প গুজবে সময় ব্যয় করতেন না। বাজারে কম যেতেন, যেতেন না বললেও অত্যুক্তি হবে না। ছোটখাট কিছুর প্রয়োজন হলে ছাত্রদের মধ্যে যাকে প্রয়োজন মনে করতেন তার হাতে টাকা তুলে দিয়ে আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রদান করতেন।

১০. ছাত্রাবাসের তদারকিঃ

তিনি মাগরিবের পর রাত ১০টার মধ্যে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা পড়াশুনায় মগ্ন কি না মাঝে মধ্যে পরিদর্শনও করতেন। মূলত একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের তদারকীর দায়িত্বও তিনি পালন করতেন।

১১. সুস্পষ্ট উপস্থাপনা ও সুবিন্যস্ত পরিবেশনাঃ

আদর্শ শিক্ষকের অপর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা, সুবিন্যস্ত পরিবেশনা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও হৃদয়গ্রাহী বাচনভঙ্গী। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকেও আমাদের প্রিয় উস্তাদ হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. মান উন্নীত কালোত্তীর্ণ মহান আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। একমাত্র উর্দূ উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বীয় জন্মভূমির আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবের সামান্য দুর্বলতা ছাড়া তার উপস্থাপনা ছিল স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। তৎকালীন মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দূ। উর্দূভাষায় তিনি অনর্গল প্রাঞ্জল সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী পাঠদান করতেন। তাঁর পাঠদানে কোন জড়তা ও অস্পষ্টতা ছিল না। সুনিপুণ দক্ষ শিল্পীর মতো সুবিন্যস্তভাবে তিনি তাঁর চিন্তাধারা ও বক্তব্য তুলে ধরতেন।

১২. অকৃত্রিম উদার প্রাণঃ

আদর্শ শিক্ষকের অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আদর্শ শিক্ষক হতে হবে অকৃত্রিম। কৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে কোন কিছুকে তিনি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবেননা। মুক্ত ও উদার প্রাণের অধিকারী হবেন। বক ধার্মিকতা ও লেফাফা দুরস্তির কৃত্রিমতার প্রভাব মুক্ত থেকে প্রাণখোলা ও অকৃত্রিম হবে তার জীবনধারা। আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার আদর্শ শিক্ষকের প্রতীক ছিলেন।

১৩. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ:

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ছাড়া বিলায়াতের ও তাযকিয়ার যে উন্নত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, তা ছিল তাঁর দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও অনাসক্তি। পার্থিব আরাম আয়েশ, স্বার্থপরতা, অধিক কোন প্রকার আকর্ষণ ও প্রবল আগ্রহ তাঁর ছিলনা। শেষ জীবনে খুলনা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ও ঢাকা সরকারী আলিয়ার লোভনীয় পদে নিযুক্তির আহ্বানকে তিনি তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। নিরাসক্ত নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ জীবন ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তাঁর চিন্তা চেতনা ও কর্মধারা ছিল আখিরাতমুখী, তাই তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় ওলীদের অন্তর্ভূক্ত।

১৪. তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ও তাওয়াক্কুল বিল্লাহ:

হযরত নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কোন কঠিন ব্যাপারেও তাঁকে চিন্তাগ্রস্থ, উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ হতে দেখা যায়নি। সদা হাস্যময় ছিলেন তিনি। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার ও আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের দীপ্ত প্রভায় তাঁর মুখমণ্ডলে আল্লাহর প্রেম ও ঈমানের জ্যোতি উদ্ভাসিত হতো। তিনি আদর্শ শিক্ষকের প্রতীকের সাথে সাথে আল্লাহর প্রেমিকদের মধ্যে আদর্শ ও শীর্ষস্থানীয় অলী ও বুজুর্গ ছিলেন।

১৫. জাতীয় অধ্যাপক নিয়ায মাখদূম খোতানী র. :

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. শুধু ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস ছিলেন না; তিনি ছিলেন উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর শায়খুল হাদীস। তিনি শুধু ছারছীনা মাদরাসার হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন না; তিনি ছিলেন হাদীস বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক। যদিও সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপকরূপে ঘোষিত হননি, কিন্তু এদেশের মানুষের হৃদয় রাজ্যে তিনি জাতীয় অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর হাজার হাজার ছাত্রের মাধ্যমে তিনি জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন

১৬. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন:

একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা। মূলত একজন খাঁটি মুসলিমের তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জিন্দেগীর অন্যমত মিশন হচ্ছে ন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা।

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

"মুমিনগণ যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আর কাফিররা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে" (সূরা নিসা:৭৬)।

একজন আলেমে দ্বীন শিক্ষক তথা একজন মুসলিমের জিন্দেগীর মিশনই হচ্ছে বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

আল্লামা ইকবাল বলেন,

الفاظ ومعانی میں تفاوت نہیں لکن
ملاکی اذان اور مجاهد کی اذان اور
یہ رواز ہے دنون کی ایسے الگ فضامیں
کہ کر کسکا جہاں اور شاہیں کا جہاں اور

"শব্দ এবং অর্থে নেই কোন পার্থক্য
কিন্তু নয় কো সমান মোল্লা আর মুজাহিদের আযান,
যদিও মহাশুণ্যে শকুন আর ঈগলের অবস্থান।
কিন্তু ঈগল আর শকুন কখনো নয়কো সমান।"

একজন আদর্শ শিক্ষক কখনো অন্যায় ও অসত্যের আস্ফালন ও বিজয়কে নীরবে বরদাশত করেননা। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে দূর্বার ও আপোষহীন সংগ্রাম একজন আদর্শ শিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আমাদের প্রিয় উস্তাদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এ ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষকের বাস্তব প্রতীক ছিলেন। তিনি আজীবন অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আপোষহীন সংগ্রামী জীবনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ায় তুর্কিস্তান প্রদেশের খোতানে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদীস ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কম্যুনিস্ট শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম অঙ্গরাজ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় কম্যুনিস্ট সন্ত্রাসীদেরকে মসজিদ, মাদরাসা ধ্বংস সাধনে লিপ্ত দেখে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সেনাপতির পদে উন্নীত হন। ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মুসলিম আমীরগণ কম্যুনিস্টদের ছলনায় পতিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহযোগিতায় লিপ্ত হন এবং নিজেদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরে অলৌকিকভাবে তিনি কম্যুনিস্টদের গণহত্যা থেকে আত্মরক্ষা করে দেওবন্দ

আগমন করে দেওবন্দের দারুল উলূমের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেওবন্দেই শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করতেন। কিন্তু অলিয়ে কামিল হযরত শায়খ আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ র. এর অনুরোধে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের চেষ্টায় তিনি ১৯৪৫ সালে ছারছীনায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন এবং ৪১ বছর যাবত ইলমে নবুওয়াত এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আজীবন ইলমী ও আমলী জিহাদের মাধ্যমে নির্ভিক চিত্তে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রাখেন।

১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর এ মহৎপ্রাণ. আদর্শ শিক্ষকের জীবন্ত প্রতীক ইলমে নবুওয়াতের অক্লান্ত নিরলস খাদিম এই নশ্বর ধরাধাম হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তিনি চিরনিন্দ্রায় শায়িত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ উস্তাদকে জান্নাতে বুলন্দ মরতবা দান করুন। (আমীন!)

উপসংহারে আমরা এ প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি না করে কালজয়ী অনুপম ও অতুলনীয় মহান ওস্তাদের স্মৃতিকে অমর ও চিরন্তন করে রাখার লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাবনা উত্থাপন করেই সমাপ্ত করছি;

১. আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত ছাত্রদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
২. তাঁর নামে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হোক।
৩. ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর প্রায় অর্ধশত বছর ব্যাপি অধ্যাপনার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে একটি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করে নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছাত্রাবাস নামকরণ করা হোক।
৪. নিয়ায মাখদূম রিসার্চ একাডেমীর নাম নিয়ায মাখদূম ফাউন্ডেশন করা হোক।
৫. তাঁর প্রতিভাবান যোগ্য ছাত্রদের নিকট থেকে বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত ও নতুন করে সংগৃহীত প্রবন্ধসমূহ একত্রিত করে উত্তম কাগজে একটি সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

লেখক :
অধ্যাপক ও সাবেক উপাধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রচার,
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ও তাঁর জিহাদী প্রেরণা

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার

পাক কালামে মাজীদ কুরআনে হাকীমের সূরা মায়িদার ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি নিজ দ্বীন ত্যাগ করে চলে যায়, তবে আল্লাহ পাক অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবেন; মুসলমানগণের প্রতি তাঁরা বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাঁরা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পাবেন না। এ হলো মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। মহান আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞাতা।"

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে ও মধ্য এশিয়ায় যখন ইসলাম বিরোধী সাম্যবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়, মরহুম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. তখন চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আলমে আরওয়াহ থেকে আলমে খালকে আবির্ভূত হন। সঠিক জন্ম তারিখ অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষের বেলাতেই খুঁজে বের করতে হয়েছে। তবে তাদের জ্ঞান গরিমায় জগতবাসী যখন আপ্লুত হয়েছে এবং সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে যখন তারা এ নশ্বর জগত ছেড়ে চির অবিনশ্বর জগতের পথে রওনা দিয়েছেন, তখন তাদের বিদায়ের লগ্ন সবার নিকট চির স্মরণীয় হয়ে গেছে। আমাদের মরহুম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর বেলাতেও তাই হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবকাল বিশ্ব মুসলমানের কাছে স্মরণীয় এ কথা সত্য। কমিউনিস্ট হায়েনাদের অত্যাচার মধ্য এশিয়াসহ আশপাশের সবগুলো মুসলিম দেশে যখন হত্যাযজ্ঞ চলছিল, তখনই খোতানীর বাল্য ও কৈশোর জীবন পার হয়েছিল। পবিত্র কুরআন সুন্নাহর চর্চার সাথে সাথে জিহাদী প্রেরণায় তাঁর দেহের রক্ত টগবগ করছিল। তিনি ইলম-হিলম, জিহাদ-যুদ্ধ, আমল-আখলাক সবই রফত করে চললেন। মনে অদম্য উৎসাহ।

তুর্কী আলেম খান্দান। মায়ের রক্তে আওলাদে রাসূলের জিহাদী প্রেরণা। যে খান্দানের লোক কোন দিন মিথ্যার সাথে সমঝোতা করেনি। সত্য ও ন্যায়ের জন্য যারা অকাতরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। তাদের রক্ত খোতানীর রগ-রেশায়, প্রতিটি ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। তিনি তো চাকুরী করার জন্য জ্ঞানার্জন করেন নি। পয়সা কামাবার জন্য মহান আল্লাহর কালাম মাজীদ আর আখেরী নবীর সুন্নাহ চর্চা তিনি করেননি। মিথ্যা জালিয়াতির বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বয়সের প্রয়োজন হয়। কেবলি যৌবনে পা দিয়েছেন। ইসলামী শরীআতের অন্যতম বিধান বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছেন। কর্মজীবনে পা বাড়াবেন। আর অমনি শুরু হয় মধ্য এশিয়ার ইউরোপে বলশেভিক আন্দোলন। ইসলাম ও কমিউনিজমের বুঝাপড়া-হিসাব কিতাব। নব্য চীনা কমিউনিস্ট যারা রাশিয়ার ধারায় কাজ করছিলো, যুক্তি পরামর্শ নয়, বিচার-বিবেককে বাদ দিয়ে সব সমান করে ফেলা যাদের কাজ, তারা চীনাদের মধ্যে গণহত্যা শুরু করেছিলো। শতকরা নব্বই জন মুসলিম অধ্যূষিত কাশগর, খোতান, তুর্কমেনিস্তান, আজার বাইজান, আর্মেনিয়া সর্বত্রই শুধু মুসলিম নিধনের হিড়িক পড়ে গেল। ভয়ে, লোভে, জানের মায়ায় যারা তাদের দলে ভিড়লো, তাদের প্রত্যেকের হাতে শাণিত অস্ত্র। মুসলিম হত্যাযজ্ঞ ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

খোতানের ঈমানদার মুসলমানগণ মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় বলশেভিকদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁদের ছত্র ভঙ্গ হতে দেখে নব্য যুবক সদ্য বিবাহিত বিশ/বাইশের কোঠায় যার বয়স তিনি এগিয়ে এলেন বীরদর্পে সাহস যোগাতে, এলাকার জানবায মুসলমানের সংগঠনকে মযবুত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে কাফির মুশরিকদের ঘাড়ের ওপর। জাগিয়ে তুললেন সর্বত্র জেহাদী প্রেরণা। মর্দে মুজাহিদের নেতৃত্বে মুসলিম ঐতিহ্যের আত্মরক্ষার লড়াই চললো। না মনযুরে ইলাহী ভিন্নতরো। খোতানীর নযরের সামনে সাথীদের অনেকেই জামে শাহাদাত পান করলেন। পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলো। কমিউনিস্ট শয়তানদের সঙ্গে আপোষ রফা সম্ভব নয়। তাদের হাতে জান দেয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। তিনি যুদ্ধের ময়দানে যখন যুদ্ধরত, তখন সংবাদ পেয়েছিলেন, তাঁর এক ছেলে জন্ম নিয়েছে। স্ত্রী খুবই অসুস্থ। সবকিছু পেছনে ফেলে কম্যুনিস্টদের চীনকে দুশমনের দেশ জ্ঞান রেখে শুধু চীনকে নয় সারা বিশ্বের মুসলমানকে কম্যুনিস্টদের খপ্পর থেকে রক্ষার বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে বুক ভরা সাহস, ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহ, কঠিন মরুকান্তার হিমালয়ের দুঃসাধ্য গিরি পথ পাড়ি দিয়ে নদী-নালা সাতরিয়ে এ উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের বিরাট জামাআতে শামিল হতে চলে এলেন।

উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ হলো। ইসলামের জেহাদী প্রেরণায় সকলকে জাগিয়ে তুলতে হলে নবী মুস্তফার তরীকা ব্যতীত আর কোন পন্থা নেই। দেওবন্দের হাদীসের দরসে বসে গেলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এ দরসে থেকে জ্ঞান সমুদ্রের কুল-কিনারা পাওয়া যায় কিনা দেখে নিলেন। হিমালয়ের ওপারে তিব্বতের নদীতীরে শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে ভুগে তাঁর সওয়ারী তাজী ঘোড়াটি যখন মারা যায়, একমাত্র সাথী হারিয়ে তাঁর মনের গতি যখন বারে বারে তরঙ্গায়িত, তখনি এক বুযুর্গ তাঁকে স্বপ্নের মাঝে এসে বলে দিয়েছিলেন, তোমার শাণিত জেহাদী প্রেরণা বিশ্ব মুসলমানের মনে চির জাগরুক করে রাখার জন্য সামনের নদী সাঁতরিয়ে উপমহাদেশে চলে এসো। নিরাপদে তিনি এদেশে পৌছলেন। হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রী লাভের পর উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে হাজার আওলিয়ার পূণ্য স্মৃতিময় ভূমি বাংলাদেশের জমিনে দরসে হাদীসের জন্য আহবান আসলো। তিনি পৌছলেন ছারছীনায়। সাক্ষাৎ পেলেন তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় যিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সাহস যুগিয়েছিলেন সেই সূফী সাধক, আশেকে রাসূল, সুন্নতের পুনঃজীবনদাতা নিছারুদ্দীন র. এর।

ইতিহাস কথা বলে। মুয়িয উদ্দীন মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন ঘুরীও বারবার এসেছিলেন এ দেশে। তিষ্টাতে পারেন নি। সুলতানুল হিন্দ গরীব নওয়ায খাজা আজমেরী যখন স্বপ্নে ডেকে পাঠালেন, তখন এদেশে তিনি আসলেন বিজয়ীর বেশে। চিরতরে মুসলিম শাসন কায়েম হলো। হিন্দে, সিন্দে ও বঙ্গে। আজও মুসলমানগণ এ দেশে বাদশাহ জাতি।

আওলিয়ার রূহানী ডাকে এসেছেন খোতানী জীবনের সব গ্লানি ঝেড়ে মুছে। শুরু হলো নব জীবন তার। বাইআত করলেন পীরে কামেল মুকাম্মেলের হাতে। তাঁর আদেশে হাদীসের দরস দিতে থাকলেন। খান্দানী বৈশিষ্ট্য, সাইয়্যিদ খান্দানের জেহাদী প্রেরণা ও গত জীবনের অভিজ্ঞতা সব মিলে গেল পীরে কামেলের তাওয়াজ্জুহের সাথে। দরসে হাদীসের ক্লাসতো নয়, যেন জেহাদী প্রেরণার প্রস্রবন। ছারছীনার যমীন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বেরুতে থাকলো মুজাহিদের দল। যেন ফেরেশতার জামাআত সায়্যিদ নিছার আলীর বাঁশের কেল্লা আর বালাকোটের ধারা জারি হতে থাকলো এ পাক দরবার হতে। এক খোতানী নয়, লাখ খোতানীর জিহাদী প্রেরণায় এ দেশের শিরক বিদআত ভেসে যেতে লাগলো। ছারছীনা ছেরে ছীনা কোনটাই নয়; এ যে একেবারেই দারুচ্ছুন্নাহ-

এহ্ইয়ায়ে সুন্নাহ, সুন্নতের পূর্ণজীবনের ঘাটি। সূফী নিছারুদ্দীনের তাসাওউফ চর্চা আর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর হাদীসের দরস মিলে নূরুন আলা নূর হয়ে জ্বলে উঠলো বাংলার যমীন ভেসে যেতে লাগলো জাহান্নামের অমানিশার অন্ধকার, জাহেলিয়াতের যুলুমাত। ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও জযবাহ এবং মুহব্বতের দরিয়ায় অবগাহন করে এ ঘাঁটি দিয়ে যে উঠে আসবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, মনে রেখো! অলিগণের মৃত্যু নেই। কুরআন কারীমে সূরাহ বাকারার ১৫২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ)

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকো এবং অবাধ্য হয়োনা।"

বান্দাহ তার মাবুদে বরহক মাওলায়ে রাব্বুল ইযযতকে স্মরণ করবেন তার হায়াতের সীমিত পরিসরে, অথচ রাব্বুল আলামীন তাকে স্মরণ করবেন অনন্তকাল ব্যাপী। কেননা, তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী। খোতানী হুজুর মহান আল্লাহকে ভুলেননি। স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে ভুলবেন না। সূরা বাকারার ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন,

(وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ)

"যারা মহান আল্লাহর রাস্তায় আত্মদান করেছেন, তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা। তাঁরা জীবিত; অথচ তোমরা বুঝনা।"

সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)

"যারা মহান আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে কখনো এ ধারণা করোনা যে, তাঁরা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। বরং তাঁরা জীবিত, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকা গ্রহণ করছে। আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহে যা কিছু তাঁদেরকে দান করেছেন, তাতে তাঁরা খুশী আনন্দিত। আর তাদের পশ্চাতে যারা পৃথিবীতে রয়ে গেছেন, এখনো তাদের সাথে মিলিত হননি; তাদের প্রতি তাঁরা সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন ভীতসন্ত্রস্ত না হন। এবং মোটেও চিন্তিত না হন। অর্থাৎ, নির্ভিক চিত্তে তারা যেন মহান আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণে প্রস্তুত হয়ে যান।"

সূরা তুরের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)

"আর যারা ঈমান আনে ও তাঁদের সন্তান-সন্ততি (রক্তের সম্বন্ধীয় অথবা আত্মার আত্মীয় ছাত্র মিত্র) ঈমানের সাথে তাদের অনুগামী হয়, তাঁদের সাথে ঐ সন্তানাদিকেও মিলিত করে দিব এবং তাঁদের কর্মফল বিন্দু মাত্র কম করবোনা। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী"

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ মালিকের এসব পরিস্কার ঘোষণার পর আমাদের আর কোন শক ও শোবাহ থাকতে পারে না যে, খোতানী হুজুর ও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তাঁর জিহাদী প্রেরণা আজো অব্যাহতভাবে কাজ করে চলেছে।

মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূল বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (المنكرة عن المؤطأ)

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে গেলাম, মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (তার ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ) যে পর্যন্ত তোমরা এ দুটি বিষয় আঁকড়ে ধরে থাকবে, কখনো গোমরাহ হবেনা।"

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর নিকট সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি তার সমাধানের জন্য প্রথমে পাক কুরআন মাজীদে কী আছে তা তালাশ করতেন। না পাওয়া গেলে মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে তালাশ করতেন। তাতেও সমাধান না পাওয়া গেলে তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের নিকট প্রশ্ন করতেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূলের কোন সুন্নাহ রয়েছে কিনা? (দারেমী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা) এভাবেই খুলাফায়ে রাশেদীন বাকী তিন খলীফা সুন্নাহ তালাশ করেছেন। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহর কিতাব যেরূপ শরীয়তের একটি উৎস, রাসূলে পাকের সুন্নাহও সেরূপ একটি উৎস। তবে কুরআনের মর্যাদা সুন্নাহর তুলনায় উর্ধ্বে।

ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা র. বলেছেন, "সুন্নাহ না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতে সক্ষম হতো না।" (শারানী র.)

ইমাম মালেক র. বলেছেন, "মানুষের কথাকে মানুষ গ্রহণ করতে পারে, বর্জনও করতে পারে, কিন্তু নবীর কথা বর্জন করার অধিকার কারো নেই।" (ইবনে হামযা র.)

ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের কথা গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহর কথাই গ্রহণ করেছে।" (রিসালা-৭)
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।"
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তা (হাদীস) আবৃত্তি করে আমল করেছে, সে সৎ পথের সন্ধান লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা থেকে বিমুখ হয়েছে, সে নিঃসন্দেহে গোমরাহ-বিফল মনোরথ হয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)
হযরত সুফিয়ায়ে কেরামও এ ক্ষেত্রে অভিন্ন মত পোষণ করেন।
হযরত জুনাইদ বাগদাদী র. বলেছেন, "সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত মহান আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই।" (ইতিসাম)
সুন্নাহর হিফাজত ও প্রচারের জন্য হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সরাসরি নির্দেশ সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল ইলম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূল সা. আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে শরীআতের আহকাম শিক্ষা দিবার পর আদেশ করলেন, احفظوه واخبروه من وراءكم "তোমরা এসব ভালোভাবে ইয়াদ করে লও। যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের নিকট তা পৌঁছে দিয়ো।"
আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারে মিশকাত ইত্যাদি গ্রন্থে সাহাবী উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ورعاها رب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقة إلى من هو أفقه منه

"আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনে ও মুখস্ত করে নেয় এবং তা উত্তমরূপে অনুধাবন করে অতঃপর তা অন্যের নিকট পৌছে দেয়। কেননা, অনেক জ্ঞানের কথার বাহক (হাফেজ) আছে, যারা নিজেরা জ্ঞানী নয়, এ ছাড়া অনেক বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহণ করে পৌছে দিতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।" (সে তা থেকে অনেক জ্ঞানের তথ্য উদঘাটন করতে পারবে)
সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয়েছে। সুন্নাহর আক্ষরিক রূপ হলো হাদীস। সাহাবায়ে কেরাম হাদীস শিখেছেন এবং হাদীস মুতাবেক আমল করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকেই তাবেয়ীগণ হাদীসের তালীম গ্রহণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته "তোমরা পরস্পরে হাদীস আলোচনা করতে থাকো। কেননা, আলোচনা তো হাদীসের জীবন।" (দারেমী)

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. থেকে হাদীস শিখেছেন এমন লোকের সংখ্যা আটশতের অধিক। তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন পরম্পরায় এ উপমহাদেশেও হাদীস চর্চা শুরু হয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্ব প্রথম হাদীস লিখার জন্য সরকারি নির্দেশ জারী করেন। যদিও তিনি উমাইয়া বংশের। কিন্তু তাঁর ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি ইসলামের পঞ্চম খলীফারূপে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর সরকারী ফরমান পেয়েই হাদীসের কিতাব সংকলন শুরু হয়। কথিত আছে, মদীনা তয়্যিবাহ থেকে ইলমে হাদীসসহ অন্যান্য ইলমের চর্চা কুফা, বসরা হয়ে বাগদাদে পৌছে। সেখান থেকে বুখারা হয়ে দিল্লী পৌঁছে এ উপমহাদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উমাইয়া শাসনামলে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম র. সিন্ধুর দেবল থেকে পাঞ্জাবের মূলতান পর্যন্ত বিজয়কালে তাঁর সাথী মুজাহিদ, আলিম, সূফী ও ব্যবসায়ীগণ এ দেশে বসতি শুরু করেন। তাঁরা প্রথম হাদীস চর্চা করেছেন উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ৭১৫ হিজরী সনে। খলীফার নির্দেশ পেয়ে তিনি দামেশকে ফিরে গেলেও তাঁর সাথীগণের অনেকেই এখানে থেকে যান। যদিও তারা দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেননি, তবুও বলা যেতে পারে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও যারা উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সাগর তীরে পৌছেছিলেন এবং স্থায়ী কোনো ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের চেয়ে অধিক কাল স্থায়িত্বের দাবীদার।

এ উপমহাদেশে গজনীর শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদের আগমনের সাথে সাথে আলিম-ফাযিল, সূফী, দরবেশ ঐতিহাসিক অনেকেই আসেন।

মুয়িয উদ্দীন মুহাম্মদ শিহাবুদ্দীন ঘোরী ১১৯৩ সনে প্রথম দিল্লী আসেন। তিনিই স্থায়ী মুসলিম শাসন কায়েম করেন এ উপমহাদেশে। তাসাওউফ আর হাদীস চর্চা পুরোদমে শুরু হয় এ দেশে। তবে একথা সত্য যে, মোঘল আমলে মুজাদ্দেদী ইসলামের যে সঠিক চর্চা শুরু হয়, তা আর নিভৃত হয়নি। হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ র. এর খান্দান থেকে শক্তিশালীভাবে হাদীসের চর্চা এমনভাবে বেঁধে উঠে যে, সারা উপমহাদেশে তার বিস্তার ঘটে। সহস্র সহস্র মুহাদ্দিস যুগেযুগে হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত থেকে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাস্তব রূপ এখানে প্রচার করতে থাকেন, সে ধারারই এক যোগ্য নায়ক আমাদের আলোচ্য মরহুম নিয়ায মাখদূম খোতানী র.।

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজী (মৃত্যু ৬০০ হিজরী মুতাবেক, ১২০৩ইং) বাংলাদেশ জয়ের পর থেকেই এখানে হাদীস চর্চার গোড়া পত্তন হয়। শাহজালাল তাবরেযী র. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার ছাত্ররাই উপমহাদেশের সর্বত্র বিশেষত উত্তরাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।
১১৯৬ হিজরী মুতাবেক ১৭৮১ ইং সনে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লামদন শাহজাহান পুরী র. এ মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১২৮৩ হিজরী সনে দেওবন্দে দারুল উলূম ও সাহারানপুরে মাযাহেরে উলূম নামে দুটি বিখ্যাত হাদীস চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের খোতানী হুজুর দারুল উলূম দেওবন্দের নামকরা ছাত্র।

১৯১৫ সনে ছারছীনায় আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সূফী নিছারুদ্দীন র. এর অক্লান্ত চেষ্টায়। ১৯৪৩ সনে সেখানে হাদীসে কামিল (টাইটেল) ক্লাস খোলা হয়। এখানে হাদীস চর্চার জন্য খোতানী হুজুরের ডাক পড়ে। শুরু হয় তাঁর কর্মজীবনের আরদ্ধ কাজটি। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন- "রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লিখা।" আমাদের খোতানী হুজুর র. একা পারেননি কমিউনিস্টকে মিছমার করতে, শিরক-বিদআতমুক্ত ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্র কায়েম করতে। কিন্তু তিনি হিম্মত ছাড়েননি। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বিশাল বাহিনী গড়ে সারা বিশ্বে কমিউনিজম বিরোধী আন্দোলন জোরদার করবেন এবং শরীআতী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন দুনিয়াজুড়ে। তাঁর সাধ্যের আয়ত্তাধীন যা, তা তিনি করে গেছেন। কঠিন অধ্যবসায় ও মনোনিবেশ সহকারে ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত তিনি প্রায় তিন হাজার জিন্দাহ দিল মুজাহিদ তৈরী করেন। যারা ইত্তিবায়ে সুন্নাত, জযবাহ ও মুহাব্বাতে বাংলাদেশের অনন্য জামাআতের নিদর্শন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। মরহুম নিয়ায মাখদূম খোতানী সাহেবের জিহাদী প্রেরণায় তারা দেশের সর্বত্র এমনকি বিশ্বের সর্বত্র দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপৃত রয়েছেন।
ধন্য নিয়ায মাখদূম খোতানী র., ধন্য তাঁর কর্মজীবন। তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আর তার শাগরীদদের সাফল্য কামনা করে শেষ করছি।

লেখক :
বিশিষ্ট আলেম ও গবেষক

বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায়
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর অবদান

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব খোলাফা-ই-রাশেদীনের যুগেই ঘটে এবং মহানবী সা. এর সাহাবীগণের দ্বারাই এখানে ইসলামের প্রচার শুরু হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলাম পূর্বযুগ থেকেই আরব ব্যবসায়ীরা ভারতীয় উপমহাদেশে নৌপথে বাণিজ্য করতে আসতেন। শ্রীলংকা, চট্টগ্রাম, করাচী প্রভৃতি স্থানে তাঁদের যাতায়াত ইতিহাস স্বীকৃত। এ পথেই তাঁরা সুদূর চীন পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের মুকাদ্দিমা দ্রষ্টব্য)। অতএব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, প্রিয় নবী সা. এর যুগেই এখানে ইসলামের আগমণ ঘটেছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হতে প্রমাণিত যে, ইসলামী বিপ্লবের প্রথম কয়েক বছরে নবুওত ও প্রথম খলিফার আমলে না হলেও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রা. এর খিলাফতকালে বিশ্বনবীর সাহাবীগণের কেউ কেউ এই উপমহাদেশে আগমন করেছেন। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী স্বীয় গ্রন্থ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেন যে, "খলীফা হযরত ওমর ফারুকের (রা.) আমলে (১৩-২৩ হিজরী) তৎকর্তৃক বাহরাইন ও ওমানে নিযুক্ত শাসনকর্তা সাহাবী হযরত ওসমান বিন আবুল আস আসসাকাফী রা. তাঁর ভ্রাতা আল হাকামকে সিন্ধুর বরুচ এবং অপর ভ্রাতা মুগীরা বিন আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা.) যুগে (১৩-২৩ হিজরী) পাঁচজন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন বলে 'সিয়ারুস সাহাবা' গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁরা পাঁচজন হলেন,

০১) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে ইৎবান রা.
০২) আসেম বিন আমর আত তামীমী রা.
০৩) সুহার বিন আল আবদী রা.
০৪) সুহাইর বিন আদী রা.
০৫) আল হাকাম বিন আবিল আস আস সাকাফী রা.

অতঃপর হযরত উসমান রা. (২৩-৩৫ হিজরী), হযরত আলী রা. (৩৫-৪০ হিজরী) এবং আমীরে মুয়াবিয়ার রা. (৪১-৬০ হিজরী) শাসন আমলেও ভারতে সাহাবীগণের আগমন অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই যুগে ভারতে আগমনকারী মাত্র

তিনজন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত উসমান রা. এর খিলাফতকালে যে দু'জন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁরা হচ্ছেন- উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার আততামীমী ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শামস র.। আর হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার রা. যুগে আসেন হযরত সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযালী রা.। তদানীন্তন ইরাক শাসনকর্তা যিয়াদ তাঁকে ভারত সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।

ইসলামের ধারক ও বাহক সাহাবায়ে কিরামগণ যেখানেই গমন করেছেন, মহানবী সা. এর হাদীসের শিক্ষা তথায় প্রচার করেছেন। অতএব বলা যায়, হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলা-পাক-ভারত অঞ্চলে সাহাবীগণের দ্বারা ইলমে হাদীসের প্রচার শুরু হয়। যদিও এর বিস্তারিত ইতিহাস অদ্যাবধি অনুঘাটিত রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণের গবেষণায় এর দু একটি প্রমাণ মেলে, যার দ্বারা উপরের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যথা আমাদের বাংলাদেশেরই বৃহত্তর রংপুর জেলার তিস্তা নদীর অদূরে লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের 'মাজদের আড়ায়' একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ইষ্টক খণ্ডে লিখিত রয়েছে হিজরী ৬৯ সন ও কালেমা তায়্যিবা। (দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৩ সন)। ৬৯ হিজরীতে মসজিদ নির্মাণ হয়ে থাকলে ওখানে ইসলাম এসেছে নিশ্চয়ই আরো পূর্বে।

বহু সংখ্যক তাবেয়ী এ অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস প্রচারে। এতদঞ্চলে আগত তাবেয়ীগণের মধ্যে সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক আল হুযালী (ইন্তিকাল ৫৩ হিজরী), মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরা (ইন্তিকাল ৮৩ হিজরী), মূসা ইবনে ইয়াকুব শাকফী, ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশাহ দামেশকী (ইন্তিকাল ৯৭ হিজরী), আমর ইবনে মুসলিম বাহেলী (ইন্তিকাল ১২৩ হিজরী), আবু মুসা ইসরাইল ইবনে মুসা বসরী, আবু বকর রবী ইবনে সবীহ বসরী (ইন্তিকাল ১৬০ হিজরী), আবু মামার নজীহ সিন্ধী (ইন্তিকাল ১৭০ হিজরী), আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ দায়লবী (ইন্তিকাল ৩৪৩ হিজরী), খালাফ ইবনে মুহাম্মদ দায়লবী (ইন্তিকাল ৩৬০ হিজরী) প্রমুখসহ আরো অনেকের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আব্দুর রহীম-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, ৯৩ হিজরী সনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু বিজয় সম্পন্ন করে একে ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মুলতান, মনসুরা, আলোর, দেবল, সিন্দান, কুসদার ও কান্দাবীর প্রভৃতি স্থানে আরবরা উপনিবেশ স্থাপন

করেন। তাঁর সঙ্গে ৫০ সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক স্থায়ীভাবে বর্তমান। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বসবাসের উদ্দেশে এই সময় এদেশে বহুসংখ্যক আরব আগমন করেন। ফলে উল্লেখিত সকল স্থানেই ইসলামী শিক্ষার, তথা কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই আরবদের মধ্যে বহু হাফেজে কুরআন ও হাদীসের হাফেজ লোকও বর্তমান ছিলেন। তাদের চেষ্টা ও যত্নে এই এলাকায় কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৬০১)।
এর অনেক পরে ৯৯৭ হতে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে সুলতান মাহমুদ গযনভী ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পথ উন্মুক্ত করেন। এরপর ঘুরী বংশ ১০৩১ হতে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ, মামলুক বংশ ১২০৬ হতে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ, খিলজী বংশ ১২৯০ হতে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ, তুঘলক বংশ ১৩২০ হতে ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ, লোদী বংশ ১৪১৪ হতে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ এবং মোঘলগণ ১৫২৬ হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন জারী রাখেন। এ সময়ে এ অঞ্চলে স্থায়ী ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু হয় এবং তা বিকাশ লাভ করে।

বংগদেশে তথা বাংলায় হাদীস চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, বর্তমানে আলীয়া ও দরসে নেজামী মাদরাসার মাধ্যমে যে হাদীস চর্চা চলছে এ মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে হাদীস চর্চা হত বিশেষত খানকায় বা দরগায়। পীর মাশায়েখ, আউলীয়া-দরবেশগণ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ হতে আগমন করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আস্তানা গেড়ে ইসলামী শিক্ষা তথা হাদীসের শিক্ষা প্রচার করতেন। অতএব বাংলাদেশের হাদীস চর্চাকে আমরা দুটি করে ভাগ করতে পারি। প্রথমত মাদরাসায় দরসে হাদীস শুরুর তথা ১৯০৮/১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব যুগ। দ্বিতীয় স্তর- ১৯০৮/১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পরের তথা মাদরাসায় দরসে হাদীস শুরুর পরের যুগ।

মাদরাসায় দরসে হাদীস প্রদানের পূর্ব যুগ তথা ১৯০৮/১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের উত্তরকালে বাংলাদেশের ও এর আশেপাশে যে সকল আওলিয়া, মুহাদ্দেসীন হাদীস প্রচারে রত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (ইন্তিকাল ১৩০০ খ্রি.), আখিরোজ বাংগালী (ইন্তিকাল ১৩২৯ খ্রি.), আল্লামা আলাউল হক পাণ্ডুরী (ইন্তিকাল ১৩১৭ খ্রি.), হযরত নূর কুতুবুল আলম (ইন্তকাল ১৪১০ খ্রি.), শাহজালাল ইয়ামানী (ইন্তিকাল ১৪১১ খ্রি.), শায়খ ফরীদ বাঙ্গাল

মাওলানা আমীনুল্লাহ আজীমাবাদী, সৈয়দ আলী বাগদাদী, শাহনূরী বাঙ্গালী, মোল্লা মদন শাহজাহানপুরী, মাওলানা ইদ্রিস আলী, মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মাওলানা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ বর্ধমানী (ইন্তিকাল ১৯০৬ খ্রি.) ও মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ চাটগামী (ইন্তিকাল ১৯০৯ খ্রি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বিশেষভাবে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বোখারা হতে তৎকালীন বাংলার রাজধানী ঐতিহাসিক নগরী সোনারগাঁয়ে আগমন করে ইসলামী জ্ঞান বিশেষত হাদীসের শিক্ষা প্রচারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান।

"সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনামলে (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বর্তমান রাশিয়ার বুখারা থেকে আনুমানিক ১২৬০ খ্রি. দিল্লীতে আগমন করেন এবং তথায় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার আলো বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান তার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ভীত হয়ে তাঁকে বাংলার পূর্বাঞ্চলের রাজধানী সোনারগাঁয়ে চলে যেতে বাধ্য করেন। পথিমধ্যে বিহার প্রদেশের ওপর দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি কয়েক দিন মুনায়রে অবস্থান করেন। এখানে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন জগদ্বিখ্যাত সূফী ইয়াহইয়া মানেরী। ইয়াহইয়া মানেরীকে সাথে নিয়েই তিনি সোনারগাঁয়ে আসেন এবং দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম-মাদরাসা তাদেরই প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ে স্থাপিত হয়। "সম্ভবত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওমার দ্বারাই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে হাদীস চর্চা আরম্ভ হয়। শায়খ আবু তাওয়ামা বুখারার অধিবাসী ছিলেন বিধায় তিনি সেখান থেকে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তথ্যাদি সাথে নিয়ে আসেন। তাঁর মাদরাসায় বাংলা এবং বাংলার বাইরে থেকেও জ্ঞান পিপাসুগণ জ্ঞানান্বেষণে ছুটে আসেন। শায়খ আবু তাওয়ামাহ প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও মাদরাসাটি তৎকালে সমগ্র উপমহাদেশে হাদীসসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের শিক্ষাদানের একটি উচ্চাঙ্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। গবেষকগণের অনেকেই মনে করেন যে, শায়খ আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি আধুনিককালের আলিয়া মাদরাসার মতই ছিল। সেখানে ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও শিক্ষা দেয়া হতো।

যেমন এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষক ড. এ.কে.এম. আইউব আলী স্বীয় History of traditional Islamic Education in Bangladesh গ্রন্থে বলেন, Shaikh Sharfuddin Abu Tawamah (d-700/1300),

renowned as a great saint and a learned scholar in Hadith, Tafsir, Fiqh as well as in speculative sciences. He came to Bengal in the year 668/1270 and settled at Sonargaon, near Dhaka and established a great Madrasah there for the study of Quran, Hadith, Tafsir and other Islamic Subjects. শায়খ আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও এ ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ১৯০৮/১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এতদঞ্চলের প্রথম হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় দরসে হাদীস শুরু হয়। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাকাল হতেই এখানে মিশকাত শরীফ পড়ানো হতো বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, মিশকাত শরীফে সিহাহ সিত্তার প্রায় সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, আলিয়া মাদরাসার মাধ্যমে সর্বপ্রথম হাদীস শিক্ষা প্রচার শুরু হয় ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা-ভারত-আসামের কাউকে হাদীসের উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করতে হলে কলিকাতা আলিয়ায় গিয়ে লেখাপড়া করতে হত। কিন্তু বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকের পক্ষেই কলিকাতায় গিয়ে দরস গ্রহণ সম্ভব হতো না বিধায় হাদীসের উচ্চ শিক্ষা বিস্তার লাভ অবরুদ্ধ থাকে। এ অবস্থা দেখে বাংলার বিখ্যাত পীরে কামেল ছারছীনার হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. হাদীসের উচ্চ শিক্ষা বাংলার মুসলমানদের দোর গোড়ায় নিয়ে আসার নিমিত্তে ১৯১৫ সনে নিজ প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় ১৯৩৮ সনে দরসে হাদীসের ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ যে, খারেজী বা দরসে নিজামী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হাটহাজারী মাদরাসায় হাদীসের দরস ১৯০৮ সনে শুরু হয় বলে জানা যায়। যাহোক দুর্লংঘ্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হযরত নেছার উদ্দীন আহমদ র. সুদূর প্রসারিত মাস্টারপ্লান গ্রহণ করেন। হাদীসের প্রচার প্রসারে জন্য বিশাল আবাসিক ব্যবস্থা, জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আনয়ন, ছাত্রদের ফ্রী থাকা-খাওয়া ও সুন্নতে নববীর বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছারছীনা মাদরাসার মাধ্যমে এমন খিদমত আঞ্জাম দিতে শুরু করলেন যে, ছারছীনার পূর্বে কলিকাতা মাদরাসাসহ কয়েকটি মাদরাসা হাদীসের দরস দেওয়া শুরু করলেও ছারছীনা মাদরাসা সকল মাদরাসার অবদানকে ম্লান করে দিয়ে বাংলার হাদীস শিক্ষার আকাশে দিবাকরের স্থান দখল করে নিল।

ইলমে হাদীসের প্রচারে ছারছীনা মাদরাসার যে অপরিসীম অবদান তার পেছনে যার ছিল মুখ্য ভূমিকা, তিনি হলেন মধ্য এশিয়া হতে হিজরত করে আগত বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস উসতাযুল আসাতিজা শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস :
মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৭ সনে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর জন্ম হয়। যদিও বা ১৯৭৪ সনে হজ্জ গমনের জন্য তিনি যে পাসপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন তাতে বয়স উল্লেখ করা হয়েছিল ৫৭ বছর। এ হিসেবে জন্ম সন ১৯১৭ হয়। তবে শায়খ খোতানী র. এর পরিবার ও ঘনিষ্ঠরা ১৯১৭ সনের অন্ততঃ দু'দশক পূর্বে হুজুরের জন্ম হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

যা হোক, মরহুম খোতানীর জন্মস্থান সীংগাঙ এর পূর্বনাম ইচলিকোঁ শহর। রুশীয় তুর্কিস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূখণ্ডে কাশগরের দক্ষিণ পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের উর্দ্ধে ও কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় খোতান একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কী ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী ভাষাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলো আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করতেন।

শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর পরিবার তৎকালে খোতান ও এর আশেপাশের অঞ্চলে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চ স্থানীয় হিসেবে খ্যাত ছিল। সমগ্র এলাকায় তাদের একটি সম্মানজনক পরিচিতি ছিল। খোতানী র. এর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দিক ও পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ ছিলেন দেশ বিখ্যাত আলিম ও মুফতী। তাঁর আম্মা সাইয়্যেদা আয়েশা খানম ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আলিম বংশের মেয়ে। খোতান এলাকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ ছিলেন খোতানী র. এর মামা। তার আর এক মামা ছিলেন তৎকালের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ ইসমাইল সিদ্দিকী। ইলম, জ্ঞান, মর্যাদা সর্বদিক দিয়ে দু'টো উচ্চ বংশধারা এক মোহনায় সম্মিলনের স্বর্ণ ফসল নিয়ায মাখদূম খোতানী র.। শুধু ইলম ও মর্যাদা নয়, সম্পদেও খোতানী র. এর পরিবার ছিল সুপরিচিত। রেশমী কাপড় তৈরির কারখানা ছিল তাদের। এখানে তৈরী রেশমী কাপড় ও সুতা

ভারতে রপ্তানী করা হত। দানশীলতায় খোতানী র. এর মামাদের পরিচিতি ছিল দেশ জোড়া।

নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ছিলেন পাঁচ ভাই ও চার বোন। ভাইরা হলেন, (১) শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ, (২) শায়খ মুহাম্মদ আবু বকর, (৩) শায়খ মুহাম্মদ আলী, (৪) শায়খ মুহাম্মদ তখনা আহমদ ও (৫) শায়খ মুহাম্মদ ওমর। বোনেরা হলেন (১) মুসাম্মৎ হালীমা খানম, (২) মুসাম্মৎ সারা খানম, (৩) মুসাম্মৎ নিসার খানম ও (৪) মুসাম্মৎ সালীমা খানম।

পাঁচ ভাইয়ের তিনজনই ছোট বেলায় ইন্তিকাল করেছিলেন। শায়খ তখনা আহমদ পারিবারিক ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। তিনি ইন্তিকালের পর জীবিত একমাত্র ভাই শায়খ মুহাম্মদ ওমর দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আল্লামা খোতানী র. এর চিঠি পত্রের যোগাযোগ ছিল। তিনি যখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় তখন তাঁর এ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর আসে।

জন্মের পর শিশু নিয়ায স্বীয় বংশে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে লালিত-পালিত হতে থাকেন। দেখতে দেখতে দিনের পর মাস, মাসের পর বছর পার হয়ে শিশু নিয়ায চার বছর বয়সে পৌছেন। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে চার বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় লেখা পড়ার নতুন ছবক 'হাতে খড়ি' দেওয়া হল। বাবার স্নেহের কোলে মায়ের মায়া ভরা বুকে খেলতে খেলতে চলতে থাকে শিশু নিয়াযের শিক্ষা গ্রহণ। পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে নিয়াযের জীবনে নেমে আসে অমাবস্যার কালো আঁধার। বাবার আদর আর কপালে জুটল না। মা পরম মায়ার আঁচল বিছিয়ে জড়িয়ে রাখেন নিয়াযকে।

এভাবে পাঁচ পেরিয়ে নিয়াযের বয়স হল ছয় বছর। হঠাৎ আবারো বজ্রপাত। স্নেহময়ী মাতা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন মায়ার সকল জাল ছিন্ন করে অনন্তের টানে। শিশু নিয়ায পিতা-মাতা হারা এতিমে পরিণত হলেন। কী মিল শিশু মুহাম্মদ সা. এর সাথে! ছয় বছরে তিনিও হয়েছিলেন পিতৃ-মাতৃ হারা। কে লালন পালন করবে নিয়াযকে? এখানেও সুন্নতে মুহাম্মদ সা.। যেমন "চাচা আবুতালিব শিশু মুহাম্মদের অভিভাবক হয়েছিলেন, তদ্রূপ খোতানীর চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম এগিয়ে আসলেন এতিম ভাতিজার অভিভাবক হতে। চাচার তত্ত্বাবধানে শিশু নিয়ায বড় হতে থাকেন। তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় 'খালাক' নামক স্থানীয় মাদরাসায়। এখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাতৃভাষা ও ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা

লাভ করেন। এরপর এ মাদরাসায়ই তিনি লাভ করেন কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফারসী ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতির উচ্চ শিক্ষা। পিতার ইন্তিকালের পর অভিভাবক চাচার সাথে সাথে খোতানীকে স্নেহ মমতা দিয়ে ঘিরে রাখে তাঁর মামা মুহাম্মদ ইসমাইল সিদ্দিকী। খালাক মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর নিয়ায মাখদূম খোতানী উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগর গমন করেন। তথায় তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকায়েদ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষায়তনের সকল শিক্ষক তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মেধা ও আনুগত্যের কারণে খোতানীর আসন ছিল সকলের হৃদয়ে। কাশগরের মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করে ১৯ বছর বয়সে নিয়ায মাখদূম একজন প্রখ্যাত আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল্লামা খোতানী র. এর কাশগরের শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "১২ বছর বয়স পর্যন্ত বালক নিয়ায মাখদূম স্থানীয় 'খালাক' মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। তুর্কি ভাষা, আরবী ভাষা, কুরআন, ফিকহ, অংকসহ শরহেজামী পর্যন্ত এখানে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি ১৩ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কাশগর যান। এখানে তিনি ৭ বছর অধ্যয়ন করেন।"

আল্লামা খোতানী কাশগরের মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন, তখন তাকিয়ে দেখলেন, কম্যুনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে নিস্পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় হতে চলছে। খোদাদ্রোহী কমিউনিস্ট হায়নারা মুসলমানদেরকে খতম করার নেশায় উম্মাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের সকল ঘর-বাড়ি। মুসলিম ঐতিহ্যকে করছে ধূলিসাৎ। মসজিদ-মাদরাসাগুলো ভেঙ্গে চুড়ে তথায় বানাচ্ছে সিনেমা হল ও ক্লাব ঘর। ওমর, আলী, খালিদ ও কাসিমের রক্তের উত্তরাধিকারী যুবক নিয়াযের রক্তে তুফান উঠলো। চোখে তার ভেসে ওঠল বদর, ওহুদ, হুনায়েন, তাবুক, কারবালা। ইসলাম, ঈমান ও মাতৃভূমির জন্যে জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক জ্বলে ওঠে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মুজাহিদ হবেন। রক্ত দিবেন দ্বীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে। তিনি যোগদান করলেন মুসলিম সেনাবাহিনীতে। মেধা ও দক্ষতায় অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। খোতান ও তার সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো নিজের প্রচেষ্টা ও বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারছিলো না। সেনানায়ক নিয়ায চেষ্টা করলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর সেনা বাহিনীকে

একটি একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পরাজিত হতে লাগল মুসলিম বাহিনী। সর্বশেষ নিয়াযের বাহিনী পর্যুদস্ত হল কমিউনিস্ট সৈন্যদের হাতে। তিনি দেখলেন বাহিনীর প্রায় সকল সৈন্য শহীদ হয়েছে। একা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তিনি পিছু হটলেন। এক আশ্চর্যজনক ঘটনার দ্বারা তাঁর জীবন রেহাই পেল। তিনি আর ফেরআউনের অনুগত হয়ে থাকতে চাইলেন না। দেশ থেকে হিজরত করলেন ভারতের দিকে।

রোমাঞ্চকর এ ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়, আল্লামা খোতানী হুজুর যে রাজ্যের সেনাপতি– একদিন কমিউনিস্ট বর্গিরা সে রাজ্যে হানা দিল। লড়াই চলল মাসের পর মাস। কয়েকটা লড়াইতে জয়যুক্ত হয়ে তারা প্রধান দূর্গে যখন অবস্থান করছিলেন, এ সময় তিনি বাড়ি থেকে খবর পেলেন, তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছে। জীবনের প্রথম সন্তান। স্ত্রী ও সন্তানের মুখ দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। ছুটি নিলেন কিছু দিনের। ইত্যবসরে এল মারাত্মক দুঃসংবাদ। কমিউনিস্ট বাহিনী পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসছে পথের জনপদে আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে। কাছেই এসে পড়েছে তারা। লক্ষ্য তাদের এই দূর্গ। ছুটি বাতিল হল। সাহায্যের আবেদন পাঠান হল বিভিন্ন স্থানে। প্রস্তুত হলেন মোকাবেলার জন্য। কমিউনিস্ট বাহিনী এসে অবরোধ করল দূর্গ। দীর্ঘ এক মাস চলল অবরোধ। এর মধ্যে সাহায্য এল না। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট সৈন্যরা দূর্গের বর্হিদেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। শিলা ঝড়ের মত বুলেটের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একে একে ধ্বসে পড়ছে দূর্গের দেয়াল। বুলেট বিদ্ধ হয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করছেন সাথী মুজাহিদরা। মাথার ওপর দিয়ে, কাঁধের পাশ দিয়ে বুলেট চলে যাচ্ছে। পাশের সহকারী সৈন্যরা বুলেট বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। শত্রু এগিয়ে আসছে আর সময় নেই। প্রচণ্ড গোলাগুলীর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন তিনি তিন তলা থেকে নিচে। দেখে ফেলেছে দুশমন। গুলী চালাচ্ছে তাই এদিকে তাক করে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এদিকটা ফাঁকা। দৌড়ে চললেন তিনি সামনের দিকে। দুশমন তখন পিছু ধাওয়া করেছে। ঠিক এ সময় তিনি দেখতে পেলেন একটি ত্যাজী ঘোড়া, জিন পরানো সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে সওয়ার হলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে। পেছনের দিকে আর তাকালেন না। ছুটলেন সামনে আরো সামনে। দিন-রাত বিরামহীন বিশ্রামহীন একটানা দুদিন। এসে পৌছলেন একটা নদীর তীরে। পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে ঘোড়াটা মারা গেল এখানে এসেই। কিন্তু তাকে তো আর থামলে চলবে না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন

তিনি নদীবক্ষে। সাঁতরে পার হলেন নদী। এবার কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। চললেন ভারতের দিকে। অচেনা-অজানা পথ ধরে, সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করে, অবশেষে এসে পৌঁছলেন ভারতের সাহারানপুরে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়। পেছনে পড়ে রইল জন্মভূমি, পড়ে রইল আত্মীয়-স্বজন। একমাত্র ছেলে-শিশু সন্তানের মুখ দেখা আর হল না; সাক্ষাৎ হল না আর প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনীর সাথে। এরপর শুরু হলো আর এক নতুন জীবন, সাধনার জীবন। যে জীবন তাঁকে করে রেখেছে চির অমর। বিশেষত বাংলাদেশে ইলমে হাদীস প্রচারে তিনি হয়ে আছেন ইতিহাসের একজন স্বর্ণালী অধ্যায়।

শায়খ খোতানী সুদূর খোতান থেকে দুর্ভেদ্য হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতে আসেন। আল্লাহর ইচ্ছা নিয়াযকে বানাবেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর হাদীসের সেবক, তাইতো আল্লাহ কমিউনিস্ট সৈন্যদের বুলেটের মুখ থেকে হেফাজত করলেন তাঁকে। নিয়ায চিন্তা করলেন, বেঁচে যখন আছি তখন আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মহানবী সা. এর হাদীসের খেদমতেই জীবন উৎসর্গ করব। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দ দারুল উলূমে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ভারত পৌঁছে নিয়ায মাখদূম র. শুনলেন দেওবন্দ মাদরাসার অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যের কথা। হৃদয়ের টান অনুভব করলেন তিনি। উপস্থিত হলেন দেওবন্দে। নতুন করে দেওবন্দে শুরু করলেন শিক্ষা জীবন। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, বালাগাত, মানতেক, ফিকহ, উসূল, আকায়েদসহ ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় অধ্যয়ন করে মহা কৃতিত্বের সাথে তিনি ২৯ বছর বয়সে ১৯৪৪ সনে দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দেওবন্দে তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী র., মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. ও মাওলানা ইযায আহমদ র. প্রমুখ ছিলেন প্রসিদ্ধ।

ছারছীনা মাদরাসায় ১৯৪৫ সনে শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. নিয়োগ প্রাপ্তির সময় যে আবেদনপত্র মাদরাসার দফতরে জমা দিয়েছিলেন, উক্ত আবেদনপত্র মাদরাসার রেকর্ড রুমে রক্ষিত রয়েছে। আবেদন পত্রে দেওবন্দ থেকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার যে বিবরণ শায়খ খোতানী র. প্রদান করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

০১) দাওরা তাফসীর; ১৯৪৪ সন, ১ বিভাগে ১ম, দারুল উলূম দেওবন্দ।
০২) দাওরা হাদীস; ১৯৪৩ সন, ৩য় স্থান, দারুল উলূম দেওবন্দ।

০৩) ইলমে হান্দাছাহ; ১৯৪২ সন, দারুল উলূম দেওবন্দ।

০৪) ইলমে হাইয়াত; ১৯৪১ সন, দারুল উলূম দেওবন্দ।

নিয়ায মাখদূম খোতানী র. যখন ১৯৪৪ সনে দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করে তথায় কুরআন ও হাদীসের উচ্চ গবেষণায় রত, তখনই ডাক আসে ছারছীনা আগমনের। আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই হাদীসে নববীর খাদেমের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। বাংলার বিখ্যাত হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র ছারছীনায় হাদীসের দরস শুরু হয়েছে ১৯৩৮ সনে। পঙ্গপালের মত বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে হাদীসের শিক্ষার্থীগণ ভীড় করতে লাগলেন ছারছীনায়। ইতোমধ্যে ১৯৪৪ সনে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সরকারী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা মাদরাসাকে টাইটেল মঞ্জুরী প্রদান করেন। তখন আইন ছিল কোলকাতার বাইরে কোন টাইটেল মাদরাসা থাকতে পারবে না।

ছারছীনার হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে উচ্চস্তরের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই ছারছীনা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ওলীয়ে কামিল, বিশ্ববিখ্যাত পীর মরহুম মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. দেওবন্দ থেকে একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস আনার ব্যাপারে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সহয়োগিতা কামনা করলেন। পীরে মরহুম মুহাদ্দিস চেয়ে চিঠি দিলেন দেওবন্দে। একদিকে মুহাদ্দিস চাওয়ার চিঠি পৌছল, অন্যদিকে নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর দেওবন্দের শিক্ষা ও গবেষণা সমাপ্ত হয়ে গেল। কি চমৎকার মিল! আল্লাহর কুদরত কে বুঝে? একদিকে আল্লাহর এক মহান ওলী, অন্যদিকে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর হাদীসের সেবক।

পীরে মরহুমের চিঠি দেওবন্দে পৌছার পর সেখানকার শিক্ষকগণ সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রদের ডাকলেন, কাকে পাঠাবেন সুদূর ছারছীনায়। বাংলার গণ্ড গ্রামে অস্বাস্থ্যকর খালবিলপূর্ণ আর্দ্র পরিবেশে কে যাবে? সেখানে এ কষ্ট স্বীকার করবে কে? কিসের আশায় যাবে? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলল সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রদের মাঝে। সৌধ বিশিষ্ট শহরে পরিছন্ন পরিবেশ ছেড়ে কে যাবে? জিহাদের ময়দানে পরীক্ষিত বীর সৈনিকের সর্বত্রই বীরত্ব প্রস্ফুট থাকে বৈ কি? তাই কমিউনিস্ট দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সাথে ময়দানে পরীক্ষিত বীর সেনানী নিয়ায বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যাব। নিয়ায প্রস্তুত হয়ে দ্বীনি ইলম প্রচারের জিহাদের ময়দান ছারছীনার

দিকে রওনা দিলেন। সুদূর চীন-রাশিয়ার সীমান্ত দেশ খোতান, ইমাম বুখারীর দেশের কাছে যার ভৌগলিক অবস্থান, সেখান থেকে দক্ষিণ বাংলা ছারছীনা। পথিমধ্যে যুদ্ধের ময়দান, দুর্গম হিমালয়, দেওবন্দ মাদরাসা নূরানী এক পথ পরিক্রমা। চমৎকার এ বিন্যাস দেখে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে বোখারা হতে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা একই ভাবে ভারত-দিল্লী হয়ে বাংলার সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন। নিয়ায আসলেন বোখারার পার্শ্বদেশ খোতান থেকে ভারতের দেওবন্দ হয়ে বাংলাদেশের ছারছীনায় ১৯৪৫ সনে। মাঝে চলে গেছে ৬৮৫ বছর। ৬৮৫ সংখ্যার মূল সংখ্যা ৬+৮+৫=১৯ এর মূল সংখ্যা ১+৯+=১০। শূন্য বাদ দিলে থাকে ১। আসলে উভয়েই একই উদ্দেশে তথা হাদীসে নববীর খেদমতে বাংলায় এসেছিলেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ র. এবং নিয়ায মাখদূম খোতানী র. দুজনারই একই মিশন অর্থাৎ বাংলাদেশে ইলমে হাদীস প্রচার ও প্রসারের মিশন। এটাই আমার নিকট এক মহাবিস্ময় বলে মনে হয়; মনে হয় এটা আল্লাহর-ই কুদরত। আবু তাওয়ামা র. হাদীস শিক্ষার যে বীজ বপণ করেছিলেন বাংলার সোনারগাঁও মাদরাসায়, নিয়ায মাখদূম র. তার সফল পূর্ণতা দান করেন। ফুলে ফলে, পুষ্পে পাতায়, শাখা-প্রশাখায় মহিরূহে পরিণত করেন আবু তাওয়ামার সফল প্রতিনিধি নিয়ায মাখদূম র.। আরো লক্ষ্যযোগ্য যে, শায়খ আবু তাওয়ামার বাংলাদেশের সোনারগাঁও এ হাদীস প্রচারের কার্যকাল ১২৬০ হতে ১৩০০, মোট ৪১ বছর। শায়খ খোতানী র. এরও হাদীসের দরস দানে কার্যকাল ১৯৪৫ হতে ১৯৮৬, মোট ৪১ বছর। কী চমৎকার মিল! একজন শুয়ে আছেন তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও এ, অন্যজন বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এসেছেনও প্রায় এক স্থান থেকে, শুয়েও আছেন প্রায় একই জায়গায় মাত্র ২৫ মাইলের ব্যবধানে, সোনারগাঁও আর আজিমপুর কবরস্থানে ঢাকার বুকে।

যা হোক, ১৯৪৫ সনের এক সোনালী দিনে নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছারছীনা মাদরাসায় এসে হাজির হন। পীরে মরহুম নেছার উদ্দীন র., মাদরাসা ও দরবারের সংশ্লিষ্ট সকলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রহণ করলেন মুজাহিদ মুহাদ্দিস নিয়ায মাখদূম খোতানীকে। প্রধান মুহাদ্দিসরূপে দরস দানে ব্যাপৃত হলেন তিনি। শুরু হল আর এক জীবন। ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসে নববীর দরস দানের নিমিত্তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছিলেন তিনি। শায়খ খোতানী র. যুদ্ধের ময়দান থেকে হিজরত করেছিলেন ভারতে, অতঃপর বাংলাদেশে। তাঁর এ হিজরতের ব্যাপারে এক নূরানী নির্দেশ ছিল, যা তিনি স্বপ্নে লাভ করেছিলেন।

তিনি ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসের দরস দানের সময় একবার এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। খোতানী হুজুর র. বলেছেন, আমি যখন আমার মাতৃভূমিতে কমিউনিস্ট দুর্ধর্ষ সৈন্যদের আক্রমণে সহয়োদ্ধাদের প্রায় সকলকে হারালাম, তারা শহীদ হচ্ছিলেন আমার চোখের সামনে একের পর এক কাফেরদের বুলেটে, আমি তখন দূর্গের ওপর তলা থেকে নিচে লাফ দিলাম। নিচে পড়েই বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি একটি ত্যাজি ঘোড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি লাফিয়ে আরোহন করলাম তাতে। গুলী ছুড়ছে কমিউনিস্ট সৈন্যরা আমাকে নিশানা করে। আমি ঘোড়া ছুটালাম যত দ্রুত বেগে সম্ভব। এভাবে বিরামহীন দুদিন ছুটে অবশেষে তিব্বতের নিকট 'তারিম' নামক একটি নদীর তীরে পৌছলাম। নদী কিভাবে পার হব তাই নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলাম। ওদিকে দু'দিনের ক্লান্তি। ঘোড়া থেকে নেমে একটু বিশ্রাম নিতে নদীর তীরে বসলাম। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম একজন দীর্ঘকায় দাড়ী পাকা বৃদ্ধ, সাদা পাগড়ী ও জুব্বা পরিহিত নূরানী চেহারার এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে বলছেন, "নদী পার হয়ে ভারতে আস, তোমার কোন ভয় নাই।" আমি জাগ্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এ কার নির্দেশ? কাকে দেখলাম স্বপ্নে তন্দ্রা মগ্ন হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন অলী হবেন স্বপ্নে দেখা মানুষটি। তাঁর নির্দেশ মান্য করা উচিত। দেরী সংগত নয় মোটেই। এভাবে ভাবতে ভাবতে নদী পার হওয়ার ভয় আমার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে গেল। আমি ঝাঁপ দিলাম নদী বক্ষে। মুহূর্তে সাঁতরিয়ে পার হলাম নদী। এরপর হিমালয়ের দুর্গম পথ পার হয়ে দেওবন্দে পৌঁছলাম। সেখানে আল কুরআন, আল হাদীস ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করে ১৯৪৫ সনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছারছীনা শরীফের পীর অলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. এর আহ্বানে তথায় ইলমে হাদীসের দরস দান করতে আগমন করলাম। ছারছীনা শরীফের পীর, মাদরাসা ও দরবারের সকলে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ছারছীনায় এসে আমি যখন প্রথম মরহুম পীর হযরত নেছার উদ্দীন র. কে দেখলাম, তখন আমি বিস্ময়াভিভূত হলাম। কী আশ্চর্য! আমি তো এই ব্যক্তিকেই নদীর তীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনিই তো আমাকে বলেছিলেন, "নদী পার হয়ে ভারতে আস, তোমার কোন ভয় নাই।" আমার কানে আজও আমি সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে পড়ে গেল নদীর তীরের সকল স্মৃতি। আমি মরহুম পীর নেছার উদ্দীন র. এর মর্যাদা ও

উচ্চশান আঁচ করতে পারলাম। আরো বুঝতে পারলাম, এ ছারছীনাই আল্লাহ কর্তৃক আমার জন্য নির্ধারিত কর্মস্থল। আর এসেছি আল্লাহর অলীর দাওয়াতে। তাইতো শায়খ খোতানী র. অর্থ, সম্মান কোন কিছুর লোভে বশীভূত হয়ে ছারছীনা ত্যাগ করেননি। মৃত্যু পর্যন্ত ছারছীনাতেই ইলমে হাদীসের দরস দানে ব্যাপৃত ছিলেন।

শায়খ খোতানী র. ছিলেন পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শের তথা সুন্নতে নববীর মুজাচ্ছাম নমুনা। ১৯৪৫ সনে ছারছীনা মাদরাসায় যোগদান করার পর শুরু হয় তার এক নতুন জীবন। তিনি হাদীসের শিক্ষাপ্রচারে যেমন পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন, সেই সাথে শুরু করলেন নতুনভাবে দাম্পত্য জীবন। তার ঔরষে ৭ জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এভাবে ইলমে হাদীসের খিদমতে বিরামহীনভাবে কেটে যায় ৪১টি বছর। ১৯৮৬ সন। সূর্য যেমন দিনের শেষে খরতাপ হারিয়ে গোধুলীলগ্নে বিবর্ণ হতে থাকে, তেমনি উপমহাদেশের হাদীস শিক্ষার আকাশের দিবাকর শায়খ নিয়ায মাখদূম খোতানী র. শেষ জীবনে বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় রোগে জর্জরিত হতে থাকেন। সুঠাম দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হলেও শেষ বয়সে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগতেন। ১৯৮৬ সনে অসুস্থ অবস্থায় ছারছীনা মাদরাসার কামিল শ্রেণীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ঢাকা চলে আসেন। তারা মসজিদের সন্নিকটে স্বীয় শ্বশুরালয়ে (নিজের কোন বাড়ি না থাকায়, সেখানে তিনি পরিবার পরিজনসহ বসবাস করতেন) অবস্থান কালে তিনি কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১নং ওয়ার্ডের ১৪ নং বেডে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

এভাবে কিছু দিন কাটবার পর পরিশেষে ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ সন, ১১ কার্তিক, ১৩৯৩ সাল, ২৪ সফর ১৪০৭ হিজরী, রোজ বুধবার বিকাল ৫টা ৫ মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগণিত ছাত্র ও গুণগ্রাহিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে শায়খ খোতানী র. জান্নাতবাসী হন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ৩০ অক্টোবর, ১৯৮৬ বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজের পর বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে জানাযার নামায হয়। জানাযায় অগণিত লোকের সমাগম হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ছারছীনা মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ দেশবরেণ্য আলিম মরহুম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শরীফ আব্দুল

কাদের সাহেব। জানাযা শেষে আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

শায়খ খোতানী রহ. এর হাদীস শিক্ষাদানের পদ্ধতি :

শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. প্রধানত বুখারী শরীফ পড়াতেন। পাঠ দানের সময় তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে বসতেন। অতঃপর একজনকে ইবারত পড়তে বলতেন। ইবারতের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি আরবী ব্যাকরণের নিয়ম কানুন উল্লেখ করে ভুল শোধরিয়ে দিতেন। সনদ পাঠের সময় সাহাবীর নাম শেষ হলে "রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমায়ীন" না পড়লে অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। আর 'ক্বলান্নাবিয়্যু' এর পরে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" পড়াকে তিনি অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন বিধায় ইবারত পড়ার সময় যদি কেউ তা না পড়েই মতন পড়া শুরু করত, তবে এত রাগ হতেন যে, চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ হয়ে যেত। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়তেন। পাঠকারী ভুল স্বীকার করে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" পড়ার পর তিনি শান্ত হতেন এবং কখনও যাতে ভুল না হয় সে দিকে কড়া নজর রাখতে উপদেশ দিতেন। ইবারত পাঠ শেষ হলে তিনি প্রথমে সনদ নিয়ে আলোচনা করতেন। রাবীদের জীবন ইতিহাস আলোচনা করতেন এবং সনদের ধারাবাহিকতা নিয়ে কথা বলতেন। রাবীদের খাসায়েস বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এরপর তিনি মতন নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। তরজমা ও ব্যাখ্যা বলার পরে কোন মাসআলা বা ঐতিহাসিক কোন ঘটনার সংশ্লিষ্টতা থাকলে এর ওপর তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করতেন। এ ব্যাপারে তিনি মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং অসংখ্য ইমামদের মতামত উল্লেখ করতেন। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কত নাম ও মাযহাব যে তার জানা ছিল, তা আল্লাহই জানেন। এরূপ শতাধিক মতামত উল্লেখ করে চার মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করতেন। এক এক মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করার সময় সিহাহ সিত্তাহসহ অসংখ্য কিতাবের উদ্ধৃতি তিনি দিতেন। বাব ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং হাদীসের সনদসহ তা উল্লেখ করতেন। সাথে সাথে ছাত্রদের কিতাব খুলে সত্যতা যাচাই করতে বলতেন। প্রতিটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপনকালে তিনি প্রথম কুরআন, অতঃপর হাদীস, অতঃপর সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের মন্তব্য উল্লেখের পর যুক্তির অবতারণা করতেন। একটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপনকালে মনে হত এটাই সঠিক মাযহাব; এর বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। আবার অন্য মাযহাবের দলীল

উপস্থাপনকালে মনে হতো এটাই সঠিক মাযহাব; এর বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। এরপর কুরআন, হাদীস, ইমামদের মন্তব্য ও যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করে সকল মাযহাবের ওপর হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য প্রমাণ করতেন।

বুখারী শরীফের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে বিশেষ করে তরজমাতুল বাব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ বাংলা-ভারত-উপমহাদেশে কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। শায়খ খোতানী র. এর জ্ঞানের পরিমাণ অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের অন্যান্য ওস্তাদ যারা কোলকাতা আলীয়া বা খোতানী হুজুরের প্রথম দিকের ছাত্র এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট পড়েছেন, তারাও বলতেন "খোতানী হুজুর ইলমের সমুদ্র"। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর পর খোতানী হুজুরের মত বড় মুহাদ্দিস আজ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়নি। হুজুরের প্রথম দিকের ছাত্রদের নিকট শুনেছি হুজুর ১টি হাদীসের ওপর দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে কোন বক্তব্যের পুনঃউল্লেখ করেননি। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস انما الاعمال بالنيات। হাদীসের ওপর নাকি হুজুর একাধারে প্রতিদিন ২/৩ ঘণ্টা করে দীর্ঘ একমাস আলোচনা করেছেন; যাতে কোন দ্বিরুক্তি ছিল না। এর দ্বারা বুঝা যায় তার জ্ঞানের ব্যাপ্তি কত বিস্তৃত ছিল।

শায়খ খোতানী রহ. নিজে দিন রাত কিতাব পড়তেন। কিতাব খুলে বসতেন, যখনই সময় পেতেন। তাঁর জীবনে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, এশার নামায পড়ে কিতাব খুলে বসতেন, রাত পার হয়ে যখন ফজরের আজান হত, তখন চৈতন্য ফিরে পেয়ে কিতাব বন্ধ করে ফজরের জামাতে হাজির হতে মসজিদে চলে যেতেন। পরীক্ষার সময় আমরা সাধারণত রাত জাগতাম। তখন রাত ২টা/৩টার সময়ও হুজুরের রুমে আলো দেখে তাকিয়ে দেখতাম তিনি কিতাব পড়ছেন। অসুস্থ শরীরে বৃদ্ধ বয়সেও তার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না। হুজুর বৃদ্ধ বয়সে পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতেন। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নিজ কামরা থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শ্রেণী কক্ষে গিয়ে হাজির হতেন। পথ চলার সময় অসুস্থতার ছাপ চেহারায় পরিস্ফূট হতো। কিন্তু যখনই তিনি শ্রেণীতে গিয়ে কিতাব খুলে বসতেন, তখন যেন মনে হত তিনি পূর্ণ সুস্থ। ইতোপূর্বেকার বিষণ্নতার ছাপ দূর হয়ে চেহারায় এক নূরানী আভা ঝলমল করত। হাদীসের দরসে তিনি যেন প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পেতেন। মনে হতো তাঁর শরীরে কোন অসুস্থতাই নেই। আমরা এ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতাম।

বহুল প্রচারিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান শায়খ খোতানী র. এর হাদীস পাঠদান সম্বন্ধে বলেন "কি যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, যারা তাঁর সংস্পর্শে না এসেছেন, তাঁর ক্লাসে না বসেছেন, তাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। একটি হাদীস নিয়ে আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত। এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে এ যুগের প্রখ্যাত আলেমদের কি মত, তা অনর্গল বলে যেতেন, রেফারেন্স দিতেন সব কিতাবের। বলতেন, এ থেকে কোন মাসয়ালা/বিধান বের করা হয়েছে তা বিশদভাবে। তিনি ছিলেন পাক্কা হানাফি। কিন্তু পাঠদানকালে কোন মাসয়ালা বা বিধানের আলোচনাকালে দেখতাম, এ সম্পর্কে এক এক করে সবার দলিলই সমানভাবে তিনি পেশ করে যাচ্ছেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে, যার মত যখন বলতেন, তখন তা এমন বিশদভাবে তাদের সব যুক্তি প্রমাণ সহকারে বলতেন– মনে হতো এর বুঝি কোন প্রতিউত্তর নেই। এভাবে ১০/১৫ বা ২০টি মত থাকলে তা বিস্তারিতভাবে পেশ করে তার পরে তিনি হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টাররূপে অবতীর্ণ হতেন। মনে হত যেন শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী, আহলে হাদীস, শিয়া, মোতাজেলী, খারেজী এমনি সব মতবাদের ইমামরা তাঁর সামনে উপস্থিত। একটি একটি করে তাদের সব দলীল-প্রমাণ কুরআন, হাদীস, দর্শন, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করে আবার প্রত্যেকের সামনে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরতেন। ধরনটা এমন– যদি এই না হবে তবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কী?

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হত তিনি যেন কোন যুদ্ধের ময়দানে প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সামনে মোকাবেলা করে চলছেন। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতেই হবে এবং করতেনও। এমনভাবে করতেন যে, আর মাথা উঠাবার কোনই ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকতো না। মনে পড়ে ছোট্ট একটি হাদীস নিয়ে তিনি একাধারে এক মাস এভাবে লেকচার দেয়ার পর বলেছিলেন, "ছোড়ো ভাই, আগে চলো, এয়সা আগার চলতে রাহে তো নেসাব খতম নেহী হোগী"। অর্থাৎ, এই বিষয়ে এখন ক্ষান্ত দাও ভাই, এভাবে চলতে থাকলে তো সিলেবাস শেষ হবে না।

হাদীস শাস্ত্রের সনদ বা বর্ণনা সূত্র, মতন বা মূলবাণী এবং একই হাদীসের বিভিন্ন বিন্যাস পদ্ধতি ও ইমামদের প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসের পর্যায়, শ্রেণীভেদ, বর্ণনা বিন্যাস, ক্রমবিস্তার ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। হাদীস চর্চা, হাদীসের ব্যাপ্তি,

হাদীসের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে যে গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁর ছিল, তার নজীর সমকালীন পৃথিবীতে বিরল। তিনি যে কোন হাদীসের ওপর দিনের পর দিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর এই অতূলনীয় মণীষা ছিল মূলত আল্লাহ ও রাসূল্লাহ সা. এরই একান্ত ভালোবাসার পরিপূর্ণ বিকাশ।

তিনি যখন হাদীসের দরস দিতেন; তখন তাঁর কমনীয় চেহারায় ফুটে উঠত এক অনির্বচনীয় জ্যোতির অনিন্দ্য সুন্দর স্রোতধারা। তাঁর চারু ও ওষ্ঠ পল্লব হতে সেই স্রোতের কমনীয় বিন্দু যখন ঝরতে থাকত, তন্ময় হয়ে যেত জ্ঞান পিয়াসী অলীকুল ছাত্রমণ্ডলী। আপন অস্তিত্ব ও পরিবেশ-প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা. এর পূত বাণীর গভীর সাগরে তারা তলিয়ে যেত। মন, প্রাণ দেহ নিংড়ে বেরিয়ে আসত একটি মাত্র ধ্বনি– এ যে আল্লাহর হাবীব নূরনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণী। আল্লাহর হাবীব যে তাঁর কথার মাঝেই ফুলের সৌরভের মত প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। খোতানী হুজুরের স্নিগ্ধ কোমল হৃদয়স্পর্শী ভাষণে আমরা এর রেশ খুঁজে পেতাম। শায়খ খোতানী রহ. বুখারী শরীফ খতম করতেন নিয়মিত। দৈনিক তিলাওয়াত করতে করতে খতম হত ৩০ পারা। আবার শুরু করতেন প্রথম থেকে। এভাবে চলছিল মৃত্যু অবধি। জানতে পারিনি এভাবে তিনি জীবনে কতবার বুখারী শরীফ তেলাওয়াত খতম করেছিলেন। শায়খ খোতানীর অনেক ছাত্রের নিকট শুনেছি স্বয়ং ইমাম বুখারী র. এর নিকট স্বপ্নে বহুবার বুখারী শরীফ পড়েছেন তিনি।

হাদীস পাঠের আদব :

মহানবী সা. এর পবিত্র বাণী হাদীসের দরস দানকালে শায়খ খোতানী র. সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করতেন। শ্রেণীতে কেউ অন্যমনস্ক থাকতে পারত না। যে ব্যাপারটি ছাত্রদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দিত তা হল হুজুর সুস্থ কি অসুস্থ হোন না কেন শ্রেণীতে এসে নামাযের মত দু'পা ভেঙ্গে বসতেন এবং পায়ের দুটি পাতা একদিকে (সাধারণত ডান দিকে) বের করে দিতেন। অতঃপর বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে ঠেস দিয়ে রাখতেন এবং ডান হাত দিয়ে কিতাব ধরতেন। এভাবে দু-তিন-চার ঘণ্টা কেটে যেত, কখনো তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না। অথচ আমরা এভাবে বসলে একটু পরপর পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম।

একদা একজন ছাত্র এভাবে দীর্ঘ সময় বসে থাকলে হুজুরের কষ্ট হয় কিনা জিজ্ঞেস করায়, তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "ইমাম মালেক র. এর ঘটনা কি তোমরা জান না? হাদীসের দরস প্রদানকালে একবার তাঁকে একটি

বিষাক্ত বিচ্ছু দংশন করল। তাঁর পবিত্র চেহারা বিষের প্রতিক্রিয়ায় নীল হয়ে গেল। দরস শেষ হওয়ার পর ছাত্ররা তাঁর চেহারা নীল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেছিলেন, আমাকে একটি বিষাক্ত বিচ্ছু দরস প্রদানকালে দংশন করেছে। যার বিষে আমার শরীর নীল হয়ে গেছে। ছাত্ররা বলল, আমাদের বললেন না কেন? আমরা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেলতাম। ইমাম মালেক র. বললেন, হাদীসের দরস দেওয়ার সময় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলেও মহানবী সা. এর হাদীসের আদবের জন্য নড়াচড়া করিনি। অতএব হাদীস সম্মুখে নিয়ে কেমন করে নড়াচড়া করি?" শায়খ খোতানী র. কী আদব দেখাতেন মহানবী সা. এর পবিত্র হাদীসের প্রতি!

ইমাম বুখারী র., ইমাম মুসলিম র., ইমাম নাসাঈ র., ইমাম তিরমিযী র., ইমাম আবু দাউদ র., ইমাম মালেক র., প্রমুখ তাঁদের স্বীয় শাগরিদের সম্মুখে দরস প্রদানকালে আদব লেহাজের দিকে যে ধরণের দৃষ্টি রাখতেন, তদ্রূপ শায়খ খোতানীও দরসে হাদীসের আদব রক্ষা করতেন। শায়খ খোতানী র. রোগাক্রান্ত, অসুস্থ অবস্থায়ও যখন দরসে হাদীসে বসতেন, তখন মনে হত তার কোন অসুস্থতা নেই। এক নূরানী আভায় চেহারা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত। তিনি যেন প্রাণ ফিরে পেতেন দরসে হাদীসে বসলে।

শায়খ খোতানী যেমন ছিলেন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, তেমন কিতাব মোতালায়ায়ও ছিলো তার বিস্ময়কর ধৈর্য্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত তিনি কিতাব দেখতেন। নিজ বাসকক্ষে যখন কিতাব নিয়ে বসতেন, তখনও দরস গাহের মত দু'জানু হয়ে নামাযের মত বসতেন। মোতালায়া করার সময়ও কখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করা তার অভ্যাসে ছিল না। অনেক সময় ফজরের নামায পড়তে মসজিদে জামাতে শামিল হওয়ার জন্য খুঁড়িয়ে হেঁটে চলতেন। পরে জানা যেত যে হুজুর এশার নামায বাদ কিতাব খুলে দু'জানু হয়ে বসতেন। তন্ময় হয়ে কিতাব দেখতে দেখতে ফজরের আজান শুনে চেতন ফিরে পেতেন এবং ওজু করে মসজিদে রওয়ানা হতেন। সারা রাত একই পায়ের ওপর ভর করে কিতাব মোতালায়ায় রত থাকতেন বিধায় পা দুটো ভার হয়ে ব্যথার সৃষ্টি হত। এরূপ একদিনের ঘটনা জানা যায়, শায়খ খোতানীকে একদিন ফজরের জামাতে দেখা গেল তিনি খুঁড়িয়ে চলছেন। ব্যাপার কি, কোন আঘাত পেলেন নাকি? পরে জানা গেল এশার নামাযের পর হাদীস খুলে দেখতে বসে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না। খেয়াল ছিল না নড়ে বসবারও। মুয়াজ্জিন

যখন ফজরের আজান দিলেন তখন ধ্যান ভাঙল। বাম পায়ের ওপর একটু বেশী ভর করে বসেছিলেন, তাই সে পা আর নাড়াতে পারছিলেন না।

শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. বলেছেন যে, "একদা উম্মুল মুমেনীনী হযরত হাফসা রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস আমি মোতালায়া করছিলাম। হাদীসটির মর্ম বুঝবার জন্য অনেক শরাহ শরুহাত দেখলাম, কিন্তু কোনটা থেকেই যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলাম না। আমার মনও পরিতৃপ্ত করতে পারলাম না। এ অবস্থায় কিতাব দেখতে দেখতে গভীর রাতে আমি নিদ্রা গেলাম। স্বপ্নে দেখলাম, উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রা. আমার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি বললেন, "এ হাদীসটির মর্ম তুমি বুঝ না?" এই বলে তিনি এর মর্মার্থ আমায় বলে দিলেন। আমার ঘুম ভাঙল। আমি সাথে সাথে উঠে ওজু করে উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রা. এর বক্তব্য কিতাবের হাশিয়ায় লিখে নিলাম। এ কিতাবখানি হুজুরের নিকটই মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষিত ছিল। তিনি কাউকে কাউকে তা দেখিয়েও ছিলেন।

হাদীস শিক্ষা প্রচারে শায়খ খোতানী র. এর কৃতিত্ব :

মুহাদ্দিস হিসেবে শায়খ খোতানী র. এর কৃতিত্ব নিরূপণ করা একটি ব্যাপক গবেষণার বিষয়। কারণ, ১৯৪৫ ইং সন থেকে ছারছীনা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত একচল্লিশ বছর তিনি ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে বিরামহীন খেদমত করেছেন। প্রতি বছর বহু ছাত্রকে তিনি নিয়মিত দরস দিয়েছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের বহু মাদরাসায় বুখারী শরীফের প্রথম সবক দিয়েছেন। হুজুরের ছাত্ররা আবার বিভিন্ন মাদরাসায় মুহাদ্দিস, মুদাররিস হিসেবে দরস দিচ্ছেন, দিতেছেন। এগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান উপস্থিত করা রীতিমত এক ব্যাপক গবেষণার ব্যাপার। কারণ, তৎকালে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী র. ও আল্লামা মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান র. ছাড়া শায়খ খোতানী র. এর ন্যায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিল না। এ দু'জনের ইন্তিকালের পর শায়খ খোতানী র. বহুদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেঁচে ছিলেন। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী র. এবং আল্লামা আমীমুল ইহসান র. এর পর থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত হাদীস শিক্ষায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে এতদঞ্চলে যে অবদান রেখে গেছেন, তা পর্যালোচনায়ই শায়খ খোতানীর কৃতিত্ব কিছুটা হলেও আঁচ করা যাবে।

১৯৪৬ হতে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত একমাত্র ছারছীনা মাদরাসায় নিয়মিত অধ্যয়নকালে যাঁরা শায়খ খোতানী র. এর নিকট হাদীস পড়েছেন তাদের বছর ওয়ারী একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো–

সন	নিয়মিত ছাত্র সংখ্যা		সন	নিয়মিত ছাত্র সংখ্যা
১৯৪৬ ইং	৪৪ জন		১৯৬৭ ইং	৬৬ জন
১৯৪৭ ইং	৫৩ জন		১৯৬৮ ইং	৭১ জন
১৯৪৮ ইং	৪৮ জন		১৯৬৯ ইং	৭৪ জন
১৯৪৯ ইং	৬৯ জন		১৯৭০ ইং	৮৪ জন
১৯৫০ ইং	৬০ জন		১৯৭১ ইং	৭১ জন
১৯৫১ ইং	৪২ জন		১৯৭২ ইং	৫২ জন
১৯৫২ ইং	৪৫ জন		১৯৭৩ ইং	৮১ জন
১৯৫৩ ইং	৫৪ জন		১৯৭৪ ইং	৯২ জন
১৯৫৪ ইং	৬২ জন		১৯৭৫ ইং	৭৯ জন
১৯৫৫ ইং	৮৭ জন		১৯৭৬ ইং	৯২ জন
১৯৫৬ ইং	৮৮ জন		১৯৭৭ ইং	১০৫ জন
১৯৫৭ ইং	৭৮ জন		১৯৭৮ ইং	৭৮ জন
১৯৫৮ ইং	৭৭ জন		১৯৭৯ ইং	৮৫ জন
১৯৫৯ ইং	৬৪ জন		১৯৮০ ইং	৭৮ জন
১৯৬০ ইং	৭০ জন		১৯৮১ ইং	৬৬ জন
১৯৬১ ইং	৭৯ জন		১৯৮২ ইং	৭২ জন
১৯৬২ ইং	৬৩ জন		১৯৮৩ ইং	৩৪ জন
১৯৬৩ ইং	৬৯ জন		১৯৮৪ ইং	৭৩ জন
১৯৬৪ ইং	৫৫ জন		১৯৮৫ ইং	৫৯ জন
১৯৬৫ ইং	৭৭ জন		১৯৮৬ ইং	৯০ জন
১৯৬৬ ইং	৭২ জন			
সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা = ২,৮৫৮				

নিয়মিতভাবে ছারছীনা মাদরাসায় যারা হাদীসের সর্বোচ্চ সনদ নিয়েছেন তাদের সংখ্যা ২৮৫৮ জন। এ ছাড়াও সমসংখ্যক বা তার বেশি সংখ্যক অনিয়মিতভাবে প্রাইভেটভাবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফরম ফিলাপ করে টেস্ট পরীক্ষার পর ২/৩ মাস

বিশেষ দরসে হাদীস এর ক্লাসে যোগ দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন টাইটেল মাদরাসায় (যেগুলো ছারছীনা মাদরাসার অনেক পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে) বর্ষ শুরুতেই হাদীসের প্রথম সবক দিতে শায়খ খোতানী র. গমন করেছেন। এরপর বলা যায়, অসংখ্য আলিম হুজুরের শিক্ষকতার জীবনে তাঁর নিকট গমন করে ইলমে হাদীসের ইখতেলাফী ও জটিল ব্যাপারগুলো আলোচনা করে জ্ঞান নিয়েছেন। সবকিছু বাদ দিয়েও যদি আমরা নিয়মিত সংখ্যার শায়খ খোতানী র. এর ছাত্রদের দিকে তাকাই তবে দেখা যাবে যে, এর প্রায় প্রত্যেকেই দরস শেষ করে কোথাও না কোথাও হাদীসের দরস দানে ব্রতী হয়েছেন। কেউ বা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কেউ বা মুহাদ্দিস-মুদাররিস হিসেবে প্রসিদ্ধ মাদরাসাগুলোর বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করে ইলমে হাদীসের খেদমতে ব্যাপৃত রয়েছেন। তারা যদি প্রত্যেকে জীবনে ৫০০ জন করে ছাত্রকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তবে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,২৯,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার) এ। পাঁচ শত তো নূন্যতম সংখ্যা। মূলত এ সংখ্যা বহুগণ বেশি। কারণ, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মাদরাসাগুলোর মুহাদ্দিস ও শিক্ষকের পদগুলোতে বেশীর ভাগ শায়খ খোতানী র. এর ছাত্ররাই অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

এ ছাড়াও শায়খ খোতানীর বহু ছাত্র বাংলাদেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ইসলামী বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানে রত আছেন। যাদের মধ্যে বর্তমানে এমনও অনেকে আছেন, যারা তুলনাহীন গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত ও পরিচিত। যেমন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক অধ্যাপক ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান র., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, অধ্যাপক আব্দুল মালেক, মরহুম অধ্যাপক আনসার উদ্দীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান, ড. সুলায়মান, ড. এবিএম ছিদ্দীকুর রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্তমানে (২০০১) বাংলাদেশে ৮,৩৯৫টি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা রয়েছে। এর মধ্যে দাখিল মাদরাসা ৫,৯৯৪ টি, আলিম ১,২১৫টি, ফাজিল ১,০২৪টি এবং কামিল ১৬২টি। এছাড়া রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ইবতেদায়ি মাদরাসা রয়েছে ২২ হাজার। আর সমসংখ্যক রয়েছে রেজিস্ট্রেশনবিহীন। এ মাদরাসাগুলোতে প্রায় ২,৫০,০০০ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। যাদের অনেকেই খোতানী হুজুরের ছাত্র, ছাত্রের ছাত্র, ছাত্রের ছাত্রের ছাত্র অর্থাৎ নাতিপুতি ছাত্র। এর দ্বারাই অনুমান করা যায়, বাংলাদেশে ইলমে হাদীস চর্চায় শায়খ খোতানীর অবদান কতখানি।

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ইন্তিকাল করে বিদায় নিয়ে গেলেও তিনি এক মহামূল্যবান সম্পদ রেখে গেছেন। আর তা হচ্ছে সিহাহ সিত্তার ভাষ্য সম্বলিত ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিশাল গ্রন্থ। বুখারী, মুসলিম তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবের সনদ ও মতনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থগুলোতে সন্নিবেশিত করেছেন তিনি। রেখাটানা এক্সারসাইজ কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অত্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে এগুলো। কিতাবের মার্জিনে আড়াআড়ি লাইনে অত্যন্ত চমৎকার ডেকোরেশন করে তিনি লিখেছেন হাশিয়া। শিরোনামগুলো বড় অক্ষরে আর্ট করে লিখেছেন। এগুলো দেখলে শায়খ খোতানীর জ্ঞান সাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া যায় সৃজনশীল রুচিশীলতারও। সম্ভবত দেওবন্দে শিক্ষা গ্রহণকালে এগুলো মুতালায়া করতেন বলে মনে হয়। গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই আরবী ভাষায় লিখা হয়েছে। ৭ খণ্ডে লিখিত গ্রন্থগুলোর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩,৪৭২। আমি এগুলো হুজুরের শ্যামলীর বাসায় হুজুর আম্মার (হুজুরের স্ত্রীর) নিকট দেখেছি। দ্বীনি ইলমের এ অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ধর্ম মন্ত্রণালয় বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি ওলামা বোর্ড গঠন করে গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করতে পারেন যে, এগুলো শায়খ খোতানীর নিজস্ব রচিত, না তিনি বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য শরাহ-শরুহাত থেকে সংকলন করেছেন।

যাইহোক, এগুলো মূল্যবান বিধায় পর্যালোচনা ও সুবিন্যস্ত করে মুদ্রণ করলে দ্বীনি ইলম তথা সিহাহ সিত্তার শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হবে নিশ্চয়ই। অন্যথায় কালক্রমে হয়ত এ অমূল্য সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

উপসংহারে আমি বলব, বাংলাদেশের দিকে দিকে ইলমে হাদীসের যে চর্চা চলছে, সরকারের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ১৬২টি কামিল মাদরাসাসহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মাদরাসা-মক্তব খানকায় যে ইসলামী জ্ঞান চর্চা চলছে এর পেছনে আল্লামা খোতানী র. এর রয়েছে অপরিসীম অবদান। তাঁর এ অবদান বিষয়ে যথার্থ গবেষণা এখন সময়ের দাবি। এ বিষয়ে গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার নিবন্ধের যবনিকাপাত করছি।

আল্লাহ পাক আল্লামা খোতানী র. কে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আর বিশ্বের তামাম মুসলমানের ওপর বর্ষণ করুন তাঁর অপরিসীম রহমত। আমীন।

وصلى الله تعالى على النبى الكريم وعلى اله واصحابه والمؤمنين والمؤمنات اجمعين.

লেখক :
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লামা খোতানী হুজুর র.

অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন সমকালীন বিশ্বের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ, হাদীসে নববী সা. এর নীরব-নিরলস সাধক। জ্ঞানের সাগর নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম, সীরাত, আদব, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ইলমে তাসাউফের একনিষ্ঠ সাধক এবং যুগশ্রেষ্ঠ অলিও ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস, ইলমে হাদীসের অনন্য ও অকৃত্রিম খাদেমরূপে তিনি জীবনটি কাটিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো সহ এমন কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে খোতানী হুজুর র. এর শাগরিদ না আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ এদেশে ইলমে হাদীসের প্রচার করলেও তিনি ছিলেন তুর্কীস্তানী। তাঁর জীবন ছিল কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। আসুন আমরা তাঁর পরিচয় লাভ করি।

জন্ম, বংশ ও শিক্ষা :

উস্তাযুল আসাতেযা শাইখুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. চীন সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম সীমান্তে সিংকিয়াং প্রদেশের খোতান অঞ্চলে প্রসিদ্ধ শায়খ পরিবারে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মাদ সিদ্দীক ও পিতামহ শায়খ মুহাম্মাদ র. ছিলেন সে অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা। তাঁর পুণ্যময়ী মাতার নাম মুহতারামা আয়েশা খাতুন। খোতানী হুজুর র. এর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা (৯৭) ইন্তিকাল করেন এবং এক বছর পর স্নেহময়ী মাতাও ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন ছয় বছরের বালক খোতানী হুজুর র. এর তত্ত্বাবধানকারী হন তাঁর চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেম। তাঁর মামা শায়খ আহমদ খতীব বদান্যতায় স্থানীয়ভাবে "হাতেমতাই" নামে খ্যাত ছিলেন। তার অন্য এক মামা শায়খ মুহাম্মদ ইসমাইল সিদ্দীকি ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস।

বালক নিয়ায মাখদূম ১২ বছর বয়স পর্যন্ত খোতানের খালাক মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। তুর্কী, আরবী ভাষা, কুরআন, ফিকহ, অংক সহ শরহেজামী পর্যন্ত এখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি বাড়ি থেকে ১৩ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক কাশগরে জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে যান। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ

ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র কাশগরে তিনি সাত বছর অধ্যয়ন করে হেদায়াসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ছোটকাল থেকেই ছিলেন অনন্য মেধার অধিকারী। তীক্ষ্ম ও প্রখর মেধার অধিকারী এই অসাধারণ ছাত্র প্রতিটি শ্রেণীতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সামরিক বাহিনীতে ও জিহাদের ময়দানে আল্লামা খোতানী হুজুর র.:

রুশীয় বলশেভিক বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চীনারা তুর্কীদের ওপর যখন চড়াও হয়, আল্লামা নিয়ায মাখদূম র. তখন কাশগড়ে অধ্যয়নরত। এ অবস্থায় তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা এবং শাশ্বতধর্ম ইসলামের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলদ্ধি করলেন। তাই তিনি ১৯৩৩ খ্রি. দেশীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় দক্ষতা ও নৈপূণ্যের বলে একটি বাহিনীর সেনাপতি হন।

আল্লামা খোতানী হুজুর যে অঞ্চলের সেনাপতি ছিলেন, সে অঞ্চলে একদিন কমিউনিস্ট বর্গীরা আক্রমন করল। লড়াই চলল মাসের পর মাস। কয়েকটা লড়াইতে বিজয়ী হয়ে তাঁরা অবস্থান করছিলেন প্রধান দুর্গে। এ সময় তিনি বাড়ি থেকে খবর পেলেন তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। এটিই প্রথম সন্তান। স্ত্রী ও সন্তানের মুখ দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ছুটি নিলেন কিছু দিনের। ইত্যবসরে এল মারাত্মক দুঃসংবাদ। কমিউনিস্ট বাহিনী পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসছে। পথের জনপদে আগুন জ্বালিয়ে ছার খার করছে। তারা কাছেই এসে পড়েছে। লক্ষ্য তাদের এই দুর্গ। ছুটি বাতিল হল। সাহায্যের আবেদন পাঠানো হল বিভিন্ন স্থানে। প্রস্তুত হলেন মোকাবেলার জন্য। কমিউনিস্ট বাহিনী এসে অবরোধ করল দুর্গ। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত চলল অবরোধ। এর মধ্যে সাহায্য এলো না। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট সৈন্যরা দুর্গের বহির্দেয়াল ধসিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শিলাঝড়ের মত বুলেটের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ধসে পড়েছে দুর্গের সব দেয়াল। বুলেট বিদ্ধ হয়ে একে একে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করছেন সাথী মুজাহিদগণ। মাথার ওপর দিয়ে, কাঁধের পাশ দিয়ে অগণিত বুলেট চলে যাচ্ছে। শত্রু এগিয়ে আসছে, আর সময় নেই। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ভরসা করে ঝাঁপ দিলেন নীচে। দেখে ফেলেছে দুশমন। গুলি চালাচ্ছে তাঁরই দিকে তাক করে। তবুও আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে বেঁচে গেলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুর র.।

স্বদেশ ভূমি পূনরুদ্ধারের সংকল্প :

বীর সেনানী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. সাথী মুজাহিদদের হারিয়ে শত্রু বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মাঝেও ছুটলেন সামনের দিকে। সামনে পেলেন জীন পরিহিত সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি ঘোড়া। তার পিঠে আরোহন করে চলছেন তো চলছেন। আর পিছে তাকাবার সময় নাই। পেছনে শত্রু বাহিনীও ধাওয়া করছে। অগণিত গুলি ছুড়ছে আল্লামা খোতানী হুজুরের দিকে। কিন্তু আল্লাহ যাকে হিফাজত করেন কার সাধ্য তার ক্ষতি করার। কয়েক দিন পাহাড়-পর্বত ঘেরা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলছেন। শত্রু বাহিনীও পেছনে পেছনে আসছে। অবশেষে একটি নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। অতি কষ্টের কারণে দুঃসময়ের একমাত্র সম্বল ঘোড়াটি মারা যায় সেখানেই। ঝাঁপ দিলেন নদীতে। দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটার পর পৌঁছলেন অপর তীরে। শত্রুবাহিনী সেখান থেকে তাদের গতি রোধ করলে একটু নিরাপদ ভাবলেন তিনি নিজেকে। নদীর অপর তীরের সেই এলাকাটির নাম যদিও আমরা সংগ্রহ করতে আজও পারিনি তবুও সে স্থানটি যে চীনের একটি অঞ্চল ছিল তা নিশ্চিত। ওই অঞ্চলটি তখনো কমিউনিস্টদের অধীনে আসেনি। আল্লামা খোতানী হুজুর তখন মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিলেন, যে ভাবেই হোক স্বদেশকে উদ্ধার করতে হবে আল্লাহ দ্রোহীদের হাত থেকে। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। তিনি স্থীর করলেন সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হবেন। প্রয়োজানে জার্মান, ইংল্যান্ড গিয়ে উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। তাই এ অঞ্চলের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলটি যদিও কমিউনিস্ট শাসনের আওতায় ছিলনা তবুও কমিউনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ঐ অঞ্চলের শাসকগণ। অসংখ্য ইসলাম বিরোধী কুপ্রথার অনুসারী ছিল তারা। এমনকি যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হত তখন রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি সামনে পেশ করা হত। আর সৈন্যদেরকে সেই প্রতিকৃতিতে কখনোবা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানকে মাথা নত করে কুর্ণিশ করতে হত। আল্লামা খোতানী হুজুর র. ছিলেন ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী। তিনি সাথে সাথে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানালেন। ঈমানী অগ্নি শিখায় প্রজ্বলিত আল্লামা খোতানী হুজুর র. দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করা যায় না"। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল "এদেশে আলেম সমাজ এ প্রথার অনুমোদন দিয়েছে"। আল্লামা খোতানী হুজুর র. বললেন, "কোন আলেম ইসলামের দলীল নয়। কুরআন, সুন্নাহ-ই ইসলামের দলীল। কুরআন, সুন্নাহর যতটুকু জ্ঞান আমার আছে তাতে আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, এটা ইসলাম গর্হিত কাজ"। যদিও আল্লামা খোতানী হুজুরের প্রতিবাদ ছিল সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রতিবাদী

ছিলেন তিনি একা। সরকারের সাথে কোন প্রকারে একমত হতে না পেরে নিজের ঈমান, ইসলামী আদর্শকে বড় মনে করে বাধ্য হয়ে তিনি ঐ সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে আল্লামা খোতানী হুজুর র.:

চীনের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে আল্লামা খোতানী হুজুর র. দীর্ঘ পথ ও নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে মুহাজির হিসেবে **১৯৩৫** খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৫৫ হিজরী ৮ শাওয়াল উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ভারতের সাহরানপুরে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রখর স্মৃতি শক্তি বলে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অতুলনীয় মেধা ও কঠোর পরিশ্রমে প্রতিটি জামাতে প্রথম স্থান অধিকার করে দারুল উলূমে একজন মুমতায ছাত্র হিসেবে তিনি সুপরিচিত হন। তাঁর বিরল চরিত্র মাধুর্যের কারণে শিক্ষকগণ তাঁকে নিজেদের ছেলে হিসেবে মনে করতেন।

তাঁর যাবতীয় খরচ বহন করতেন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। তিনি দারুল উলূমের দারে জাদীদ নামক ছাত্রাবাসের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে একাই থাকতেন। সর্বদা দ্বীনি ইলম অর্জন এবং দারুল উলূমের সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরামদের একান্ত স্নেহে তিনি ভুলে থাকতেন অতীত জীবনের দুঃখ বিরহের ইতিহাসকে। দারুল উলূম দেওবন্দের তখন মুহতামিম ছিলেন হযরত মাও. কারী তৈয়্যেব র.। আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী র. অনারারী পোস্ট হিসেবে কিছু কাল মুহতামিম ছিলেন। তখন শায়খুল হাদীস ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী র.। আল্লামা খোতানী হুজুরের সাথে তাঁর আসাতিযায়ে কেরামদের ছিল গভীর সম্পর্ক। তিনি অবসর পেলেই আসাতিযায়ে কেরামদের খেদমতে এলমী, আমলী আলোচনায় লিপ্ত হতেন। আল্লামা খোতানী হুজুর র. দারুল উলূমে সর্ব মোট ১০ বছর অধ্যয়ন করে দাওরায়ে হাদীস এবং দাওরায়ে তাফসীরের সনদ অর্জন করেন। তিনি মাদরাসার বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন ছাড়াও কুরআন-হাদীসের ওপর বিশেষ গবেষণামূলক অতিরিক্ত কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ফিকহ, কালাম, আদব, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন।

ছারছীনায় আল্লামা খোতানী হুজুর র. :
ব্রিটিশ ভারতের আইনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সহায়তায় বরিশালের ছারছীনা মাদরাসায় যখন টাইটেল খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন উচ্চ শিক্ষিত মুহাদ্দিসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. খোতানী হুজুরকে দারুল উলূম থেকে আনার জন্য পত্র লিখেন। এদিকে তৎকালীন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরী র. ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আল্লামা খোতানী হুজুরের একান্ত আপনজন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের অনুরোধক্রমে আল্লামা কাশগরী র.ও আল্লামা খোতানী হুজুরকে উৎসাহিত করলেন ছারছীনাতে আসার জন্য। এদিকে মরহুম নেছার উদ্দীন র. এর পত্র পেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের সকল আসাতিযায়ে কেরাম সুপরামর্শ দিয়ে আল্লামা খোতানী হুজুরকে ছারছীনাতে পাঠালেন। ছারছীনা সেদিন ছিল অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর একটি পল্লী মাত্র। তবুও ইলমে হাদীসের খেদমতের মহান উদ্দেশে খোতানের সেনাপতি দারুল উলূমের উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বাংলার নিভৃত পল্লী নারিকেল বীথি বেষ্টিত ছারছীনায় ১৯৪৫ সালে প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোট ৪১ বছর ছিলেন তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে ছারছীনা মাদরাসার অধিকতর সুখ্যাতির অন্যতম কারণ ছিল আল্লামা খোতানী হুজুর র.। তিনি কত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর সাহচর্য প্রাপ্তদের ছাড়া অন্যদেরকে বুঝানো দুরূহ ব্যাপার।

একবার বাইশ ভাষার এক পণ্ডিত আল্লামা খোতানী হুজুরের সাথে কোন এক বিষয়ে বিতর্কে হেরে গিয়ে অবশেষে তাঁকে 'বাহরুল উলূম' আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর দরস বা পাঠদানের পদ্ধতি ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সহজ-সরল উপস্থাপনা, সারগর্ভ বক্তব্য, সাইন্স, ফিলোসফি, বায়োলজি, এস্ট্রোলজি এক কথায় বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর তাকরীর ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর পাঠদান এতই রূহানিয়াতপূর্ণ ছিল যে, একবার মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে আর তা পড়তে হত না। অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, আল্লামা খোতানী হুজুরের দরসে বসার বরকতে অনেক ছাত্রের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এতবড় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরহংকার, সহজ-সরল জীবনের অধিকারী, রিয়া বা লৌকিকতার উর্ধ্বে। সাধারণ একজন মানুষের প্রতি

তার হৃদ্যতা, স্নেহ বা শ্রদ্ধা ছিল বিস্ময়কর। বিনয়, নম্রতা, উদারতা, সরলতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। মানুষের হক বিশেষ করে ছাত্রদের হকের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সজাগ। আল্লামা খোতানী হুজুর র. আতিথেয়তায় ছিলেন অনন্য। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি মনে করতেন নিজ ছেলে হিসেবে। ছাত্রদের দুঃখ-বেদনায় তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠত। তাঁর ৪১ বছর অধ্যাপনাকালে হাজার হাজার ছাত্র, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে আল্লামা খোতানী হুজুর র. তার চরিত্র মাধুর্যের কারণে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। আল্লামা খোতানী হুজুর র. কখনো কোন অহেতুক আলোচনায় সময় নষ্ট করতেন না। কিতাব মোতালায়া ছিল তাঁর অন্যতম নেশা। রাতভর তিনি কিতাব মোতালায়া করতেন। নামাযের বৈঠকের ন্যায় ছাড়া তাঁকে কেউ কোন দিন দরসে বসতে দেখেছে কিনা জানা নেই।

আল্লামা খোতানী হুজুর র. ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ অলী। দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী র. এর হাতে বাইআত হন। পরে ছারছীনাতে মরহুম নেছারউদ্দিন র. এর হাতে তাজদীদে বাইআত হয়ে বেলায়েতের উচ্চ মাকাম লাভ করেন। শরিয়তের আহকামের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। ফরজ, ওয়াজিব তো দূরের কথা প্রতিটি সুন্নাত-মুস্তাহাবের আমলে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাঙ্গ মানের।

দীর্ঘদিন ইলমে হাদীসের খিদমত শেষে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত রেখে ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর বুধবার বিকেলে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঢাকার আজিমপুর নতুন গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আজো সেখানে আল্লামা খোতানী হুজুরের মাযারে সর্বদা তাঁর শাগরিদদের ভীড় জমে।

খোতানী হুজুরের ইন্তেকালের সাথে সাথে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ এবং তাঁর সুমহান আদর্শকে তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিয়ায মাখদূম সেবক সমিতি, নিয়ায মাখদূম স্মৃতি সংসদ, নিয়ায মাখদূম রিচার্স একাডেমী। আল্লাহ এ একাডেমীর লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সফল করুন এবং আমাদেরকে আল্লামা খোতানী হুজুরের আদর্শে আদর্শবান করুন। আমীন।

লেখক :
অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

আল্লামা খোতানীর জন্মস্থান ও জিহাদ : একটি অনুসন্ধান

ব্যারিস্টার এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান খান

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ("আল্লামা খোতানী") এর নাম শুনেছি ১৯৮৪ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই। মরহুম মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ যিনি আমাকে মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমার পিতা মরহুম ওয়াজেদ আলী খানকে উৎসাহিত করেছিলেন, তার মুখে। উল্লেখ্য আমি চড়ামদ্দি দাখিল মাদরাসা থেকে দাখিল পাশ করেছিলাম আর সে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন মরহুম ফখরুদ্দীন আহমদ ।তিনি খোতানীর ছাত্র ছিলেন। তবে তাঁর কাছে শুনেছি, চীনা হুজুর নামে। মরহুম ফখরুদ্দীন আহমদ অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আল্লামা খোতানীর কথা বলতেন, বলতেন তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা, তাঁর সৌন্দর্যের কথা। দাখিল পাশ করার পর মরহুম ফখরুদ্দীন আহমদ আমাকে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তাঁর বন্ধু মরহুম মাওলানা আবদুর রব খানকে (তৎকালীন ভাইস-প্রিন্সিপাল পরবর্তিতে প্রিন্সিপাল, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা) আমার ব্যাপারে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং ১৯৮৪ সালে ছারছীনা মাদরাসায় আলিম শ্রেণীতে আমি ভর্তি হলাম এবং ১৯৯০ সালে কামিল শেষ করলাম।

সংগত কারণেই আল্লামা খোতানীকে জানার ও দেখার আগ্রহ ছারছীনাতে ভর্তির পর থেকেই ছিল। তিনি যখন ক্লাসে বা মসজিদে যেতেন, তাঁর দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতাম। আর মনে মনে বলতাম-শত সাধনা করেও খোতানী হওয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহ সব দিয়েছেন; দিয়েছেন অগাধ পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য, মেধা, মননশীলতা, রুচিবোধ, সাধনা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, নবী আদর্শ, আধ্যাতিকতা আরো কত কী! এ মানুষের সরাসরি ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ তিনি শুধু কামিল ক্লাসে পড়াতেন, আর আমি কামিলে ওঠার আগেই তিনি অবসরে চলে যান।

তবে তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আল্লামা নিয়ায মাখদূম রিসার্চ একাডেমি গঠনসহ তাঁর স্মরণে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১৯৯৭ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশে লন্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসব কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখায় সচেষ্ট থেকেছি। আমি এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আল্লামা খোতানীর মত মানুষদের নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা দরকার। তাঁরা হচ্ছেন পরবর্তী প্রজন্মের আলোক বর্তিকা।

আল্লামা খোতানী সম্পর্কে আলোচনা এলেই কতগুলো প্রশ্ন অবচেতন মনে দানা বেঁধে উঠত।ওনাকে খোতানী হুজুর বা চীনা হুজুর বলা হয় কেন? আবার তুর্কিস্তানী ও বলা হতো। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে যুদ্ধটাই বা কোন যুদ্ধ ইত্যাদি। আমি এ লেখায় এ কৌতূহলগুলোর একটি উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি। আধুনিক প্রযুক্তির কাছে আমি ঋণী যে, এর সুবাদেই আমার কৌতূহলী মনের ক্ষুধা কিছুটা হলেও নিবৃত হয়েছে।

আল্লামা খোতানী, খোতানে জন্ম গ্রহণ করেন বলেই তাঁকে খোতানী সম্বোধন করা হয় এই খোতান বর্তমানে হোতান নামে পরিচিত। বর্তমান চীন প্রজাতন্ত্রের জিনজিয়াং প্রদেশের একটি প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম হোতান বা খোতান। প্রাচীনকালে খোতানে ছিল বৌদ্ধ রাজতন্ত্র। ১০ম শতাব্দীতে খোতানে ইসলাম ধর্ম অনুপ্রবেশ করে এবং একাদশ শতাব্দীর ১ম ভাগে তুর্কী মুসলমান বংশীয় লোকেরা খোতানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খোতানের সব অধিবাসী মুসলমান ছিল বলে ইতিহাসে জানা যায়।

আল্লামা খোতানীকে তুর্কীস্তানীও বলা হত। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্য এশিয়ার এক বিশাল এলাকাকে তুর্কীস্তান বলা হতো। যার উত্তরে সার্বিয়া, দক্ষিণে তিব্বত, পাকিস্তান, আফগানিস্তন এবং ইরান, পূর্বে গোবী মরুভূমী এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর। আধুনিক তুর্কমিনিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান এবং জিনজিয়াং এর সমন্বয়ে ছিল আদি তুর্কিস্তান। জিনজিয়াং (Xinjiang) ব্যতিত বাকী সবই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল এবং একে বলা হত পশ্চিম তুর্কিস্তান, আর জিনজিয়াংকে বলা হতো পূর্ব তুর্কিস্তান বা চাইনিজ তুর্কিস্তান। জিনিজিয়াং বা পূর্ব তুর্কিস্তানেরই একটি অঞ্চল খোতান, যেখানে মরহুম খোতানী জন্মগ্রহণ করেন। ফলে তাকে খোতানী, তুর্কিস্তানী বা চীনা হুজুর সবই বলা যৌক্তিক এবং সঠিক। একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, এই বিশাল তুর্কিস্তানের মানুষকেই তুর্কি বা Turkic বলা হয়

এবং এ অঞ্চলের লোকেরাই সময়ের বিবর্তনে এক সময়ে বর্তমান তুরস্কে অভিবাসী হয়ে বসবাস শুরু করে এবং আধুনিক তুরস্কের অধিবাসী ও শাসক। খোতানকে যেমন বর্তমানে হোতান বলা হয়। তেমনি প্রাচীন কাশগর কেও Kashi (কাশি) শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাশগরও একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন জনপদ যা পূর্বতুর্কিস্তান বা Xinjiang (জিনজিয়াং) এর অন্তর্গত একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। খোতানের চেয়ে কাশগরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনেক পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ। উভয় অঞ্চলেই ইসলামের আগমন ঘটে দশম শতাব্দীতে। একাদশ শতকে এ অঞ্চল মুসলমান তুর্কিস্তানীরাই শাসন করেন। কাশগরে বড় ধরনের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। চীনের সবচেয়ে বড় মসজিদ ঈদগাহ মসজিদ এই কাশগরেই অবস্থিত।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় Xinjiang (জিনজিয়াং) বা পূর্ব তুর্কিস্তানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। জাতি-গোষ্টি হচ্ছে উইঘুর (Uyghur) হান, কাজাক, তাজিক, হুই, কিরগিজ এবং মঙ্গল। তবে (Uyghur) উইঘুর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী এই প্রদেশে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এ প্রদেশটিতে এক প্রকার শায়ত্বশাসন রয়েছে এবং Xinjiang Uyghur Antonomam Region নামে পরিচিত। আল্লামা খোতানীও উইঘুর (Uyghur) তুর্কিস্তানী জাতিভুক্ত বলে প্রতিয়মান হয়।

আমরা জানি যে, আল্লামা খোতানী কাশগরে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৩৩ সনের দিকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে জিহাদে অবতীর্ণ হন। এ সময় মুসলমান সামরিক নেতাদের মধ্যকার যুদ্ধ হয় এবং আল্লামা খোতানী যে পক্ষ অবলম্বন করেন সে পক্ষের পরাজয় ঘটে এবং পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং অবশেষে ভারতের দেওবন্দে এসে আবার শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। পূর্ব তুর্কিস্তানের (Xinjiang) ঐ সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা ও গৃহযুদ্ধ নিয়ে একটি অনুসন্ধান করা যাক।

এটা অনুমেয় যে পূর্বতুর্কিস্তানের বিশাল এলাকায় কোন একক শাসক ছিল না। বিভিন্ন গোত্র বা শাসক বিভিন্ন এলাকা শাসন করতেন এবং পরপর যুদ্ধ বিগ্রহ করে শাসনক্ষমতা দখল করতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিং রাজবংশ (Qing Dynasty) চীনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব তুর্কিস্তান বা জিনজিয়াং দখল করে এবং জিনজিয়াংকে চীনের

একটি প্রদেশ ঘোষণা করে এবং একজন গভর্নর দিয়ে এ প্রদেশকে শাসন করে। এ অঞ্চলের মুসলিম শাসক বা আমীর ওমরাহদেরকে রাজার কর্মকর্তা নিয়োগ করে। চীনা বংশোদ্ভূত একজন গভর্নর থাকত আর বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন শাসক শ্রেণী কিছুটা নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্ত শাসন করত। তবে তারা প্রাদেশিক গভর্নরে শাসনের অধিনস্থ ছিল এবং রীতিমত কর পরিশোধ করত। প্রাদেশিক গভর্নররা এ অঞ্চলের অধিকাংশ উইঘুর তুর্কি মুসলমানদের ভাল চোখে দেখত না। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল রাখতে জোড় করে তাদের সম্পত্তি দখল করে অমুসলিম চীনাদের প্রদান করত। অধিক হারে করারোপ করত। পশু জবাই করার জন্য করারোপ করত এবং হজ্জে গমনকে নিষিদ্ধও করেছিল কেউ কেউ। প্রাদেশিক চীনা সরকার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ জীয়ে রাখার জন্য সংখ্যালঘু চীনা মুসলামানদের দিয়ে সংখ্যাগুরু উইঘুর মুসলমানদের শাসন করতো। একসময় উইঘুর মুসলমান তুর্কিরা চীনা শাসক গোষ্টীর ওপর বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মোটাদাগে Xinjiang এ তিনটি জাতিগোষ্ঠি প্রধানত বসবাস করত। সংখ্যা গরিষ্ঠ উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু Hui বা Tungans মুসলিম সম্প্রদায় (যাদেরকে চীনা মুসলিম সম্প্রদায়ও বলা হয়) এবং Han Chinese (হান চীনা সম্প্রদায়)। উল্লেখ্য যে, পূর্ব তুর্কিস্তানে অনেকবারই মুসলিম বিদ্রোহ হয়েছে। ১৮৬৪-১৮৭৭ সাল পর্যন্ত ইয়াকুব বেগ চীনা কিং শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণ জিংজিয়াং কাশগরে।

পরবর্তীতে চীনে কিং রাজবংশের পতন হলে রিপাবলিকানরা ক্ষমতা দখল করে এবং ১৯২৮ সালে জিনজিয়াং এর গভর্নর রিপাবলিকান সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে বিশ্বে এ সময়টায় অনেক পটপরিবর্তন হয়। রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লব সফল হয় এবং জারদের পতন হয়। বলশেভিক বিপ্লব সারা মধ্য এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পশ্চিম তুর্কিস্তানে অর্থাৎ তাজাকিস্তান, তুর্কিস্তানে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব তুর্কিস্তান বা Xinjiang এও তাদের আধিপত্য বিস্তারের কলা কৌশল অবলম্বন করে। অন্যদিকে চীনেও গৃহযুদ্ধ চলছিল মাও সেতুং এর পিপলস লিবারেশন আর্মি ও ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান আর্মিদের মধ্যে। এ সময় Xinjiang বা পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসাবে গণ্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত Xinjiang এর মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন স্থানে চীনা প্রাদেশিক শাসনের প্রতি উইঘুর মুসলিম বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯৩১ সালে Hami/Kumul অঞ্চলের উইঘুর মুসলমানরা চীনা প্রাদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

(Kumul Khanate) কুমুল এলাকা প্রায় ২শ বৎসর যাবত একটি মুসলিম শাসক পরিবার শাসন করে আসছিল। শাহ মাকসুদ ইন্তেকাল করলে এ Kumul ev Hami এলাকাকে ১৯৩০ সালে গভর্নর নিজের শাসনের অধীনে দখল করে নেয় এবং অন্য এলাকার লোকদেরকে বিশেষ করে চাইনিজদেরকে এখানে বসতি স্থাপন করানোর জন্য উইঘুর মুসলমানদের অনত্র সরিয়ে ফেলে অবর্ণনীয় দুদর্শায় নিক্ষেপ করে। ১৯৩১ হামী/কুমুলের উইঘুর মুসলমানরা বিদ্রোহ করে এবং অনেক চাইজিনদের হত্যা করে। এ অঞ্চলকে চীনা গভর্নরের শাসনমুক্ত করার জন্য Ma Jhongiang নামে গঞ্জু প্রদেশের এক মুসলিম সেনানায়কের সাহায্য চান Hami ev Kumul এলাকার জনগণ। Ma Jhongiang (Hui) মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এদিকে এ বিদ্রোহ দমনের জন্য গভর্নর রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাশিয়া তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে সর্বোতভাবে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সহায়তা করে। যেহেতু চীনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতরা বলশেভিক আন্দোলন বা মাও সেতুং এর কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করছিল তাই গভর্নরকে পরাস্ত করার জন্য চীনের কেন্দ্রীয় সরকার Xinjiang এর গভর্নরের বিরুদ্ধে গাঞ্জু এর সেনা নায়ক Ma Jhonging কে তার বিশাল সেনাবাহিনীসহ ৩৬তম ডিভিশন হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঐ ডিভিশনের প্রধান ঘোষণা করে গভর্নরকে পরাস্ত করে Xinjiang মুক্ত করার নির্দেশ দেন। ফলে Ma Jhonging চীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এর সেনানায়কের পদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, উইঘুর মুসলমানরা এবং Ma Jhonging কুমুল বিদ্রোহে এক হয়ে যুদ্ধ করলেও উইঘুর মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল চীন শাসন থেকে মুক্তি। কিন্তু Ma Jhonging এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেই Xinjiang এর ক্ষমতাধর হওয়া। কেন্দ্রীয় চীন সরকারের অধীনে। Kumul যুদ্ধে মুসলমনরা পরাজয় বরণ করে এবং হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিকে রাশিয়ায় সহায়তায় প্রাদেশিক গভর্নর বিদ্রোহ দমন করে শাসন কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কাশগর ও খোতান অঞ্চলে লোকেরা উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং একদল লোক তৈরী হয় যারা প্যান ইসলামিজমে বিশ্বাসী এবং চীনা শাসনমুক্ত স্বাধীন তুর্কিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। যারা ইয়াকুব বেগের স্বপ্নকালীন শাসনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এরা একসময় Young Kashgar party Ges Committee for National Revolution গঠন করে। উইঘুর সম্প্রদায় খোতানে একটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনভাই মুহাম্মদ আমিন বুঘরা, আবদুল্লাহ বুঘরা এবং নূর আহমদ জান বুঘরাদের নেতৃত্বে। এরা কাশগরে পুরাতন শহর দখল করে এবং প্রাদেশিক সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ১৯৩৩ সালের ১৫ই মে। এই বিদ্রোহীরা চীনা শাসনমুক্ত একটি স্বাধীন পূর্বতুর্কিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। তিন ভাই এবং উচ্চ শিক্ষিত উইঘুর মুসলমান সাবিত ডামুল্লাহ আবদুল বাকীদের নেতৃত্বে Turkic Islamic Republic of Eastern Turkestan নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে ঘোষণা করে সাবিত ডামুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী ও খোজা নিয়ায প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। এ রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসনে পরিচালিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠাতারা শিক্ষিত ছিলেন, তুর্কি ও ইসলামী জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কাশগরই ছিল এ নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল বা রাজধানী। কিন্তু ঐ রাষ্ট্রকে অন্য মুসলমান সেনানায়করা মেনে নিতে পারেননি। বিশেষত Ma Zhonging এ রাষ্ট্র নির্মুল করার জন্য কেন্দ্রীয় চীন সরকারের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে কাশগর অভিমুখে তার বিশাল সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন উইঘুর সেনাদেরকে পরাস্ত করে এবং প্রায় দুই হাজার থেকে আটহাজার কাশগরী সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। উইঘুর সেনাদেরকে Yengi Hisan শহরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

৩৬ ডিভিশন প্রধান Hui মুসলিম Ma Zhonging ১৯৩৪ সালের ৭ এপ্রিল কাশগরে আসেন এবং ঐতিহাসিক ঈদগাহ মসজিদে ভাষণ দিয়ে বলেন যে, সব উইঘুরদের চীন শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। এভাবে Ma Zhonging এর সেনাবাহিনী নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র Turkic Islamic Republic of Eastern Turkistan এর সমাধি রচনা করেন। অতঃপর Ma এর সেনাবাহিনী Yengi Hisan শহরের অভিমূখে যাত্রা করে উইঘুর বিদ্রোহীদের দমনের জন্য উইঘুর বিদ্রোহীরা Yengi Hisan দুর্গে অবস্থান করেন। Ma এর হাজার হাজার সেনা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, অন্যদিকে

উইঘুর বিদ্রোহীরা মাত্র ৫০০ এর মত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল এবং Ma এর সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে বেশ হতাহত করেন। অস্ত্র শস্ত্র শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উইঘুর সৈন্যরা গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, পাথর, তৈলের আগুন বোমা নিক্ষেপ করে দুর্গকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ১৩ এপ্রিল ১৯৩৪ সালে Ma Zhonging এর Tugan সেনারা কামান ও বোমা মেরে দেয়াল ভেংগে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং তলোয়ারের দ্বারা সব উইঘুর সেনাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। সেনাপতি নূর আহমেদ বুঘরার মাথা বিছিন্ন করে মাঠে বল খেলার জন্য ছুড়ে মারেন। এটাকেই ঐতিহাসিক কাশগর যুদ্ধ বলা হয়।

আল্লামা খোতানী যে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল নিঃসন্দেহে খোতানের আমীর তিন ভ্রাতা-মুহাম্মদ আমীর বুঘরা, আবদুল্লা বুঘরা ও নূর আহমদ জান বুঘরাদের নেতৃত্বে গড়া বাহিনী যারা একটা স্বাধীন তুর্কিস্তান রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলেন চীনের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ তিন ভ্রাতা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসেন সবিত ডামুল্লাহ আবদুল বাকী। যিনি ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং একজন বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নেতা ছিলেন। এরা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও তুর্কিস্তানী জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী। পূর্বতুর্কিস্তানে এটাই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের মৌলিক আদর্শকে ধারন করে। আল্লামা খোতানী কাশগরে শিক্ষা লাভ করে এ বাহিনীতে যোগদান করেন। আল্লামা খোতানী নিজ জবানীতে বলেছিলেন যে, অবশেষে একটি দূর্গে তাঁরা আশ্রয় নেন এবং কয়েকদিন সে দূর্গ থেকেই শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং অবশেষে ঐ দুর্গ আক্রান্ত হলে তিনি দেয়াল টপকে লাফ দিয়ে প্রাপ্ত ঘোড়ার উপরে আসিন হয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। নিঃসন্দেহে এ দুর্গটিই ছিল Yengi Hisan দুর্গ যা ১৩ এপ্রিল ১৯৩৪ সালে Ma Zhonging এর সেনাবাহিনী দখল করে চীনের কেন্দ্রীয় শাসনের অধিভুক্ত করে।

পূর্ব তুর্কিস্তানের ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঐ সময় সংঘটিত মুসলিম বিদ্রোহগুলো কোন একক নেতৃত্বে হয়নি। মুসলমানদের বিদ্রোহ হলেও নিজেদের মধ্যে ছিল অবিশ্বাস, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি। Ma Zhonging একজন মুসলমান সমরনায়ক, যিনি

Hui মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। Hami বা Kumul বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং বিদ্রোহে তিনি সংখ্যাধিক্য উইঘুর মুসলমানদের সমর্থন লাভ করে একক বাহিনী হিসাবে প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে লড়েন। উইঘুর নেতা খোজা নিয়াজ এর সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আবার চীনা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে উইঘুর মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করেন। চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ৩৬ তম ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করলে তিনি ঐ সরকারের সেবাদাস হয়ে উইঘুর মুসলমানদের সাথে সংঘটিত চুক্তি ভংগ করেন এবং অবশেষে স্বাধীন তুর্কিস্তান রাষ্ট্রের পতন ঘটান এবং যারা ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন এবং ঐ রাষ্ট্রের এলাকাকে চীনের কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত করেন। পরবর্তীতে সোভিয়েত মদদপুষ্ট প্রাদেশিক শাসকের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরাস্ত হন এবং তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্টালিনের নির্দেশে ১৯৩৭ সালের কোন এক সময় হত্যা করা হয়।

Xinjiang এর সব এলাকাই তখন সোভিয়েত মদদপুষ্ট প্রাদেশিক সরকারের নেতৃত্বে চলে যায় এবং কার্যত ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। তবে এর মধ্যখানেও উইঘুর মুসলিমদের কেউ কেউ ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং এর নেতৃত্বে Peoples Liberation Army জিনজিয়াং প্রদেশে অনুপ্রবেশ করলে পূনরায় সম্পূর্ণ Xinjiang চীনের অধীনস্ত হয়ে যায়। বর্তমানে Xinjiang আর কোন প্রদেশ নয়; বরং এক ধরনের স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করে।

বর্তমানে এ অঞ্চলের একদল মানুষ East Turkistan এর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারা দাবি করছেন, এ অঞ্চলটি তাদের পিতৃপুরুষদের চীনের নয়; বরং ১৯৪৯ সালে চীন এটাকে দখল করেছে। মুসলিম উইঘুররাই এ স্বাধীনতা আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং তাদের একটি underground দল হয়েছে যার নাম হচ্ছে East Turkestant Independence Movement। তাদের এ আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে উইঘুর জাতীয়তা ও ইসলাম। এ আন্দোলনের সাথে আল্লামা খোতানীর ১৯৩৪ সালের জিহাদের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

লেখক :
অ্যাডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট

খোতানী হুজুর র. কে যেমন দেখেছি

-ড. সৈয়দ মুহা. শরাফত আলী

আমি নালায়েক খোতানী হুজুর র. এর শেষ জীবনের ছাত্র। ১৯৮০-১৯৮২খ্রি. সময়ের মধ্যে কামিল জামায়াতে অধ্যয়নকালে হুজুরের সান্নিধ্য যৎকিঞ্চিত লাভ করেছিলাম মাত্র। তবে হুজুরের বিশাল ব্যক্তিত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য এবং অগাধ প্রজ্ঞার সামান্যতম পরিমাপ করার মত দু:সাহস আমার নেই। খোতানী হুজুর র. ছিলেন বেমেছাল। অথবা তিনি নিজেই তাঁর উদাহরণ। অন্য কাউকে দিয়ে তাঁকে অনুমান করার মত কোন ব্যক্তিকে আমি অন্তত দেখিনি। খোতানী হুজুর র. এর দরস পাওয়ার আশায় হুজুরের একান্ত স্নেহধন্য ছাত্র ও খাদেম আমার মুহতারাম উস্তায হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ রহমতে আলম ইসলাম মিশন মদিনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, তেজগাঁও, ঢাকা এর অনুপ্রেরণায় ও পোষকতায় ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় কামিল জামায়াতে ভর্তি হয়েছিলাম। প্রথম দিনেই খোতানী হুজুর র. এর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ক্লাশ টাইমের বাইরে মাঝে মধ্যে হুজুরের নিকট দেখা করতে যেতাম। ক্রমান্বয়ে হুজুরের সামান্য খেদমতের সুযোগও হয়েছিল অধমের।

খোতানী হুজুর র. ছিলেন চীনা বংশোদ্ভূত। ছারছীনা মাদরাসার ঐতিহ্য মোতাবেক আসাতিজায়ে কেরাম নিজ নিজ এলাকার হুজুর নামে ছাত্র-জনতার মাঝে পরিচিত হয়ে থাকেন। সে সূত্রেই শাইখুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম তুর্কীস্তানী র. চীন দেশের খোতান প্রদেশের বাসিন্দা হিসেবে খোতানী হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন। খোতানী হুজুর র. একাধারে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদীসের দরস প্রদানের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এর পূর্বে কিছু দিন তিনি তদীয় শিক্ষাঙ্গন দারুল উলূম দেওবন্দেও দরসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সনের ২৯ অক্টোবর খোতানী হুজুর র. নশ্বর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। হুজুরের সান্নিধ্যে কিছু দিন অতিবাহিত করার দ্বারা আমার যা ধারণা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল, খোতানী হুজুর র. ছিলেন ছাত্রদের প্রতি যারপর নাই স্নেহশীল। কামিল ফারেগ হয়ে যাবার পর মাঝে মধ্যে হুজুরের নিকট পত্র লিখতাম। হুজুর আমার প্রতিটি পত্রের উত্তর নিজ হাতে লিখে প্রদান করেছেন। অথচ হুজুর তেমন কোন লিখনী রেখে যাননি।

একদিনের ঘটনা- মাদরাসা বন্ধ হচ্ছে, দূর-দূরান্তের ছাত্রদের জন্য দরখাস্ত করে বন্ধের সময়ে বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করার অনুমতি থাকলেও আমি নগণ্য পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা হওয়ায় বন্ধে আমার বোর্ডিংয়ে থাকার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল। একই নিরীখে আমার আরো দুজন ক্লাশমেটের বাড়ী বাগেরহাট ও পটুয়াখালী হওয়ায় তাদের দরখাস্তও নামঞ্জুর হল। বিষয়টি আমরা কোনরূপ সুপারিশের আশায় অথবা কোন রকম অভিযোগের আকারে খোতানী হুজুর র. কে জানাতে যাইনি। নিছক বন্ধে থাকার অনুমতি পাইনি, তাই বন্ধ ঘোষণা হলে বাড়ি যাব- একথাটা হুজুরকে অবহিত করতে গিয়েছিলাম। কেননা, ইতোপূর্বে আমরা হুজুরকে অবহিত করেছিলাম যে, আমরা বন্ধে বাড়ি না গিয়ে বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করব। হুজুর আমাদের কথা শোনা মাত্রই জামা গায়ে জড়িয়ে অফিসে চলে আসলেন। আমাদিগকেও সঙ্গে নিলেন। অফিসে প্রিন্সিপ্যাল হুজুর ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হুজুর পাশাপাশি নিজ নিজ চেয়ার-টেবিলে বসা ছিলেন। খোতানী হুজুরকে তাঁরা যথাযথ একরাম করলেও গৃহিত সিদ্ধান্তে তাঁরা অটল থাকবেন মর্মে জানানোর প্রেক্ষিতে হুজুর আমাদের পক্ষে প্রায় আধা ঘন্টাব্যাপী মাদরাসা ও বোর্ডিং প্রশাসনের দুই অথরিটির সাথে যুক্তি প্রদর্শন ও খণ্ডন করে অবশেষে তাদের অনড় অবস্থানে ব্যথিত মন নিয়ে ফিরে আসলেন। হুজুর চলে যাবার পর বোর্ডিং সুপার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হুজুর আমাদিগকে ভৎসনা করলেন ও ধমকালেন এই বলে যে, আমরা কেন হুজুরের মত ব্যক্তিত্বকে নিজেদের হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছি; কষ্ট দিয়েছি। আমরা যতই বলতে চাইলাম যে, আমরা হুজুরকে বাড়ি যাওয়ার বিষয়ে অবহিত করেছি মাত্র, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হুজুর সে কথায় মোটেই কর্ণপাত করলেন না। খোতানী হুজুরকে মর্মাহত হয়ে ফেরৎ যেতে দেখে আমাদেরও মন খারাপ হল। কেননা, আমাদের বন্ধে থাকার চেয়ে হুজুরের মনোবেদনাই বেশী কষ্টদায়ক ছিল। আমরা প্রমাদ গুণলাম যে, আমাদের কারণেই হুজুরের ছাত্র এর নিকট হতে সামান্য একটি কাজে অবমূল্যায়িত হলেন। ধিক আমাদের বন্ধে থাকার অভিলাষ, কেন যে আমরা জানাতে গেলাম! হায় আমাদের কপাল! আমরাই হুজুরের মনোকষ্টের কারণ হলাম। এশার নামায বাদ আমাদিগকে বন্ধে থাকার অনুমতি দেয়া হলেও আমরা থাকবনা মর্মে স্বীর সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার হুজুরের কাছে গেলাম। হুজুর সবকিছু শুনে বললেন, তোমরা না থাকলে তাদের কিছুই হবেনা। বরং বন্ধে থেকে লেখাপড়া করলে তোমাদেরই উপকার হবে। সুতরাং অভিমান বাদ দিয়ে থেকে যাও। আমরা হুজুরের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য করে ফিরে আসলাম।

কামিল ২য় বর্ষে কিছুদিন হুজুরের পার্শ্ববর্তী কক্ষ ঐতিহাসিক একুশ নম্বর কক্ষে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। খোতানী হুজুরের বাবুর্চি বড়মিয়া এবং আমরা তিনজন ছাত্র আইউব ভাই, আলী আকবর ভাই ও আমি মোট চারজন থাকতাম একসাথে। আমরা পালাক্রমে সারারাত পড়তাম। রাতে কখনো আমাদের কক্ষের বাতি নিভানো হতোনা। একদিন রাত একটার পর হুজুর এসে আমাদের দুজন আলী আকবর ভাই ও আমাকে ঘুমন্ত পেয়ে আইউব ভাইকে বলে গিয়েছিলেন, এরা এতো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে কেন?

খোতানী হুজুর তাঁর অধ্যাপনার জীবন সায়াহ্নেও পূর্বে কিতাব না দেখে কোনদিন দরস দিতেন না। মিটিং বা কোন কারণে কোনদিন কিতাব দেখার ফুরসত না পেলে অকপটে বলে ফেলতেন, আজ কেতাব দেখা হয়নি, তাই দরস দিতে পারছিনা, অন্য সময়ে আরেজী পড়িয়ে দিব। এভাবে কখনো কোন ক্লাশ বাদ গেলে তিনি আরেজীভাবে তা পড়িয়ে দিতেন। একবার ওমরার সফর থেকে ফিরে হুজুর মাসাধিক কাল আরেজী ক্লাশ নিয়েছিলেন। খোতানী হুজুরের নিকট হতে আমরা তিরমিজি শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ ও বুখারী শরীফের অংশ বিশেষ দরস গ্রহণ করেছি। হুজুরের পাঠদানের ধরন ছিল খুবই চমৎকার। তিনি তখনকার প্রচলিত রীতি মাফিক উর্দু ভাষায় তাকরীর করতেন। আরবী রেফারেন্সগুলো ও প্রমাণযোগ্য স্থানগুলো উর্দুতে বুঝিয়ে দিতেন। মুতালায়ার সময়ে তিনি প্রথমে কিতাবের হাশিয়া ও যাবতীয় শরাহ্ সহ মুতালায়া করে আয়ত্ব করতেন। উক্ত হাদীস অন্য যেসব কিতাবে আছে তার শরাহ্গুলোও মুতালায়া করতে ভুলতেন না। অতঃপর তিনি কোন কথাটি আগে এবং কোন কথাটি পরে বলবেন তা, মনে মনে সাজাতেন। প্রথমে তিনি ছাত্রদিগকে ইবারত পড়ার সুযোগ দিতেন, তারপর তিনি নিজে এবারত পড়ে হাদীসের তরজমা করতেন। অতঃপর তাকরীরের শুরুতে হাদীসের কত স্থানে তাকরীর আছে তা সংক্ষেপে চিহ্নিত করে এক এক করে তাকরীর করে যেতেন। প্রয়োজনীয় তাকরীরটুকু তিনি ছাত্রদের বোধগম্য আকারে পেশ করতেন। হুজুর তাকরীর লেখার ওপর জোর তাকীদ করতেন। কাউকে লিখছেনা দেখলে তিনি রাগান্বিত হতেন। আমার নোট খাতার বহু স্থানে কলমের কালি ফুরিয়ে গেলেও হুজুরের দৃষ্টি এড়াতে কালি বিহীন কলম আঁচড়িয়ে রেখেছি। হুজুর মাঝে-মধ্যে এভাবেও বলতেন যে, আমি আজ যে তাকরীর করলাম, তা তোমরা কোন শরাহ কিতাবে এভাবে সাজানো পাবেনা। আমি নিজের থেকে সকল মাজহাবের কথাগুলো সামনে নিয়ে নিজ থেকে সাজিয়ে

এ তাকরীর করেছি। তাই তোমরা না লিখলে সময় অপচয় হবে মাত্র। লেখার সুবিধার্থে হুজুর ধীরস্থীর ভাবে তাকরীর করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তিনবার বলতেন।

হুজুরের তাকরীর অনেকটা ত্বহাবী শরীফের পদ্ধতিতে হতো। হুজুর হানাফী মাযহাবের ওপর সুদৃঢ় ছিলেন। তাকরীরের সময়ও তাই ভিন্ন মাযহাবের প্রমাণগত ও যৌক্তিক দুর্বলতা চোখে অঙ্গুলি দিয়ে ধরিয়ে দিতেন এবং হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদির বিপক্ষে বিরোধীদের যুক্তিতর্ক শুধু খণ্ডনই করতেন না; বরং এমনভাবে তুলে ধরতেন যাতে আমরা হানাফী মাযহাবভুক্ত হতে পারায় গর্বিত অনুভব করতাম। হুজুরের তাকরীর শ্রবণ করে বহু লা মাযহাবী হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়েছে, তার বহু প্রমাণ আছে। আমরা তাই নিজেদের মধ্যে হুজুরকে হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার বলে অভিহিত করতাম। সাথে সাথে হুজুরের উপস্থাপনাও ছিল বেশ হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণ স্বরূপঃ পানির পাক-নাপাকের মাসয়ালায় মালেকী মাজহাবে কম ও বেশী পানির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পানির তিনটি মৌলিক গুণের বেশীর ভাগ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি পাক থাকবে। হুজুর উদাহরণস্বরূপ বলতেন, মালেকী মাযহাবের একজন অনুসারীর সম্মুখে এক পানির মধ্যে মাত্র এক ফোঁটা পেশাব দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হোক, পানি গ্লাস পবিত্র না অপবিত্র? সে বলতে বাধ্য হবে যে, পবিত্র। তাই তাকে বলা যেতে পারে, সুতরাং তুমি পবিত্র পানি পান করে নাও। সে কি তাতে রাজী হবে? শাফেয়ী মাযহাবের মতামতকেও তিনি এভাবে খণ্ডন করতেন যে, পানি দুই কুল্লা হলে শাফেয়ী মাযহাবে অপবিত্র হয়না। সুতরাং তাদের অপবিত্র দুই বা তিন কুল্লা পানি যদি একত্রিত করা হয় তবে তা পবিত্র বলে ঘোষিত হয়। এমতাবস্থায় পূনরায় উক্ত পানি ভিন্ন ভিন্ন কুল্লায় ভরলে তা অপবিত্র বলে গণ্য হবে। কী অদ্ভূত ব্যাপার?

মূলত হুজুরের জ্ঞানের জগৎ ছিল গভীর সমুদ্রের মত। যার তলা অনুমান করা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। সুতরাং তাকরীরের ক্ষেত্রে হুজুর ছাত্রদের ধারণ ক্ষমতার নিরীখে যৎ সামান্যই বলতেন। তিনি প্রায়ই প্রতিটি প্রশ্নের ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দশটি উত্তর বা ব্যাখ্যা প্রদান করে বলতেন-تلك عشرة كاملة। মাঝে মধ্যে আমরা কৌতূহল নিবৃত করতে আরো দু একটি উত্তর ও ব্যাখ্য শোনার আরজ করলে হুজুর আরো ৪/৫টা বলতেন। এভাবে হুজুরের তাকরীরকালীন সময়ে আমরা মন্ত্র মুগ্ধের মত হুজুরের মুখ নি:সৃত অমৃত সুধা পানে তৃষ্ণিত হৃদয়কে সিক্ত করতাম।

আফসোস! আমাদের স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা যদি বেশী হতো তবে হুজুরের জ্ঞান ভাণ্ডারে কিয়দংশ ধারণ করে আমরা বরণীয় হতে পারতাম। কিন্তু সে সাধ্য আমাদের ছিলনা। তাই হুজুরের এন্তেকালে হাদীসের অমোঘ বাণীই প্রতিফলিত হলো-يقبض العلم بقبض العلماء। কোন বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে হুজুর একবার বলেছিলেন, আমি যদি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন প্রশ্নের জবাব দেই, তবে কমপক্ষে ষাটটি জবাব দিতে পারি। বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অলীক মনে হলেও হুজুরের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তা মোটেও অবাস্তব মনে হতো না। মিরাজুন্নবী সা. এর বিষয়ে হুজুর একবার একাধারে একমাস ব্যাপী প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে তাকরীর করেছিলেন। প্রতিদিন তাকরীরের পর হুজুরকে জিজ্ঞেস করা হতো, হুজুর! আরো কিছু আছে কি? হুজুর বলতেন, আরো অনেক কিছু আছে। এভাবে পূর্ণ একমাস তাকরীরের পরও হুজুর বলেছিলেন-আওর বহুত কুছ হায়। সুবহানাল্লাহ!

আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটি ঘটনা না বলে লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। কেননা, বিষয়টি ছিল আমার জীবনে হুজুরের নেক দৃষ্টি পাবার অন্যতম ওসীলা। হুজুর ওমরার সফর হতে ফিরে আরেজী ক্লাশে বুখারী শরীফের কিতাবুল হায়েজের অধ্যায়ে কোন মহিলার একমাসে তিন হায়েজ গত হওয়ার দাবীর সঠিকতা নিয়ে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলেন। হুজুর হায়েজ ও তুহুর নিয়ে সব মাযহাবের মতামত তুলে ধরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেলেন। তাকরীর শেষে হুজুর বললেন, আজকের তাকরীরটি তোমরা এভাবে কোন কিতাবে পাবেনা। আমি সব মাযহাবের মতামতের নিরীখে তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে শানিত করতে এভাবে সাজিয়েছি। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমার তাকরীর তোমরা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছ কি না? কেউ আছ কি তাকরীরটা বলতে পার? হুজুরের জিজ্ঞাসায় সহপাঠীরা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ী করে অবশেষে আমি অধম দণ্ডায়মান হলাম। প্রথমে নোট খাতা নিয়ে দেখে বলতে আরম্ভ করলে হুজুর ধমক দিয়ে বললেন, কী, মুখস্থ বলতে পারবেনা? অগত্যা হুজুরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে আধো আধো করে কোন মতে বলতে পেরে হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। কিন্তু এতটুকুতেই যে হুজুর এত খুশী হয়েছিলেন, তা তখন বুঝতে পারিনি। ঘটনাক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় দরবারে মিটিং ছিল। আমরা কয়েকজন এশার আজানের মিনিট পনের পূর্বে নিয়মিত হুজুরের কামরায় যেতাম। হুজুরের সামান্য খেদমতের পাশাপাশি সারাদিন জমা হওয়া খটকা ও

জিজ্ঞাসাগুলো হুজুরের কাছে পেশ করে সমাধান নিয়ে আসতাম। আজ যথারীতি যেয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। আমরা ফিরে আসতে উদ্যত হতেই দেখলাম হুজুর ক্রোধে রক্তিমাভ অবস্থায় দরজা খুলে প্রবেশ করছেন। আমরাও প্রবেশ করলাম। হুজুর ক্রোধান্বিত অবস্থায় বললেন, "ভাই! ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন যে, আমি অহেতুক বেশী তাকরীর করি, যা ছাত্ররা বোঝেনা। আমি উত্তরে বললাম, বরঞ্চ আপনি তাকরীর কম করেন তাতে, ছাত্ররা তৃপ্ত নয়। আমিতো আজ একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমরা তাকরীর ধরতে পেরেছ কিনা? তখনতো সে যথার্থই বলতে পেরেছে। আমি উনাকে বলেছি, আপনি কী বুখারী পড়ান, আমি আপনাকে দশবার বুখারী পড়াতে পারি। (উল্লেখ্য তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মরহুম মাওলানা আব্দুর রব খান হুজুরের ছাত্র ছিলেন।)

ব্যক্তি জীবনে হুজুর ছিলেন, অত্যন্ত সরল ও স্নেহ বৎসল। তিনি যে ছাত্রের কাছে বাংলা পড়তেন, তাকে অকপটে- আপনি আমার ওস্তাদ- বলতে দ্বিধা করতেন না। তিনি মাদরাসার আইন-কানুনকে যথেষ্ট অনার করতেন। প্রশাসনকেও মান্য করতেন যথাসাধ্য। কোন দিন এক মিনিট দেরীতে ক্লাশে উপস্থিত হতে দেখিনি হুজুরকে। ইলমে হাদীসের শান-মান মোতাবেক ভাল পোষাকে সজ্জিত হয়ে মাথায় পাগড়ী বেধে ক্লাশে যেতেন। যথেষ্ট মোটা হওয়া সত্বেও কখনো চারজানু হয়ে বসে দরস দিতেন না। নিয়মিত জামাতে নামায আদায় করতেন। তসবীহ-তাহলীল ও ওজীফা নিয়মিত আদায় করতেন। হুজুর কোন তদবীর, ঝাড়-ফুক সাধারণত করতেন না। তবে হুজুরের কামালাত ছিল অত্যন্ত উচ্চ মার্গের। কোন জ্বিনের রোগী হুজুরের নিকট নেয়ার উদ্দেশে সিঁড়ির মাঝামাঝি যেতে না যেতেই জ্বিন ছেড়ে যেত। একদা এক জ্বিন ইস্তিঞ্জায় হুজুরকে বিরক্ত করায় হুজুর তাকে বন্দী করে বিচারের সম্মুখীন করেছিলেন। একদিন রাত আড়াইটার দিকে হুজুর আমাকে দাঁতের ব্যাথা উপশমের জন্য একখানা কিতাব খুলে তার একটি দোয়া পড়ে কাঠের ওপর লোহাকে আঘাত করতে বলেছিলেন এবং হুজুর নিজ হাত দিয়ে দাঁতের ব্যাথার স্থান নাড়াচাড়া করছিলেন। কিছুক্ষণ পর ব্যাথা উপশম হলে হুজুর আমাকে কামরায় গিয়ে ঘুম যেতে বললেন। একবার হুজুরের কামরার সম্মুখের নারিকেল গাছে একটি কাগজের ঘুড়ি এসে বেঁধে গেলে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী জিনিষ? হুজুরের কৌতূহল নিবৃত করতে বাস্তব ধারণা দেয়ার জন্যে আইউব ভাই লাটাই, সুতা নিয়ে ছাদে ওঠে ঘুড়ি উড়িয়ে হুজুরকে দেখিয়েছিলেন।

হুজুরের খাদ্যাভ্যাস ছিল যথেষ্ট অভিজাত। টাটকা ঘি, মুরগী, ডিম, মটর, পরাটা, চিকন চালের ভাত ছিল হুজুরের পছন্দনীয় খাবার। ঢাকায় যেতে লঞ্চে খাবার জন্যে বিরিয়ানী রান্না করে নিয়ে যেতেন। তবে খাবার পরিমাণ ছিল খুবই কম। মাছ তেমন একটা খেতেন না। পরিপাটি পোষাক, আতর ও সুরমা ব্যবহার করতেন। সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। এতটুকু অহংকার ছিলনা হুজুরের মনে। স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পূর্বেকার হুজুরের এক ছাত্রের কথা বলায় হুজুর তৎক্ষণাত বলে ফেলেছিলেন, সে একবার বাড়ি হতে আমার জন্য মটর সীম নিয়ে এসেছিল। হুজুরের সাথে সর্বশেষ আমার সাক্ষাতের দিনটি ছিল মাহে রমযানে। আমি ঢাকায় গিয়ে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে তারা মসজিদ সংলগ্ন হুজুরের বাসায় যাই। যেয়ে দেখি, হুজুর আসর নামায বাদ মসজিদে বসে তেলাওয়াত করছেন। আমি সালাম কদমবুছি করে হুজুরের খোঁজ খবর নিয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করে চলে আসি। হুজুর কিছুতেই আমাকে ইফতার না করে আসতে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। হুজুর চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে প্রায় তিন দশক পার হতে চলেছে। কিন্তু আজো হুজুরের স্মৃতি আমাদের হৃদয় পটে ভাস্বর হয়ে আছে। দুআ করি আল্লাহ পাক হুজুরের যাবতীয় খিদমত কবুল করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। এবং যে নবীর হাদীসের প্রতি উৎসর্গ প্রাণ হয়ে তিনি ইলমে নববীর সুযোগ্য মুহাদ্দিস গঠনে জীবন পার করে গেছেন, সেই নবীর একান্ত সাহচর্য দান করুন। আমীন।

লেখক :
অধ্যক্ষ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা

আদর্শ শিক্ষার নভঃদিগন্তে শায়খ খোতানী হুজুর র.

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম শরীফ

গ্রীষ্মের শেষ, মধুমাস, মেঘলা আকাশ, থেকে থেকে বর্ষার ঘনঘটা, নিশির প্রথম প্রহর। আচমকা মুঠোফোনে একটি কণ্ঠস্বর। কে বলছেন, তিনি অধ্যক্ষ মাওলানা আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক। আমার উস্তাদ ভাই। তিনি তো আমারই বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী। পরিচয় মিলল একটি সূত্রেঃ ছোট পুত্র শোয়াইব দারুননাজাতের ছাত্র। তারপর অনেক কাছের মানুষ। একই জ্ঞান নহরের স্বাদ নিয়েছি আমরা। আমি সত্তর দশকে, আর বন্ধু তারও পরে, যার উৎপত্তির আঁধার বিদ্যাসাগর আল্লামা খোতানী হুজুর র.।

মুহতারাম বন্ধু আমাকে বললেন; ইচ্ছে আছে খোতানী হুজুরের জীবনীর ওপর স্মরণিকা বের করার। আপনি তো তাঁর প্রথম যামানার ছাত্র নন। শেষের দিকে এসে প্রাপ্ত হয়েছেন। হুজুর সম্পর্কে আপনার জানার কিছু থাকলে আমাদের শিক্ষা অধ্যায়ে উপকৃত হবে অনেকে।

বেশ কিছুদিন অসুস্থ আমি। এখন আরোগ্যের পথে। সুপ্ত আনন্দে উদ্বেলিত হলাম কথাটি শুনে, আমাকে কিছু লিখতে হবে তাই। কিন্তু আজ হতে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বেকার স্মৃতিচারণ। আর কি-ই-বা স্মরণ থাকতে পারে। নানা কালের সুনামি, নার্গিস, টর্নেডোর আঘাতে সব শেষ। তবুও বন্ধুকে হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে হল। প্রশ্ন কিন্তু রয়ে গেল, আমি কেন আনন্দ পেলাম? বিস্মৃতির গহীনে তলতল প্রায় অনেক কথা কাগজের পাতায় আর কালো অক্ষরের কারাগারে বিধৃত রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন বন্ধু অধ্যক্ষ। কিঞ্চিৎ হলেও তাতে হতে পারি ভাগ্যবান, খোশনসিব, তাই। তাছাড়া কী আর আছে।

ইয়ালুহুল্ খাত্তু ফিল কিরতাছি দাহরা
ওয়া কাতেবুহু রামিমুন ফিত্তুরাবি।
কাগজে লিখন থাকে
যুগ যুগ ধরে,
লেখা যার সে তো শেষ
মাটির কবরে।

আলেমে দ্বীন পয়দা করা খোতানী হুজুরের জীবনে ছিলো প্রধান ব্রত। তিনি বলতেন "পরিবার পরিজন বলে- চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তেজারত করলে আর্থিক সুবিধে হত" তাঁদের এমন আকাঙ্ক্ষার জবাবে বলতেন "মাদরাসা কি খিদমত এসলিয়ে পাকড় রাখখা হোঁ তাকে হাজার মে এক দ্বীনদার নেককার তালেবে ইলম্ ভি নেকল জায়ে তো উওহ মেরি নাজাত কা ওয়াসিলা বনজায়েগা"। যার অর্থ হচ্ছে; মাদরাসার খিদমত এ জন্যই ধরে রেখেছি- হাজার ছাত্রের মধ্যে একজন দ্বীনদার নেককার ছাত্রও যদি বের হয়, তাহলে সেটাই হতে পারে আমার নাজাতের ওয়াসিলা।"।

ওস্তাদের ইচ্ছে এমনটাই ছিলো, যেটা ব্যক্ত করেছিলেন দেশ স্বাধীনের পরবর্তী সময়ে।
ইংরেজী ১৯৬২ সালে দাখেল চাহারমে (৮ম শ্রেণি) ভর্তি হই ছারছীনায়। তখন থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত হুজুরের নজরে রহমত প্রাপ্তির অবকাশ ছিল কমই বলতে হয়। সাধারণ ছাত্র হিসেবে সামনে কখনোবা এসে গিয়েছি। এই যা, আর ছিলাম তো ছোট। দাড়ী মোঁচের রেখাপাত ঘটেনি। ফাজিল জামাআত হতে কিছুটা নেক দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। কামিল ১ম বর্ষ হতে যখন আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফের সবক শুরু হলো, তখন সান্নিধ্য পেয়েছি কিছুটা। কামিল ২য় বর্ষে বুখারী ও নাসায়ী শরীফের দরস হতে নেক নজর ও দু'আর পরশ লাগল। ছুটিকালীন সময়ে প্রায়শ থাকতাম মাদরাসায়। সুদূর ফরিদপুরের জনপদের কোণ থেকে একা একাই এসেছি ছারছীনায়, তখন কিছু তো শিখতেই হবে। মুহতারাম ওস্তাদ তাঁর নামে বরাদ্দকৃত নব নির্মিত ঘোষের বাড়ী বাসায় থাকতে বললেন। ফাঁকা বাসা। আমারও সুবিধা হলো নিরিবিলিতে পড়াশুনার। শায়খ থাকতেন পুরাতন বাসায় সপরিবারে। কোনো শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে আমার ক্লাসও নিতে হতো অস্থায়ী রুটিনে মাঝে মাঝে। আমার সংকেত নাম ছিল "হাল" অর্থাৎ আব্দুল হালীম। যতদূর মনে পড়ে, শায়খের বরকতের হস্ত দিয়ে একবার দুটো টাকা আমাকে দিয়েছিলেন। তা দিয়ে একটি তাসবীহ কিনেছিলাম। লক্ষ্য করতাম, বড় ছাত্র ভাই আবুল হাসেম কুমিল্লা নিবাসী আমাদের আগের ব্যাচের কামিলের ছাত্র। তিনি হুজুরের পুরাতন বাসায় থাকতেন। বড় মুত্তাকী ভাই। বাসা খালি থাকলে পাহারা দিতে হত। মাটির ভিতের কাঁচা বাসায় ঘরের পোতা লেপতে হত। তিনি সে খিদমত করেন। তিনি নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম হলেন। এ-না-দেখে খিদমতের আগ্রহ অনেকেরই জন্মে। ওস্তাদ মহোদয়গণের সেবা অবশ্যই তারাক্কির বিষয়।

খিদমতছে খোদা মেলতা-হ্যায়, ইবাদতছে জান্নাত মিলতি হ্যায়, জান্নাতছে খোদা বিহতের হ্যায়। তার ফলাফল এ অধমও লাভ করেছে ছোট্ট জিন্দেগীর স্তরে স্তরে। কামিল নির্বাচনী পরীক্ষায় বুখারী শরীফে ওস্তাদের হস্তে সর্বোচ্চ একাশি নম্বর প্রাপ্ত হই। আমার অভ্যাস ছিল, ক্লাসে বসে যে তাকরীর নোট করে রাখতাম, হুবহু সেটাই পরীক্ষার খাতায় লেখা। পরবর্তীতে আমিও শ্রেনি ভাই আঃ কাদের (উজিরপুরী) পুরাতন বাসায় নৈশ-দিবা প্রহরীর কাজ করেছি। এটা আমাদের গৌরব।

কেমন ছিলেন তিনি!

তাকওয়াঃ

হাদীসের দরস প্রদানের সময় খোতানী হুজুর র. রাসুল সা. এর বাণীর প্রতি অনন্য আদব প্রদর্শন করতেন। পুরো পিরিয়ডে তাশাহহুদের আসণ গ্রহণ করতেন। সবক শেষে তাকরীর সমাপ্তিতে মনে হতো সবকিছু পেয়েছি, কোনো প্রশ্নই আর বাকী নেই। আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখতেন না। বুখারীর দরস যেদিন শেষ হল, আর কোনোদিন শায়খের দরস পাবোনা, এ ব্যথা বেদনায় ছাত্রদের কান্নায় আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল। এক ছাত্র ভাই তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তাকে হাতের ওপর করে ছাত্রাবাসে নিয়ে যাওয়া হল।

দরস পরিমাণে অল্প হোক সেও ভালো, কিন্তু বয়ান হতে হবে কামা হাক্কুহু বা যথার্থ। এক সময় কর্তৃপক্ষ বলল: খোতানী হুজুরের সিলেবাস কম চলে। বিষয়টি ওস্তাদের মনে আঘাত হানল। ক্লাসে এলেন, বললেনঃ পড়। এক্ষেত্রে হুজুরের পাঠদানের ধরন হ'ল হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তাকরীর সম্পাদন হবে, তবেই সম্মুখে অগ্রসর হবেন। কিন্তু আজকে তার বিপরীত। তিনি শুধু বলছেন, সামনে চল। নেসাব শেষ করতে হবে। আমরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নিয়ম মোতাবেক দরস প্রদানের জন্য আরজ করলাম। তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে সামরিক বিভাগের ব্যক্তিত্ব। তিনি কি আর বাঁধ মানেন। পরিশেষে ছাত্রদের বিনয় পূর্বক আরজি গ্রহণ না করে পারেন নি।

দেশ স্বাধীন হ'ল। শায়খ ছারছীনায় তাশরীফ আনলেন। আমি কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসায় ২য় মুহাদ্দিস পদে নিয়োজিত। একদা হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। অনুভব করলাম ওস্তাদের কিছু কিছু অসুবিধে পোহাতে হচ্ছে। বিশেষত খাবার-দাবার ও সেবাযত্নে। আগের সে বাবুর্চি আব্দুল ওয়াহেদ

আর নেই। বললাম, বাবুর্চি ভাই আব্দুল ওয়াহেদ আসলে তো ভালো হত। হুজুর তদুত্তরে বললেন, "আপনে নফা' কে লিয়ে দোসরেকো নোকসান পোহচানা ঈমানদারীকা খেলাফ হ্যায়" অর্থাৎ নিজের লাভের জন্য অপরের ক্ষতিসাধন করা ঈমানদারীর বরখেলাপ কাজ, তাই কিভাবে আসতে বলি।

মাদরাসায় শায়খের খাস কামরায় কখনোও কেউ উপস্থিত থাকলে তাকে নিয়ে বের হয়ে দরজা বন্ধ করতেন। কারণ, নিজের অসর্তকতায় কোনো কিছু হয়তো এলামেলো হয়ে রয়েছে, তখন মানবিক কারণে কে-না কি করেছে এমন ধারণা আসতে পারে- সেটা তাকওয়ার পরিপন্থী। এমন আরো ঘটনার অভাব নেই।

একসময়ের কথা, থানায় বন্দুক জমা দিতে হবে। এক পর্যায়ে গুলির সংখ্যা শতকের পরে বিশ-এ। হুজুর বললেন, দেখ বিশ সংখ্যার একটি গালি আছে। লোকে বলে থাকে "অমুক লোক ৪২০ বা ফোরটুয়েন্টি। শুনতে ভালো নয়- অতএব সংখ্যা কম/বেশী করে নাও।

শফিক ওস্তাদঃ

কামিল ২য় বর্ষে অধ্যয়নকালে একদা হাদিয়া স্বরূপ বাসায় একটি মোরগ কিনে দিয়েছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় হল; তা দিয়ে বিরিয়ানী রান্না করে পেয়ালা ভর্তি খাবার নিয়ে এসে হলের নীচ তলার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন- আব্দুল হালীম! আমি ছুটে গেলাম। ওস্তাদ আমার হাতে দিচ্ছেন। আমি নিতে ইতস্তত করছি। তিনি তখন বললেন "ওস্তাদ কি কুই চিজ কবুল না করনা সুন্নাত কা খেলাফ হ্যায়"- ওস্তাদের দেওয়া কোনো সামগ্রী গ্রহণ না করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

কুষ্টিয়া হতে চাকুরীর শুরু জীবনে হুজুরকে জানালামঃ শিক্ষকতার পেশায় কেউ কেউ ছারছীনা যেতে বলছেন। কী করব? হুজুর উপদেশ দিলেন, যেখানে আছো সেখানেই থাকা ভালো। কারণ, আসাতেজায়ে কেরামের মাঝে ওপর শ্রেণির কিতাব না-ও পেতে পারো। আর যদি আসতেই ইচ্ছে কর, তা হলে আমার আবু দাউদ শরীফ তোমাকে ছেড়ে দেব।

শিক্ষকতার জীবনে মাখদূম মেহেরবান শায়খের এ স্নেহ বিজড়িত কথাটি আমার মনের আয়নায় বারবার ভেসে উঠত, ঝংকারিত হত। আজও ভুলি নাই।

খোশ বুয়াদ দোস্তে মোয়াফেক দর জাহাঁ
বা'জে মাখদূম কে বাসাদ মেহের বাঁ।
মন দেয়া বন্ধু হলে
হয় চমৎকার,

গুরুজন কেউ হন
দয়ালু আবার॥

বৈবাহিক জীবনে যেতে পরামর্শ কামনা করলাম। মুহতারাম ওস্তাদ জানালেন "আজকাল ইনফেরাদি যিন্দেগীমে হি-কুছ আযাদী হ্যায়" অর্থাৎ বর্তমান সময়ে একাকী জীবনেই কিছু স্বাধীনতা রয়েছে। এ উপদেশ তাৎক্ষণিকভাবে আমার জন্য অনেক ফলপ্রদ হয়েছিলো।

<u>জ্ঞানের সাগরঃ</u>

এ বিষয়ে শায়খ সম্পর্কে যা কিছু বলা হোক, তাঁকে খাট করা হবে। যাই লেখা হোক, কলম শুকিয়ে যাবে; লেখা শেষ হবেনা। তিনি তো অত্যুচ্চের ব্যক্তিত্ব। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘটনাঃ

ছারছীনা মাদরাসা পরিদর্শনের জন্যে ঢাকা থেকে পরিদর্শক এলেন। সঙ্গে রয়েছেন মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা- এর হেড মাওলানা শায়খ ওবায়দুল হক র.। আমরা দারুল হাদীসে দরসে হাজির। ক্লাস রুম ছাত্রে পরিপূর্ণ। তাঁরা কামিল শ্রেণি দেখবেন। খোতানী হুজুর র. দরস দিচ্ছেন। সম্ভবত আবু দাউদ শরীফের ক্লাস। মাওলানা ওবায়দুল হক র. হুজুরের পার্শ্বেই মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। এক পর্যায়ে চলমান পাঠ হতে খতিবে আ'জম হেড মাওলানা মুহতারাম ছাত্রদের প্রশ্ন করলেনঃ জিন জাতি মানুষের গৃহপালিত পশু গরু-বাছুরের গোবর খেতে আসে কেন? ওরা অন্য কিছুর পায়খানা খেলে তো খেতে পারে। তাৎক্ষণিক খোতানী হুজুর উপস্থিত জবাব দিতে অনুমতি চেয়ে বললেন; তোমরা দেখবে আমাদের ঘরের মুরগীগুলো কিন্তু নিজেদের বিষ্ঠা খায়না, আর ওদের ভালোও লাগে না। ওরা আমাদের মানুষের পায়খানা খায়। এটাই ওদের স্বভাব, লাগেও ভালো। অনুরূপ জিন জাতি ওদের নিজেদের পায়খানা ভালো লাগে না বিধায় আমাদের পশুর খাবার খেতে আসে, এমন জবাবে সকলে আনন্দে অবাক হলেন। ক্লাসরুমে হাসির বন্যা বয়ে গেল।
অতঃপর মাওলানা ওবায়দুল হক র. বললেন, "আমি এমন উত্তরই পেতে চেয়েছিলাম। একে বলা হয় হাজির জবাব বা উপস্থিত উত্তর। ছাত্রগণ! তোমরাও এভাবে উপস্থিত জবাব দিতে শিখবে। সকল প্রশ্নের উত্তর কিতাবের পাতায় থাকে না।" আমি যেন সে চিত্রটি আজও দেখছি।
তারপর খতিব মহোদয় (বায়তুল মোকাররাম পরবর্তীকালে) এক খিস্টান পাদ্রী ও মুসলমান মাওলানা সাহেবের মধ্যে এক তর্ক যুদ্ধে মাওলানা সাহেবের উপস্থিত জবাবে বিজয় লাভের ঘটনাটি বললেন।

বাহাসের এক পর্যায়ে পাদ্রী মাওলানা সাহেবকে প্রশ্ন করলেন “আপনাদের কুরআনে নাকি সব কিছুরই বয়ান রয়েছে? তাহলে বলুন ইংরেজীর কথা কোথায় রয়েছে? মাওলানা সাহেব একটুখানি থেমেই বললেন: হাঁ কুরআনুল করীমে ইংরেজীও রয়েছে।” একথা বলেই বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ইখলাস পাঠের শেষের দিকে ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফু পর্যন্ত নিম্ন স্বরে পড়ে খুব উচ্চস্বরে পড়ছেন “ওয়ান আহাদ” পাদ্রী সাব এই দেখেন ওয়ান আছে। পাদ্রী এদিকে চিন্তা করলেন তাই তো, যেখানে ওয়ান আছে, সেখানে টু-থ্রি-ফোর তো থাকারই কথা। তর্কযুদ্ধে মাওলানা সাহেবের জয় জয়কার হয়ে গেল। একে বলা হয় বাহাস। আজও ভুলিনি সে কাহিনী।

একবার শ্রেণিকক্ষে মিশকাত ক্লাসে পড়াতে যেয়ে আটকে গেলাম। ছাত্ররা কী আর বুঝবে! সে রকম বুঝে নেয়ার মন কই; ছাত্র কোথায়? আর দিন কালের তো আলাদা কাহিনী। একটি হাদীসের সনদে আছে হাসান বিন আলী মুনকারুল হাদীস। এতে আমি থমকে গেলাম। হাসান বিন আলী কিভাবে মুনকার রাবী হবেন? তিনি তো হযরত আলী বিন আবি ত্বালিব কাররামাল্লাহ এর পুত্র হাসান। তখন চিঠি লিখলাম হুজুরের খিদমতে। তদুত্তরে তিনি বিশাল এক পত্রে জবাব দিয়েছেন “ইয়ে হাসান উয়ো হাসান নেহী যু আলী (রা.) বিন আবি ত্বালিব কে লাড়কে হেঁ। বালকে ইয়ে আওর হাসান হ্যায় জেনকা ওয়ালেদ কা নাম ভি আলী হ্যায়। অতঃপর উক্ত আলীর পূর্ণ পরিচয় তুলে দিয়েছেন। তখন আমি যে প্রশান্তি পেলাম তা লিখতে কলম অপারগ।

<u>শিক্ষাঙ্গনে সাধনা</u> :

শায়খ খোতানী হুজুরের দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষা জীবনের সিহাহ সিত্তাসহ অনেক বিষয়ের কলমি নুসখা বা হস্ত লেখা কপি ছিল, যেটা দরস গ্রহণের তাকরীরের মহা সমাহার। আমি সচক্ষে তা দেখেছি। মনে হত এগুলোই তাঁর হায়াতের পাথেয়, সাধনা। যদ্দুর সম্ভব হয়েছে আমি শায়খের দরস দানের তাকরীর লিখে রেখেছি। কালের চড়াই উতরায়ের ভেতরেও আবু দাউদ, তিরমিজী, বুখারী ও নাসায়ী ক্লাসের তাকরীরের খাতা বুকে জড়িয়ে রেখেছি। আজও তা আলমারিতে উজ্জ্বল সাক্ষী। আজ কোথায় সে দিনগুলো, কোথায় সে বড় বড় কিতাব, কোথায় সে তাকরীর আর কোথায় সে ওস্তাদবৃন্দ? সে দিন কি আর ফিরে আসবে, কেউ কি তা কাজে লাগাতে পারবে?

যামানা বা এক হাল রাহতা নেহি।
গোযাস্তা যামানা ফের আতা নেহি।

অর্থাৎ যুগ, কাল, দিন-ক্ষণ একভাবে থাকেনা।
চলে যাওয়া দিনগুলো ফিরে আর আসেনা।

হালাল উপার্জন :

হালাল রুজী উপার্জন দ্বিতীয় ফরজ। হুজুর আমার জানা মতে মাদরাসা হতে বেতন পেতেন তিনশত টাকা। মাদরাসার খিদমতের পাশাপাশি কিছু চাল-সুপারীর ব্যবসা করতেন। বগুড়ার জর্দাও কিনতে পাওয়া যেতো ওস্তাদের কাছে, যা ছিল রুজী রোজগারের কিছু সহায়ক।

রসিকতা :

সর্বোচ্চ মর্যাদার ওস্তাদ হয়েও বড় রসিক ছিলেন তিনি। এমনটা শুনেছি; একদা একা বসে চা পান করছেন। তখন মেহমান এসে হাজির। হুজুর তাঁদের বলছেন, ভাই! চা তো এক কাপ। আপনাদের দিলে আমি কী পান করবো? পুরাতন বাসায় ছাত্র উঠেছে আম গাছে। গাছে বাসা বেঁধে থাকা ডাইয়ে পোকা ওকে কামড়াচ্ছে। বেচারা তো অস্থির। হুজুর বলছেন; ভাই তোমকো ডঙ্ক মারতা নেহি, মহব্বত করতা হ্যায়। তোমাকে কামড়ায় না তোমাকে ভালোবাসে। শুনেছি হুজুরের সপ্তমা কন্যা ভুমিষ্টের পর জিজ্ঞেস করা হল কেয়া হোয়া? হুজুর বললেন, ভাই! ইস সাল ভি লাড়কী হুয়ি। আয়েন্দা দেখা যায়ে কেয়া হো।

মাটির মানুষ :

দেশ স্বাধীনের পর বায়তুল মুকাররমে কোনো এক ঈদের নামাযে ইমামের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। নামায আদায় শেষে স্বভাব সুলভ ভাষায় আরবী ও উর্দূ ভাষায় মুনাজাত করলেন। তা ছাড়া তিনিতো আর বাংলা ভালো বলতে পারেন না। খবরের পাতায় অভিযোগ এলো, তিনি বাংলায় মুনাজাত করেন নি। উদারতার সাথে জবাব দিলেন: অভ্যাসগতভাবে আরবী-উর্দূ ভাষায় এমন করেই মুনাজাত করি। বাংলা ভাষার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা নেই। তারপরেও যদি কেউ মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কী মহান ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হল!

কারামাত :

জানার শেষ কোথায় আর শিক্ষার অন্ত কই! পাক বাহিনীর হাত থেকে দেশ মুক্ত হলো। খোতানী হুজুর ঢাকায় আছেন। তখন সেখানে একটি ঘটনা সংঘটিত হল। আমি শায়খের সাথে একাই একা। বিবরণ নিম্নরূপ:

দেশ স্বাধীনের সম্ভবত মাস খানেক পর '৭২ এর শুরুতে ওস্তাদের কিছু মালামাল ঢাকা পৌঁছাতে হবে। বাবুর্চি আব্দুল ওয়াহেদকে নিয়ে আমি স্বরূপকাঠি থেকে লঞ্চ যোগে ঢাকা আরমানিটোলা আবুল খায়রাত রোডস্থ তারা মসজিদ সংলগ্ন বাসায় মাল সামান পৌঁছালাম। পরদিন আব্দুল ওয়াহেদ ভাই চলে গেলেন। আমাকে সেদিন থাকতে হল। দিন শেষে রাত প্রায় দশ ঘটিকা। আমি ওস্তাদ মহোদয়ের সাথে একটি কক্ষে কথাবার্তা বলছি। আম্মাজান ও বোনেরা অন্যদিকে রয়েছেন। তখন বাসার গেটে শব্দ: আলহাজ খোতানী সাব বাসায় আছেন? একাধিকবার। বাসা থেকে বলা হল তিনি এখানে নেই। বলা হলো গেট খুলতে। এ সময় হুজুর কামরার দরজা ও লাইট বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বলছেন; যমিন পর ছো যাও। আমি ও ওস্তাদ ফ্লোরে শুয়ে পড়লাম। ওদিকে ওরা বাসাতে ঢুকে পড়েছে। খোতানী হুজুর তখন সূরা ইয়াসীনের আয়াত তেলাওয়াত করছেন; "ওয়া জা'আলনা মিম বাইনি আইদীহিম সাদ্দাঁও ওয়া মিন খালফিহিম সাদ্দাঁন ফা'আগশাইনাহুম ফাহুম লাইয়ুব সিরুন।" আর ফ্লোর মুছে ধুলা মাটি হাতে নিয়ে অন্ধকারে দরজার দিকে ফিকে মারলেন। সকল কামরার সামনে লোক। আমাদের কামরার সামনেও। খুঁজছে সব ঘর। বাক্সের চাবি চেয়ে নিয়ে সেগুলো খুলছে। সর্বশেষ ট্রাংকটি খুলেনি যেটার মধ্যে টাকা-পয়সা ছিল। আমাদের কামরায় কোনো আঘাত করেনি। ওরা চলে যাওয়ার মুহূর্তে বলে গেল আগামী কাল দশটায় যেন খোতানী সাব বাসায় থাকেন।

বোনেরা পরে এসে ওস্তাদকে দরজা খুলতে বলছে। হুজুর বের হয়ে সকল ঘটনা জানতে পারলেন। আমি সে রাতে ওখানেই ছিলাম। প্রভাতে হুজুর তাঁর শশুর সাহেবের একটি জামা ও টুপি আমাকে দিয়ে একশত টাকা তোহফা প্রদান করে বিদায় জানালেন। আমাকে বেশ কিছু দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর ওস্তাদের পত্র পেলাম। লিখেছেন তাতে সব ঘটনা। সকাল দশটা পর্যন্ত ওদের জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু তারা আর আসেনি।

মহান আল্লাহ তা'আলার আরশে দু'আ কবুল হয়ে গেল। তিনি সাহায্যের দৃষ্টি ফেললেন। ওদের চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। দরজার সামনে প্রাচীর হয়ে গেল।

আজও স্মরণ করি সে হৃদয় কাঁপানো কাহিনী শতবার, আর ছুটে যায় মন ছাওর পাহাড়ের গুহায় বারবার। নবীজীকে আল্লাহ এভাবেই রক্ষা করেছিলেন কাফিরদের হাত থেকে। তিনি তিলাওয়াত করছিলেন, "লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'আনা। মহান আল্লাহ তাআলা রক্ষা করলেন সকল কিছুই। প্রশংসা যাবতীয় তাঁরই।

একদা ওস্তাদ ভগ্নীরা বলেছিল, আব্বাজান! হামারা তো কুই ভাই নেহি হ্যায়। তদুত্তরে হুজুর ফরমায়েছিলেন, মেরে জেতনে তালাবা হেঁ, সবহি তোমহারে ভাই

হেঁ। হুজুরের ইন্তেকালের পর মুহতারাম ওস্তাদ মাওলানা আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ (মাদারীপুরী হুজুর) উদ্যোগ নিয়ে খোতানী হুজুরের খিদমতের জন্য "নিয়ায মাখদূম কল্যাণ ট্রাস্ট" গঠন করেছিলেন। আমরা অনেক ছাত্র তাতে অংশ গ্রহণ করত আর্থিক সেবার হস্ত প্রসারিত রেখেছিলাম।
সর্বময় আল্লাহ পাকের শোকর, আসাতিজায়ে কেরামের অতি নগণ্য খিদমতের বদৌলতে এবং তাঁদের নেক নজরের পরশে মেহেরবান মাওলার কাছ থেকে অশেষ রহমত প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন অনন্ত জীবনে আমাদের জাযায়ে খায়ের দান করেন।

সময়ের আবর্তন-বিবর্তনে বর্তমানে ব্যস্ততার কারণে হুজুরের পরিবারের সকলে কে কোথায় কেমন আছেন খোঁজ খবর রাখতে পারিনি। আল্লাহ মাফ করে দিন। রাব্বুল আলামীন উনাদের হায়াতে ত্বায়্যিবা এনায়েত করেন। আমাদের ওস্তাদ বোনেরা সাতজন; ফাতিমা, খালিদা, হুমায়রা, রাবেয়া, রোকেয়া, আয়েশা ও বিলকিস সবাই বৈবাহিক জীবনে সুখে আছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস, যদিও বর্তমান অবস্থা অজ্ঞাত। শুনেছি উস্তাদ আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

আল্লাহ তা'আলা শায়খে আজম উস্তাযুল আসাতিযাকে এবং উস্তাদ আম্মাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আলা মাকাম দান করুন এবং আমাদের সকল ওস্তাদ ভাইদের সেখানেও তাঁদের সেবক বানিয়ে নিন।

পরিশেষে যাঁর আন্তরিকতার জবাব দিতে এ হারান মাণিকগুলো সিঞ্চিত হল, কুঁড়ানো হল মুক্তাদানা, সে বন্ধু মুহতারাম অধ্যক্ষ আলহাজ মাওলানা আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক কে আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পারলৌকিক জীবনে শীর্ষ সফলতা দান করুন। আমরাও সেরূপ মর্যাদা পেতে ভিখারী দরগাহে আল্লাহর। আর খোতানী হুজুরের রূহানী ফায়েজ ও বরকত নসিব হোক আমাদের; তাঁর সকল সন্তানের; আমীন।

লেখক :
উপাধ্যক্ষ, কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা, কুষ্টিয়া

মহান জ্ঞানসাধক
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

ড. মোহাম্মদ আবু সালেহ পাটওয়ারী

১৯৮৪ সালে ছারছীনা দরবার শরীফের গদ্দীনশীন পীর মুরশেদে বরহক শাহ সূফী আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ র. ফেনী জেলাধীন ছাগলনাইয়া উপজেলা সদরে অবস্থিত ছাগলনাইয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় শুভাগমন করেছিলেন। আমি তখন অত্র মাদরাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র। হযরত পীর সাহেব কেবলা তাঁর বক্তৃতায় এক পর্যায়ে বলেছিলেন, العلم علمان علم باللسان و علم بالقلب। ইলম দু' প্রকার– ইলম বিল-লিসান তথা ইলমে শরিয়ত আর ইলম বিল-কালব তথা ইলমে তরিকত। ছারছীনা মাদরাসায় উভয় প্রকার ইলম শিক্ষা দেয়া হয়। আপনারা আপনাদের সন্তানদের ছারছীনা মাদরাসায় পাঠাবেন। কথাটি অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার আবেগাপ্লুত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছোট্ট একটি কথা আমার মন মুকুরে চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দিল। বারবার আমার আনমনা হৃদয়ে কথাটি উচ্চারিত হচ্ছিল। আমি মনে মনে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাকে অবশ্যই ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হতে হবে।

অনেক চড়াই উৎরাই আর বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে মহান পরওয়ারদিগারের অপার করুণায় ১৯৮৫ সালে আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হই ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায়। নদীর ধারে গাছ-গাছালী ঘেরা অপূর্ব এক স্থান ছারছীনা দরবার শরীফ আর দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা। বাহির থেকে বুঝার কোন সাধ্য নেই এর মধ্যে অসংখ্য জ্ঞান-পিপাসু জ্ঞান-সাধক আর ইলমে মারেফাতের অবগাহনকারীর মিলনমেলা বসেছে, আর ইলমের অনুসন্ধিৎসু পুণ্যবান শিক্ষার্থী আর গুরুজনের গুঞ্জরণে মুখরিত হচ্ছে অজপাড়া গায়ের এ পুণ্যভূমি। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এক নূরানী পরিবেশের আবহ বিরাজ করছে এ ভূমিতে। এখানকার ছাত্র-শিক্ষক আর দরবারের লোকজনের চলনে-বলনে, আচরণে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পৃথিবীর অন্য স্থান থেকে। যেখানে হরহামেশা শুধু নেকেরই চর্চা হয়। গুনাহ করতে হলে পরিকল্পনা করতে হয়। তারপরও গুনাহে লিপ্ত হওয়াটা কষ্টসাধ্য।
পাঠক! ভেবে দেখেছেন কি? কেমন এক পুণ্যস্থান ছারছীনা দরবার শরীফ আর দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা! প্রথম যখন মাদরাসার বাউন্ডারিতে প্রবেশ করলাম

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম আর অন্যরকম এক আবহের সাক্ষাৎ পেলাম। যে পরিবেশের সাথে তার বাউন্ডারির বাইরের পরিবেশের কোন মিল নেই।

মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মহান প্রভুর দরবারে সাজদা দিয়ে শুকরিয়া আদায় করলাম ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র হতে পেরে। আস্তে আস্তে পরিচিতি জানতে পারলাম এখানকার পৃথিবী বিখ্যাত ও বিশ্ববরেণ্য উস্তাদদের সম্পর্কে। কয়েকজন উস্তাদকে দেখে মনে হল, তাঁরা যেন সাক্ষাৎ ফিরিশতা, অসাধারণ সাধক, নূরের পুতুল, বেহেশতী লোক বলে যাদের বোঝায়, মন বলে এরাই তাঁরা। চেহারার মধ্যে নিষ্পাপ আবহ। বৃদ্ধ বয়সেও তাদের দেখলে মনে হয় এঁরা যেন অবলা শিশু।

আবার ফিরে আসি মুরশিদ কিবলার সে কথায়। ইলম দু প্রকার। ইলম সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। ইলম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি জ্ঞান। তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় ইলম এর বহুমুখী সংজ্ঞা রয়েছে। আমরা সেদিকে যাব না। সাধারণ উপলব্ধিতে যা বুঝি, তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ইলম সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের মাঝে দু ধরনের ধারণা রয়েছে। একটি দীনি ইলম অপরটি দুনিয়াবী ইলম। যাকে আরো সহজে বলা যায়– ধর্মীয় ইলম আর জাগতিক বিষয়ের ইলম। ইদানিং আমাদের সমাজে একদল জাগতিক বিদ্যার পণ্ডিত ইলম এবং আলেম এর সংজ্ঞায় বলছেন, ইলম অর্থ জ্ঞান আর আলেম অর্থ জ্ঞানী। সুতরাং এ সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা তথা জাগতিক জ্ঞানের পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা সকলেই আলেম।

ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী ধর্মীয় লেবাসধারী যাঁরা, তাঁরা যে নিজেদের আলেম দাবি করেন এটি মোটেও সঠিক নয়। আমাদের দেশের প্রথিতযশা একজন বিজ্ঞানী তো আর একটু আগ বাড়িয়ে কুরআনের দলিল দিয়ে (অবশ্য নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী) বলেছেন, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী না হলে তাকে আলেমই বলা যাবে না। তাঁর এ ধারণা অনুযায়ী যারা শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শি তারাই আলেম। এ বিষয়ে আমরা বিতর্কে না গিয়ে ইলমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে বিষয়টির ফয়সালার ভার পাঠকদের কাছে ছেড়ে দিতে চাই।

দীন ইসলাম ও শরীয়াতের জ্ঞানকে মূলত ইলম বলা হয় পরিভাষাগতভাবে। আর জাগতিক জ্ঞানকে বলা হয় (معلومات) মা'লুমাত। যার বাংলা অর্থ হয় তথ্য। ইংরেজীতে বলে Information। এটিই বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী। একসময় বলা হত Knowledge is power। আর এখন বলা হয় Information is power. আমরা সহজ কথায় বলতে চাই Knowledge

আর Information দুটোই power. তবে ইলম তথ্য-ধর্মীয় জ্ঞান সেটিও power. কিন্তু ইলম বা ইলমে দীনের বহুমাত্রিক ও দ্বিজাগতিক যে power রয়েছে Information ও জাগতিক Knowledge-এ সে power নেই। এ জ্ঞানের ছোঁয়া যারা পাননি তাঁরা এটি মানতে চাইবেন না এবং বুঝতেও চাইবেন না। আসলে বুঝা সম্ভবও নয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ করলে বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হবে। দীনি ইলম এর সম্পর্ক সরাসরি নূর নবীজী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে। এ ইলম এর sours আলাদা। এ ইলমের আগমনের ধারাবাহিকতা স্বতন্ত্র। এর শিক্ষক স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে। আর ইলম যাঁরা অর্জন করেন তাঁরা এর উত্তরসূরী। মূলত তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলেম-উলামা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

انما العلماء ورثة الأنبياء

আলেমগণই নবীগণের ওয়ারিশ। কিসের ওয়ারিশ? সম্পদের? না। তাও নবীজী পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি অপর হাদীসে বলেছেন,

لانورث ما تركنا انما نورّث العلم والشرع

আমাদের (সম্পদের) উত্তরাধিকারী কেউ হয় না আমরা যা রেখে যাই তা সদকা (সকল নাগরিকের সম্পদ তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাবে)। তবে আমরা ইলম ও শরীয়তের ওয়ারিশ বানাই।

নবুওয়াতি এ ইলমের সংজ্ঞায় মোল্লা আলী কারী র. বলেন,

العلم نور فى قلب المؤمن مقتبن من مصابيح مشكواة النبوة.

'ইলম' হচ্ছে একটি জ্যোতি, যা মুমিনের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। যা নবুওয়্যাতের চেরাগদানীর বাতি হতে সংগৃহিত।

অর্থাৎ ইলমে নববীর সরাসরি ফানুস হতে এ জ্যোতি দ্যুতি ছড়ায় এবং মুমিনের হৃদয়ে তা বিচ্ছুরিত হয়। তার নমুনা ফুটে ওঠে আলেমের মুখাবয়বে, সমগ্র শরীরে, কথায় এবং কাজে। মূলত দীনি ইলম একটি জ্যোতি। ধর্মীয় Information অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করতে করতে হৃদয় যখন পঙ্কিলতামুক্ত হয়, তখন প্রকৃত ইলমের জ্যোতি একটু একটু করে উঁকি মারে আমলদার আলিমের হৃদয়ে। সে পর্যবেক্ষণ করে করে এ হৃদয় তাকে ধারণ করার যোগ্য কিনা। এখানে তার থাকার জায়গা হবে কিনা। দুর্গন্ধ তার সহনীয় নয়।

পাপ-গুনাহ এগুলো দুর্গন্ধ ছড়ায়। নেক আমল খুশবু ছড়ায়। তাই যে আলেমের আমল যত ভাল, সে আলেমের হৃদয়ে সত্যিকার ইলমের জ্যোতি ততধিক। তার হৃদয় তত বেশি জ্যোতির্ময়। তার ছোঁয়ায় অন্যরাও জ্যোতির্ময় হয়। ইলমের সামান্যতম নূর পেলেও তিনি সত্যিকারের আলেম। এ ইলমে হাকীকি সহজে হৃদয়ে আসতে চায় না; যদি না আমলের সুগন্ধি থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেছেন,

العلم شئ لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

ইলম এমন জিনিস যা তার কিয়দংশও তোমাকে দেবে না, যতক্ষণ না তোমার সর্বস্ব তুমি তাকে দিয়ে দিবে।

নিজের পুরোটা তার জন্যে উজাড় করে দিলেই তখন ইলম তার কাছে ধরা দেয়। সে উজাড়তা হবে জ্ঞান সাধনা আর সে অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে। ইনিই সত্যিকারের আলেম এবং মহান আল্লাহর কুল কায়েনাত তাঁকে সম্মান করেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের আলেম কে তা অবশ্যই জানতে পেরেছি।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন ইলমে হাকীকীর এমনই একজন মহান সাধক। ইলমে নববীর চেরাগদানীর জ্যোতির্ময় জ্ঞানের একজন সফল ধারক। যাঁর হৃদয় আলোকিত ছিল নূরে নববীর বরকতময় নূরে। সত্যিকারের ইলমে নববীর ওয়ারিশ ছিলেন এ মহান জ্ঞান সাধক। যাঁর জ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়েছে এ দেশের অসংখ্য সৌভাগ্যবান মানুষের হৃদয়। জ্যোতি লাভ করেছেন হক্কানী আলেম হিসেবে। তাঁর মতো জ্ঞানতাপস এ দেশে না আসলে জ্ঞান সাগরের মধুময় সুধা হতে বঞ্চিত হতেন এ দেশের ইলমে নববীর জ্ঞান পিপাসু হাজার হাজার তালিবুল ইলম।

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা এ দেশের সর্বপ্রথম টাইটেল (কামিল) মাদরাসা। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পর ছারছীনা মাদরাসাই বাংলাদেশে প্রথম টাইটেল মাদরাসা। ছারছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর সাহেব শাহ ছুফী নেছার উদ্দিন আহমদ র. টাইটেল ক্লাস খোলার পর একজন ভালো হাদীসের উস্তাদ পাঠানোর জন্যে দারুল উলূম দেওবন্দে উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম হযরত আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী র. এর কাছে পত্র লিখেন। হযরত মাদানী র. তাঁর সুযোগ্য ছাত্র নিয়ায মাখদূমকে ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসের ওস্তাদ হিসেবে প্রেরণ করেন। চীনের কাশগরের নিকটবর্তী খোতান প্রদেশের

একজন বীর মুজাহিদ ছিলেন নিয়ায মাখদূম খোতানী র.। যেখান থেকে দারুল উলূম দেওবন্দে এসে পরিণত হন হাদীসে নববীর মহান সাধকে। তাঁর এ জ্ঞান সাগরের জ্যোতির্ময় আভা ছড়িয়ে দেয়ার স্থান নির্ধারণ করেন মহান রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশের অজপাড়া গাঁয়ের ইলমে দীনের বাংলার অক্সফোর্ড ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায়।

ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় ইতোপূর্বে ভারতের বিহারের বিখ্যাত আলেম শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুস সাত্তার বিহারী র. কে হযরত পীর সাহেব কেবলা নিয়ে আসেন এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনিই ছারছীনা মাদরাসায় টাইটেল ক্লাশে বুখারী শরীফের দরস দিতেন। আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছারছীনায় আসার পর আল্লামা বিহারী র. তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং ইলমে হাদীসে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে নিজেই তাঁকে বুখারী শরীফের দরস দেয়ার জন্যে আহ্বান জানান এবং তাঁকে শায়খুল হাদীস পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। হযরত খোতানী র. অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অপরাগতা প্রকাশ করেন এবং বিহারী হুজুরকেই বুখারী শরীফ দরস দেয়া অব্যাহত রাখার আবেদন করেন। কিন্তু বিহারী হুজুর তাঁকে বোঝালেন যে, আপনি বুখারী শরীফের দরস দিলে ছাত্ররা বেশি উপকৃত হবে এবং হযরত পীর সাহেব কেবলাকেও বোঝালেন যে, খোতানী হুজুরকে বুখারী শরীফের দরস এবং শায়খুল হাদীসের পদ দেয়ার জন্যে। কী বিনয়াবনতা ইলমে দীনের দুই দিকপালের মধ্যে! অহমিকা আর আত্মম্ভরিতার লেশ মাত্র ছিল না তাঁদের মনে। শেষ পর্যন্ত খোতানী হুজুরকেই বুখারী শরীফের দরসের দায়িত্ব দেয়া হল এবং বিহারী হুজুর মুসলিম শরীফ পড়াতেন। সত্যিকার দীনি ইলম যে মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করে, মানবতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় খোতানী হুজুর ও বিহারী হুজুর তারই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন এ যুগের বিদ্যার্থী আর শিক্ষকমণ্ডলির জন্যে। নিজেদের মধ্যে বিদ্যার ছোঁয়া আর ইলমে নববীর বাস্তব আমল না থাকলে শিক্ষার্থীদের মাঝে তার প্রভাব পড়ে না।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা রা. বলেন,

امرنا ان ننزل الناس على قدر منازلهم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন করি। খোতানী হুজুরকে বুখারী শরীফের দরসের দায়িত্ব দিয়ে বিহারী হুজুর এ হাদীসেরই আমল করলেন। এতে তাঁর মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

খোতানী হুজুর র. ইলমে শরীয়তের মহান সাধক হওয়ার সাথে সাথে ইলমে মারেফাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ছারছীনা দরবারে আগমনের পর মুরশেদে বরহক শাহ ছুফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. এর সংস্পর্শে এসে তিনি ইলমে মারেফাতের সবক নেন এবং অল্প সময়ে ইলমে মারেফাতের উঁচু মাকাম হাসিল করতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রচারবিমুখ এ মহান ব্যক্তি কখনও তাঁর ইলমের জৌলুসকে প্রকাশ করেননি। প্রচারে আসেননি। নিরবচ্ছিন্নভাবে ইখলাসের সাথে হাদীসে নববীর খেদমত করে গেছেন আজীবন।

ইলমে দীন অর্জন করতে হলে ইলমের যে মাধ্যম রয়েছে সেগুলোকে যথাযথ সম্মান করতে হয় এবং আদব বজায় রাখতে হয়। শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষক, কিতাব আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ তিন মাধ্যমের প্রতিই তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং সম্মানবোধ ছিল। তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁর উস্তাদ হযরত আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী র. এর এক টুকরা হাতের লেখা তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁর বাক্সে তা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে এ লিখাটুকু বের করে তাতে চুমু খেতেন আর অশ্রুসজল নয়নে বলতেন : "ইয়ে মেরে উস্তাদ কি লেখ্যা হায়।" কিতাবের প্রতি অসাধারণ সম্মানবোধ ছিল আল্লামা খোতানীর। তিনি কখনো চারজানু হয়ে বসে দরস দিতেন না এবং আলোচনার এক পর্যায়ে জযবা আস্‌লেও কখনো তিনি কিতাবের ওপর হাত উঠাতেন না। তাঁর জীবনের প্রতিটি চলন-বলন ছিল ছাত্রদের জন্যে শিক্ষণীয়।
অধ্যবসায় ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। এত বড় বাহরুল উলূম হয়েও রাত গভীর পর্যন্ত তিনি কিতাব মুতালাআ করতেন। কখনও কোন কারণে রাত্রে পড়াশোনা করতে না পারলে ক্লাসে গিয়ে বলতেন– "ভাই আজ নেহি পড়াউঙ্গা, কেঁউকে আজ মুতালাআ নেহি কিয়া।" অর্থাৎ ভাই আজ তোমাদের পড়াব না, যেহেতু আজ পড়াশুনা করতে পারিনি।

ছাত্রদের তিনি নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। ক্লাসে অমনোযোগী হওয়া তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। কর্মজীবনের শৃঙ্খলা বোধ, সন্তানদের প্রতি মমত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। সাধারণ মানুষকেও তিনি সম্মান করতেন। মাহফিলের সময় সাধারণ মানুষ কোন বিষয়ে জানতে গেলে তাদের কথা ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর রুমে গেলে তিনি নিজ হাতে চা

বানিয়ে খাওয়াতেন এবং মেহমানদারী করতেন। এমন মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি সত্যিই দুর্লভ। নবী আদর্শের একজন বাস্তব নমুনা ছিলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.।

ব্যাপক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সকল বিষয়ের গভীরে গিয়ে অত্যন্ত প্রামাণিকভাবে ইলমে হাদীসের খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি প্রাঞ্জলভাবে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। ফলে বেশি ক্লাশ তিনি নিতেন না। শুধু কামিল শ্রেণীতেই তাঁর ক্লাশ সীমিত থাকত। একদা ছারছীনা মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা তাজ্জাম্মুল হোসাইন খান সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন ফাযিল শ্রেণিতে খোতানী হুজুরকে একটি ক্লাশ দিবেন, যাতে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সে মতে শরহে আকায়েদ কিতাবটি পড়ানোর জন্যে আল্লামা খোতানীর নামে বরাদ্দ দেয়া হল। খোতানী হুজুর শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি মনে করলেন এতে তাঁর ইলমে হাদীসের দরসের ব্যাঘাত ঘটবে। অধ্যক্ষ মহোদয়ও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি বললেন, যেহেতু আমি রুটিন করেছি, হুজুরকে এক ঘণ্টা হলেও পড়াতে হবে ফাযিল ক্লাশে। হুজুর শুনে বললেন, “মাই এক ঘণ্টা ভি নেহি পড়াউঙ্গা, ইছ মাদরাসা মেঁ ভি নেহি পড়াউঙ্গা।” এ বলে তিনি জিনিসপত্র গুছাতে লাগলেন এবং ছারছীনা মাদরাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। রাত্রে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন এবং পরের দিন ঠিকই তিনি সামানাপত্র স্টিমার ঘাটে পাঠাতে লাগলেন। কারো সাহস হলো না হুজুরের সামনে গিয়ে কোন কিছু বলার বা তাঁর কাছে কোন অনুরোধ করার। ছাত্রদের মাঝে হাহাকার পড়ে গেল। অঝোর নয়নে ঝরছে সবার অশ্রু। স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ছাত্রদের কয়েকজন গদ্দিনশীন পীর সাহেব শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ র. এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। পীর সাহেব কেবলা দ্রুত এসে দেখলেন, ঠিকই তিনি সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছেন এবং মাল-সামানা স্টিমার ঘাটে প্রেরণ করছেন। হযরত পীর সাহেব কেবলা সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “হযরত আপ কাঁহা জাইয়ে?” বললেন, “মাঁয় চল জা রাহাহোঁ।” পীর সাহেব কেবলা মুহতারামের মন-মেজায বুঝে অত্যন্ত কৌশলে মুচকি হাসি দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, “ঠিক হায় আপ জাইয়ে, লেকিন হামারা এক আরজু হায় কে আপতো আচ্ছা বিরানি পাকাতে হেঁ। হাঁমে এক ওয়াক্ত বিরানী খিলাকার জাইয়ে। আয়েন্দা কাল আপ চল যাইয়ে। হামভি আপকি সামানা ঘাট মেঁ পৌহছা দেঙ্গে।” অর্থাৎ, ঠিক আছে আপনি চলে যাবেন। তবে আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা যে আপনি তো ভাল বিরানী পাকাতে পারেন। আমাদেরকে এক বেলা বিরানী খাইয়ে

যান। আগামীকাল আপনি চলে যাবেন। আমরাও আপনার মাল-সামানা ঘাটে পৌঁছে দেব।

পীর সাহেব কেবলা খোতানী হুজুরের পীরের সন্তান। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মুরুব্বী। তিনি পীরের মতোই সম্মান করতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, "উহে মেরা পীর ছাহেব হায়।" সামনে আসলে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। এত শিষ্টাচারিতা তিনি রক্ষা করতেন। এত রাগ হওয়ার পরও তিনি পীর ছাহেব কেবলার আরজু রক্ষা না করে পারলেন না। পীর ছাহেব কেবলা বিরানির আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। ঠিকই পরের দিন বিরানির আয়োজন করা হলো। খোতানী হুজুর নিজে বিরানী পাকালেন। হযরত পীর ছাহেব কেবলা নির্দেশ দিলেন, বিরানি খাওয়ার আয়োজন হবে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের রুমে। তিনি নিজে খোতানী হুজুরকে সাথে করে প্রিন্সিপাল হুজুরের রুমে নিয়ে গেলেন। একসাথে বসে খাবার খেলেন। খাবার শেষে সকলে গলাগলি করলেন। প্রিন্সিপাল হুজুর বললেন, আপ শরহে আকায়েদ পড়ানেকা জরুরত নেহি। কিন্তু খোতানী হুজুর এত বিনয়ী হলেন যে, হুজুর বললেন, নেহি মাঁই একদিন পড়হাওঙ্গা আওর আপকি হুকুম তামীল করুঙ্গা।" না আমি একদিন পড়াবো এবং আপনার নির্দেশ পালন করবো। কী মহত্ব! অভিমান যখন ভেঙ্গেছেন, তখন কত বিনয়ী হয়ে গেছেন। নিজে ইচ্ছা করেই অধ্যক্ষের সম্মান রক্ষা করে এক ঘণ্টা ক্লাশ নিলেন। কোন ইগো দেখালেন না।

এ মহৎ ব্যক্তির এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা থেকে আমাদের জীবন গড়ার অনেক উপকরণ রয়েছে। মনে অফুরন্ত আশা সত্ত্বেও এ জ্ঞানতাপস বাহরুল উলূমের দরসে বসার সুযোগ এ হতভাগার হয়নি। তবে তাঁর মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য এ অধমের হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর তাঁর সম্পর্কে জানার ও শুনার এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁর ইলমের পরশ পাবার নসীব হয়েছে। এতেই এ জীবনকে ধন্য মনে করি। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ স্থানে সমাসীন করুন। আমিন।

লেখক :
মুফাসসির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

আল্লামা নিয়ায মাখদূম
বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অবদান

ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান

জন্ম ও জন্মস্থান

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 'খোতান' এর সীংগাঙ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৪ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন।

সীংগাঙ-এর পূর্বনাম 'ইচলিকো' শহর। রুশীয় তুর্কিস্থানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূখণ্ডে কাশগড়ের দক্ষিণ ও পূর্বে 'খোতান' একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কি ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী এখানে বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারে আরবী ভাষা শিক্ষাদান অবশ্য করণীয়।

পরিবার ও শিক্ষা

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর পরিবার তৎকালীন খোতান ও এর আশে-পাশের অঞ্চলে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চস্থানীয় পরিবার হিসেবে খ্যাত ছিল। সমগ্র এলাকায় তাঁদের একটি সম্মানজনক পরিচিতি ছিল। খোতানী-এর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ও পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ছিলেন দেশ বিখ্যাত আলিম ও মুফতী। তাঁর আম্মা সাইয়েদা আয়িশা খানম ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আলিম বংশের মেয়ে। খোতান এলাকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ ছিলেন খোতানী র. এর মামা। তাঁর আর এক মামা ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ ইসমাঈল সিদ্দীকি। শুধু ইলম ও মর্যাদা নয়, সম্পদ ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে খোতানী র. এর পরিবার ছিল সুপ্রসিদ্ধ। রেশমী কাপড় তৈরির কারখানা ছিল তাঁদের। এখানে তৈরি রেশমী কাপড় ও সুতা ভারতে রপ্তানী করা হত।

প্রাথমিক শিক্ষা

আল্লামা খোতানীর বয়স যখন চার বছর হয় তখন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে লেখাপড়ার নতুন সবক 'হাতে খড়ি' দেয়া হয়। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর হয়, তখন তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। তাঁর এক বছর পর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা পরপারে পাড়ি জমান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন ছয় বছর বয়সে পিতৃ-মাতৃহারা হয়েছিলেন, তেমনি শিশু নিয়ায মাতা-পিতা হারা হয়ে এতিমে পরিণত হন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক জীবনে চাচা আবু তালিব যেমন তাঁকে তত্ত্বাবধান করতেন, ঠিক তেমনি খোতানীর চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসিম এতীম ভাতিজার অভিভাবক হিসেবে তত্ত্বধান করতে লাগলেন। চাচার তত্ত্বধানে শিশু নিয়ায বড় হতে থাকেন। তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় স্থানীয় 'খালাক' নামক মাদরাসায়। এখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাতৃভাষা ও ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এ মাদরাসায় তিনি কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবী সাহিত্য, ব্যকরণ ও ফারসী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা

খালাক মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর নিয়ায মাখদূম খোতানী উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগড় গমন করেন। সেখানে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অভিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। কাশগড় মাদরাসার কৃতিত্বের সাথে ৭(সাত) বছর পড়াশুনা করে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করে ১৯ (উনিশ) বছর বয়সে নিয়ায মাখদূম একজন প্রখ্যাত আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি এ মাদরাসায় প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ 'হিদায়া' সম্পূর্ণ সমাপ্ত এবং আয়ত্ব করেছিলেন।

সেনাবাহিনীতে যোগদান

আল্লামা খোতানী কাশগড়ের মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থঃ করলেন তখন তাকিয়ে দেখলেন, কমুনিস্ট হায়েনারা মুসলমানদেরকে খতম করার নেশায় উন্মাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করেছে। ইসলাম, ঈমান ও মাতৃভূমির জন্যে জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক ফুলে উঠে। তাই তিনি মুজাহিদ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। অবশেষে মেধা ও দক্ষতায় তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় খোতান ও তৎপরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের প্রচেষ্টা ও বাহিনী নিয়ে কমুনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে না পারায় সেনানায়ক নিয়ায মাখদূম সর্বপ্রথম রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরাজিত হয় মুসলিম বাহিনী। সর্বশেষ নিয়াযের বাহিনীও পর্যুদস্ত হয় কমুনিস্ট সৈন্যদের হাতে।

বাহিনীর প্রায় সকল সৈন্য শহীদ হয়। ফলে তিনি পিছু হটেন। এক আশ্চর্যজনক ঘটনা দ্বারা তাঁর জীবন রক্ষা পায়। অবশেষে তিনি দেশ থেকে ভারতের উদ্দেশে হিজরত করেন। সুদূর খোতান থেকে দুর্লঙ্ঘ হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারতের দেউবন্দে উপস্থিত হন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর ভাষায়

".... শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এসব এলাকার মুসলমানগণ হাজার বছরেরও অধিক কালের বাসভূমি ত্যাগ করে পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং আমাদের এ উপমহাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" আমাদের এ দেশে যাঁরা এসেছিলেন তাদের মধ্য থেকে দুজন বিরল প্রতিভাধর পুরুষ এ বাংলায় মনীষার ক্ষেত্রে কালজয়ী হয়েছেন। এঁদের একজন ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী। আর অপর জন হলেন আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী, তিনিও আল্লামা কাশগড়ীর দেশের মানুষ। .. তিনি মারাত্মক আহত অবস্থায় সুদীর্ঘ পার্বত্য পথ অতিক্রম করে চলে এসেছিলেন এ উপমহাদেশে।

দেওবন্দ মাদরাসায়

তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখানে সুদীর্ঘ ৬ বছর অধ্যয়নের পর তিনি ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইলমে হাদীসের পাশাপাশি চন্দ্রবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৪ ইং সনে তিনি দেওবন্দের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন।

ছারছীনায় আগমন

তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বরিশাল জেলার অন্তর্গত (বর্তমান পিরোজপুর জেলা) ছারছীনার বিশ্বখ্যাত পীর মরহুম মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. ১৯৩৮ ইং সনে ছারছীনায় কামিল হাদীস (টাইটেল) ক্লাস চালু করেন। কিন্তু তখন আইন ছিল কলিকাতার বাইরে কোন টাইটেল মাদরাসা থাকতে পারবে না। ১৯৪৪ ইং সনে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক সরকারী আইন সংশোধন করে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছারছীনা মাদরাসাকে টাইটেল মঞ্জুরী প্রদান করেন। ফলে ছারছীনায় হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে উচ্চ স্তরের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা

নেছার উদ্দীন আহমদ র. দেওবন্দ থেকে একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস আনার ব্যাপারে শেরে বাংলার সহযোগিতা কামনা করেন। মরহুম পীর সাহেব একজন মুহাদ্দিস চেয়ে দেওবন্দে চিঠি দেন। চিঠি দেওবন্দ পৌছার পর সেখানের শিক্ষকগণ সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রদের ডাকলেন, কাকে পাঠাবেন সুদূর ছারছীনায়। পরীক্ষিত বীরসেনানী আল্লামা নিয়ায মাখদূমকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তিনি তাঁর উস্তাদগণের নিকট আরও কিছু দিন গবেষণা করার আগ্রহ ব্যক্ত করলে প্রধান উস্তাদ বললেন,

تم جاؤ، تم نے جو سیکھا خود دیوبند تمہارا محتاج ہے.

তুমি যা, তুমি যা শিখেছ, স্বয়ং দেওবন্দ তোমার মুখাপেক্ষী।

সুদূর চীন-রাশিয়ার সীমান্ত দেশ খোতান হতে .. পথিমধ্যে যুদ্ধের ময়দান, দুর্গম হিমালয় ও দেওবন্দ মাদরাসা হয়ে আল্লাম খোতানী ১৯৪৫ ইং সনে ছারছীনা আগমন করেন এবং হাদীসে নববীর দরস দানের নিমিত্বে ৩০ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ছারছীনার ঐতিহ্যবাহী দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন।

হাদীস শিক্ষাদানের পদ্ধতি

তাঁর হাদীস শিক্ষাদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় ছিল। তিনি সাধারণত বুখারী শরীফ পড়াতেন। পাঠদানের সময় তাঁর নীতি ছিল শ্রেনিকক্ষে প্রবেশ করে একজনকে ইবারত পড়তে বলতেন। ইবারতের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি আরবী ব্যকরণের নিয়ম-কানুন উল্লেখ করে ভুল শুধরিয়ে দিতেন। সনদ পাঠের সময় সাহাবীর নাম শেষ হলে رضوان الله تعالى عليه اجمعين না পড়লে অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। আর قال النبى এর পরে صلى الله عليه وسلم পড়াকে তিনি অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন বিধায় ইবারত পড়ার সময় যদি কেউ তা না পড়েই মতন পড়া শুরু করত, তাহলে তিনি এত রেগে যেতেন যে, চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ হয়ে যেত। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়তেন। পাঠকারী ভুল স্বীকার করে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়ার পর তিনি শান্ত হতেন এবং আর কখনও যাতে ভুল না হয় সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিতেন। ইবারত পাঠ শেষ হলে প্রথমে তিনি সনদ বা বর্ণনাসূত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। রাবীদের জীবনেতিহাস এবং সনদের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করতেন। এরপর তিনি মতন বা মূল বাণী আলোচনা শুরু করতেন। তরজমা ও ব্যাখ্যা বলার পর কোন মাসআলা বা ঐতিহাসিক ঘটনা থাকলে, তার ওপর তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা

করতেন। এক এক মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করার সময় সিহাহ সিত্তাহসহ অসংখ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিতেন। পৃষ্ঠা নম্বর ও হাদীসের সনদসহ তা উল্লেখ করতেন। সাথে সাথে ছাত্রদেরকে কিতাব খুলে সত্যতা যাচাই করতে বলতেন। প্রতিটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপনকালে তিনি প্রথমে কুরআন, অতঃপর হাদীস, অতঃপর সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবে তাবিয়ীগণের মন্তব্য উল্লেখের পর যুক্তির অবতারণা করতেন। একটি মাযহাবের দলীল উপস্থাপন করলে মনে হতো, এটিই তাঁর সঠিক মাযহাব, এর বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। আবার যখন অন্য মাযহাবের দলীল উপস্থাপন উল্লেখ করতেন, তখন ঐ মাযহাবকেই যথাযথ মনে হতো। প্রথমে একে একে প্রতিটি মাযহাবের প্রতিটি দলীল পুনরুল্লেখ করে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে তার যথাযথ উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের দলীল খণ্ডন করতেন। অতঃপর হানাফী মাযহাবের দলীল কুরআন, হাদীস, ইমামদের মন্তব্য ও যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করে সকল মাযহাবের ওপর হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য প্রমাণ করতেন।

ইলমে হাদীসে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি

তিনি বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মরহুম মাললানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা এজায আলী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের দরসগাহের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র ছিলেন। তিনি শুধু হাদীস শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না; বরং তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ, হিকমত, আরবী সাহিত্য, নাহু, সরফ, বালাগাত এবং ইলমে হাইয়াত– সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। ধৈর্য ধরে তাঁর তাকরীর শুনলে কোন শ্রোতার মনে কোন প্রশ্নই থাকত না।

হাদীস শাস্ত্রের সনদ বা বর্ণনাসূত্র, মতন বা মূলবাণী এবং একই হাদীসের বিভিন্ন বিন্যাস পদ্ধতি ও ইমামদের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিভেদ, বর্ণনা বিন্যাস ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। হাদীস চর্চা, হাদীসের ব্যাপ্তি ও হাদীসের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর যে গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল, এর নজীর সমকালীন পৃথিবীতে বিরল। দিনের পর দিন তিনি যে কোন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর এই অতুলনীয় মনীষা ছিল মূলত আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরই একান্ত ভালোবাসার পরিপূর্ণ বিকাশ।

একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে যত গুণ থাকা দরকার, তা আল্লামা খোতানী র. এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

হাদীসের প্রতি আদব

হাদীসে দরস দানকালে তিনি সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করতেন। পাঠকক্ষে কেউ অন্য মনস্ক থাকতে পারত না। যে ব্যাপারটি ছাত্রদেরকে বিস্ময়াবিভূত করে দিত, তা হল. তিনি সুস্থ কি অসুস্থ হোন না কেন শ্রেণিকক্ষে বসে নামাযের মতো দু পা ভেঙ্গে বসতেন এবং পায়ের দুটি পাতা এক দিকে (সাধারণতঃ ডানদিকে) বের করে দিতেন। অতঃপর বামহাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে ঠেশ দিয়ে (ডান হাত দিয়ে কিভাবে ধরতেন বা টেবিল ধরতেন) বসে দরস দেয়া শুরু করতেন। এভাবে দু, তিন, চার ঘন্টা কেটে যেত, তবুও তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না।

হাদীস শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

আল্লামা খোতানী র. ১৯৪৫ ইং সন হতে ছারছীনা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৬ ইং সন পর্যন্ত একচল্লিশ বছর হাদীসের বিরামহীন খেদমত করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের বহু মাদরাসায় নির্দিষ্ট সময় হাদীসের দরস দেয়ার জন্যে এবং বুখারী শরীফের প্রথম সবক দেযার জন্যে গমন করেছেন। তাঁর হাদীসের দরস দান পদ্ধতি এমন অভিনব ছিল যে,অল্প কিছু দিন তাঁর দরসে বসলে একজন ছাত্রের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যেত যে, সে অনেক না জানা হাদীসের তত্ত্ব উদঘাটন করতে পারত।

প্রতি বছর বহু ছাত্রকে তিনি নিয়মিত দরস দিয়েছেন। আর অগণিত ছাত্র বিভিন্ন মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস ও মুদাররিস হিসেবে দরস দিয়েছেন, দিচ্ছেন। এগুলো পরিসংখ্যান করা একটি গবেষণার বিষয়। কারণ তৎকালে আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী র. ও আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান র. ছাড়া আল্লামা খোতানী র. এর ন্যায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন না। এ দু জনের ইন্তিকালের পর আল্লামা খোতানী র. বহু দিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেঁচে ছিলেন। আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী র. এবং আল্লামা আমীমুল ইহসান র. এর পর থেকে ১৯৮৬ সন ইং পর্যন্ত হাদীস শিক্ষায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে এতদঅঞ্চলে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা চিরস্মরণীয়।

আরবী ভাষার ওপরও ছিল তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ছাত্র আজ দেশের অধিকাংশ কামিল মাদরাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতার সাথে মুহাদ্দিস ও অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শীর্ষস্থানীয় আদর্শ মুহাদ্দিসের জীবন্ত প্রতীক হওয়ার কারণেই অসংখ্য মুহাদ্দিস ও অধ্যাপক তিনি তৈরি করে যেতে পেরেছেন। যাদের মধ্যে বর্তমানে এমন অনেকে আছেন, যারা তুলনাহীন গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত ও সমাদৃত।

ইন্তেকাল ও দাফন

২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং বৃহস্পতিবার তিনি পরলোকগমন করেন। পরের দিন যোহরের নামাযের পর বায়তুল মুকাররম মসজিদে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তাঁর রচনাবলি

তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বেশির ভাগ সময়ে দরস দিয়ে গেছেন। ভাষার কারণে তিনি তাঁর লেখনী যথেচ্ছা ব্যবহার করে যেতে পারেননি। কারণ আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁর মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় প্রথমে আরবী ও পরে ফারসী ভাষা স্বাভাবিকভাবে মায়ের ভাষা হিসেবে পূর্ণ আয়ত্বে এনেছিলেন। পরে ভারতে এসে প্রয়োজনের তাকিদে উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে সারাটা জীবন উর্দূ ভাষায় খেদমত করে গেছেন। ১৯৭৪ ইং সনে তিনি পবিত্র হজ্জ পালন করেছিলেন এবং বাগদাদসহ বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকবার সফরও করেছিলেন। বাংলা ভাষা তিনি মোটামুটি সবই বুঝতে ও বলতে পারতেন। আধো আধো ভাংগা ভাংগা বাংলা বলতে শুনে অনেকে অবাক হতো।

তিনি মূল উর্দূ ভাষাতে ৬ (ছয়)টি পুস্তিকা রচনা করেছেন। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত ছয়টি পৃথক পৃথক পাণ্ডুলিপি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

লেখক :

সাবেক অধ্যাপক ও ডীন, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

হাদীস বিজ্ঞানের নিরলস সাধক
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ

প্রশস্ত ললাট, গোলগাল মুখমণ্ডল, স্বল্প শশ্রুমণ্ডিত, জ্যোতির্ময় সুন্দর বলিষ্ঠ আকর্ষণীয় নয়নযুগল গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী অমর প্রতিভাধর আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর (র.) স্মৃতি আজও হৃদয় পটে পাথর খচিত নকশার মতো অংকিত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন উপমহাদেশে ইলমে হাদীস চর্চার এক নিরলস সাধক। প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসায় তিনি হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

মর্দে মুমিন, শাইখুল হাদীস, হাদীস বিজ্ঞানের নিরলস সাধক তুর্কিস্তানের বীর সিপাহী, সমাজতন্ত্রের বিভীষিকা হতে মুক্তির সংগ্রামে সেনাপতি হিসেবে জিহাদ করেছেন। অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাআলা বাংলার নিভৃত পল্লীতে এনে অর্ধশত বছর কাল হাদীস শাস্ত্রের মহান খিদমতের জন্যই সম্ভবত বাঁচিয়ে রেখেছেন। মানবতা বিধ্বংসী পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট, সন্ত্রাসী মতবাদ কমিউনিস্টদের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে তিনি তুরস্কে পাড়ি জমান। তুরস্ক হতে উপমহাদেশে এসে ভারতের দেওবন্দ হতে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান সমুদ্রের এক অতলান্তিক মহাসমুদ্র। ছিলেন হাদীস বিজ্ঞানের চলমান বিশ্বকোষ। দেওবন্দে শিক্ষা লাভের পর কিছু কাল তিনি দেওবন্দ মাদরাসায়ই অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৫ ঈসায়ী সালে শাইখুল হাদীস আল্লামা খোতানী হুজুর র. ছারছীনা জামেয়া-ই ইসলামিয়ায় হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ছারছীনা কামিল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের প্রচলিত নিয়মকে রহিত করে শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের সহযোগিতায় ছারছীনা মাদরাসা সর্ব প্রথম টাইটেল মাদরাসা হিসেবে মঞ্জুরি লাভ করে। শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, শাইখুল হাদীস হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী র. এর পরামর্শে শেরে বাংলার সহযোগিতায় ১৯৪৫ ঈসায়ী

সালের ৩০ জুন তারিখে আমাদের প্রিয় উস্তায আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ইলমে নবুওয়াতের মহান খিদমতের দায়িত্বে ছারছীনা মাদরাসায় যোগদান করেন। ১২৬০ ঈসায়ী সালে বুখারা হতে শাইখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা র. ঢাকার অদূরে সোনার গাঁয়ে এসে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য শাগরিদ ইয়াহইয়া মুনাইরি এখানে ইসলামী জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। এর প্রায় ৭ শত বছর পরে হাদীস বিজ্ঞানের সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. বৃহত্তর বরিশাল বর্তমানে পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার ছারছীনায় হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর এর পূর্ব পর্যন্ত হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞান চর্চা ও বিতরণে লিপ্ত ছিলেন।

বিস্ময়কর প্রতিভাধর নিয়ায মাখদূম খোতানী র. :

হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ১৮৯৭ সালে চীনের তুর্কিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত খোতান এলাকার সীংগাঙ এ জন্ম গ্রহণ করেন। ১২ বছর বয়সে নিয়ায মাখদূম খোতানী স্থানীয় খালাক মাদরাসায় বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাশগর মাদরাসায় তাফসীর, হাদীস, আরবী, ফারসী, নাহু, সরফ, উসূল, ফিকহ, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৯৩৩ ঈসায়ী সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। জার শাসনের অবসানের সময় তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ৫ কোটি মুসলিমসহ ২০ কোটি মানুষের রক্ত স্রোত প্রবাহিত করে বিশ্বের বর্বরতম কমিউনিজম বিপ্লবের পর তিনি দেওবন্দ আগমন করেন এবং ১৯৩৫ ঈসায়ী সালে দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে মনোবিজ্ঞানে তিনি মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে দাওরায়ে হাদীসে ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করে অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

১৯৪৪ সালে তিনি তাফসীর শাস্ত্রে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বিস্ময়কর প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৫ সালের জুন পর্যন্ত তাঁর উস্তাদদের সোহবতে দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ছারছীনার আলা হযরত পীরে কামিল শাইখ নেছার উদ্দীন র. এর পত্র ও শেরে বাংলার প্রচেষ্টায় তিনি ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার শাইখুল হাদীস পদে নিয়োজিত হন এবং আমৃত্যু নিরলসভাবে ইলমুল হাদীসের জ্ঞান সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫২টি কামিল মাদরাসায় তাঁর

অসংখ্য ছাত্র এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তাঁর ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম ছিলেন বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশে শ্রেষ্ঠতম হাদীস বিশারদ। সমকালীন সময়ে চীনের আরেক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরী ছিলেন কলকাতা সরকারী আলিয়া পরবর্তী পর্যায়ে স্থানান্তরের পর ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসার আরবী সাহিত্যের ও তাফসীর শাস্ত্রের অধ্যাপক। তারই মাধ্যমে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেব খোতানী হুজুরকে ছারছীনার নিভৃত পল্লীতে শাইখুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করেন। আমাদের মুহতারাম উস্তায আল্লামা খোতানী হুজুরের সমকালীন সময়ে বিহারের মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী হুজুর, মাওলানা আব্দুল লতিফ কুমিল্লার হুজুর ছিলেন ২য় ও ৩য় মুহাদ্দিসের দায়িত্বে নিয়োজিত। ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা আব্দুল আউয়াল, মুফতি আব্দুল করিম, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হুজুর প্রমুখ তখন কামিল শ্রেণীতে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রের নিরলস সাধক হযরত আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর মতো অধ্যবসায়ী গবেষক মুহাদ্দিস খুবই কম দেখা যায়। পূর্ব প্রস্তুতি ও অধ্যয়ন ছাড়া তিনি কখনো ক্লাসে উপস্থিত হতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর রাত পর্যন্ত তিনি রেফারেন্স গ্রন্থ সমূহের অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন। হাদীস বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। তিনি যখন ক্লাসে দরস দিতেন, তখন তার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি দেখে যেকোন ছাত্র বিস্মিত ও অবাক না হয়ে থাকতো না। তিনি একটি হাদীসের দরস প্রদান করতে অসংখ্য হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করতেন। তিনি অনর্গল হাদীসের রেফারেন্স দিতেন। কোন হাদীস গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে কোন পরিচ্ছেদে কত পৃষ্ঠায় হাদীসটি রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতেন। তখনো তোঁ কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ এমনভাবে অনর্গল বলে দিতেন যেন কম্পিউটার স্ক্রীন দেখে তিনি বলে দিচ্ছেন। শাইখ খোতানী র. হাদীসের যে দরস দিতেন যদি তা ভিডিও ক্যাসেটে বা সাধারণ ক্যাসেটে সংরক্ষণ করা হতো এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হতো তবে আজ তা হাদীস বিজ্ঞানের এক বিশ্বকোষ হয়ে যেত।

অত্যন্ত সম্মানের সাথে ফিকহি ইখতিলাফ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ইমামদের গৃহীত দলীলসমূহ তিনি একটি একটি করে তুলে ধরতেন। তিনি একজন বিচারকের মতো যুক্তি তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার যেন

শিক্ষার্থীদের বিবেকের কাছে অর্পণ করছেন। তিনি এমন উদার ও মহৎভাবে দরস প্রদান করতেন। হাদীস বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা স্মৃতি হয়ে হৃদয় পটে ভেসে উঠলে আজও অন্তরে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৪ সালের কথা, কামিল ১ম বর্ষে দারুল হাদীসে আমরা শতাধিক ছাত্র। তিনি হাদীসের দরস দিচ্ছেন। সমস্ত কক্ষে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। হাদীসের সকল ছাত্র অবাক ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর নূরানী মুখমণ্ডলের পানে তাকিয়ে আছে। তাঁর যবান মুবারক হতে অহী অবতীর্ণকালীন শিকল ধ্বনীর মতো গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে। বুখারীর “কিভাবে অহীর সূচনা হলো” পরিচ্ছেদের দরস শুরু করার পূর্বেই انما الاعمال بالنيات হাদীসটির দরস তিনি প্রদান করছেন। আজ মনে হয়, আহা! যদি তখনকার দিনে ক্যাসেট এর ব্যবস্থা থাকতো, আর যদি আমরা ক্যাসেট করে রাখতে পারতাম।! একমাত্র একটি হাদীসের ওপরই হাদীস বিজ্ঞানের এমন নিরলস মহান সাধক একাধারে দেড়মাস দরস দিয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, একটি মুহূর্ত জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা হাজার বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। ইসলাম, ইলম সাধনা ও জ্ঞান চর্চাকে ইবাদতের মধ্যে পরিগণিত করে। তাই আমাদের প্রিয় উস্তাদকে আমৃত্যু নিরলসভাবে জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকতে দেখেছি।

আল্লাহ তায়ালার রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত সকল নেক আমলের সংযোগ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১. সাদকায়ে জারিয়া
২. নেক আওলাদ, যারা তার ইন্তেকালের পর তার জন্য দোয়া করবে।
৩. আর এমন ইলম যা মৃত্যুর পর তার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

বস্তুত আমাদের প্রিয় উস্তাদ পৃথিবী বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এমন জ্ঞান সাধনার অব্যাহত প্রক্রিয়া রেখে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। নীরবে এমন অসংখ্য যোগ্যতম ছাত্র তিনি রেখে গেছেন, যা পৃথিবীর অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

১৯৪৫ সাল হতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত হাদীস বিজ্ঞানের এ নিরলস সাধক অব্যাহতভাবে ইলমে হাদীসের মহান খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এ দীর্ঘ চার দশকের মধ্যে ২৮৫৮ জন তালেবে হাদীস তার নিকট হতে হাদীসের সনদ লাভ করেন। এ মহান সাধকের নিকট হতে হাদীসের সনদ লাভ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্বে কর্মরত আছেন অনেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ড. কমরুদ্দীন, অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহেদ, ড. আলী হায়দার, প্রফেসর আব্দুল মালেক সহ অনেকেই অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। মাওলানা মুযাককিরুল বারী, মোদ্দাসের হোসাইন, মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ, ইসমাঈল জবিহ উল্লাহ, শিহাব উদ্দীন, মোরশেদ আলম, আব্দুস সাত্তার অহেদী, অধ্যাপক আখতার ফারুক, অধ্যক্ষ কাফিল উদ্দীন সরকার, কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান, মাওলানা রিয়াসাত আলী, মাওলানা মহিউদ্দীন (পাতাখালী), মাওলানা আব্দুর রশীদ সহ প্রায় তিন হাজারের মতো তার ছাত্র বাংলাদেশের সর্বত্র ইলমে নবুয়াতের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

উলূমুল হাদীসের এ নিরলস সাধক আল্লামা খোতানী ছিলেন সত্যিকার রাসূল প্রেমিক। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে তিনি হাদীসের দরস প্রদান করতেন। ক্লাসে হাদীসের দরস প্রদানের জন্য রেফারেন্স গ্রন্থ অধ্যয়নে নৈশ ভোজ ও ইশার সালাত আদায়ের পর কোন কোন সময় ফজরের আজান পর্যন্ত তন্ময় হয়ে অধ্যয়নে রত থাকতেন।

উলূমুল হাদীসের এ নিরলস সাধক আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. বহু কামিল মাদরাসার বুখারী সবক ও খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে যোগদান করে সবক দান ও দোয়া পরিচালনা করেছেন। তিনি জাতীয় ঈদগাহে খতীবের মর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ মহান সাধকের ৭টি কন্যা সন্তান রয়েছে। কোন পুত্র সন্তান নেই। হযরত আল্লামা খোতানী হুজুর র. ১৪০৭ হিজরীর ২৪ রজব মোতাবেক ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর বুধবার অগণিত ভক্ত অনুরক্ত ও ছাত্রদেরকে শেষ শোক সাগরে ভাসিয়ে ইন্তেকাল করেন।

লেখক :
অধ্যাপক ও সাবেক উপাধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

উপমহাদেশে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর
হিজরতের প্রেক্ষাপট ও আজকের মুসলিম বিশ্ব

ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহইয়ার রহমান

সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. একটি নাম, একটি ইতিহাস। যিনি বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিশেষত ইলমে হাদীস প্রসারের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। সম্ভবত ১৯১৭ইং সনের কিছু পূর্বে মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

সীংগাঙ এর পূর্ব নাম ইচলি কোঁ শহর। রুশীয় তুর্কিস্তানের উজবেকিস্তান ও তাজাকিস্তানের সীমান্তে চীনের ভূখণ্ডে কাশগরের দক্ষিণ-পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের উর্ধ্বে ও কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে তারিম নদীর অববাহিকায় খোতান একটি সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কী ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী এখানে বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আরবী ভাষা শিক্ষাদান অবশ্য করণীয় ছিল।

আল্লামা খোতানী র. এর পরিবারের সদস্যরা আরবী ভাষায় কথা-বার্তা বলতেন। তিনি স্বীয় গ্রামে 'খালাক' মাদরাসায় ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং পরে কাশগরে আরো ৭ বছর অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। 'হিদায়া' এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ তিনি তাঁর নিজ এলাকায় কোন শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন।

হিজরতের প্রেক্ষাপট:

আল্লামা খোতানী র. যখন ছাত্র, তখন সকল যুবক ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নেয়ার প্রচলন ছিল, যেন মাতৃভূমির সেবায় তারা প্রয়োজনে অবদান রাখতে পারেন। সে হিসেবে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন, তখন দেখলেন কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় হতে চলেছে। কমিউনিস্ট হায়েনারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করছে, মসজিদ-মাদরাসা ভেঙ্গে চুরমার করছে, তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক তাঁকে সেনা বাহিনীতে যোগদান করতে

হয়েছিল। নিয়ম ছিল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, ইচ্ছা করলে কেউ সেনাবাহিনীতে থাকতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে কেউ কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারবে। মেধা ও দক্ষতায় আল্লামা খোতানী র. অল্প দিনের মধ্যেই সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রাথমিক যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি কর্মজীবনে ফিরে আসতে চাইলেন, কিন্তু তাকে আসতে দেয়া হলো না। বাধ্য হয়ে তিনি তার সকল সাধনা মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করলেন। অল্প দিনের মধ্যে স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের বলে সেনাপতির আসন লাভ করেন। চীনের তীব্বতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রায় মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল তুর্কিস্থান তখন কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আর উপজাতীয় সর্দার শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তখন বলতে বিশ শতকের প্রথম ভাগ। কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তীব্র গতিতে। শত্রুরা একের পর এক এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসক আমীররা তখন নিজেদের মধ্যে আত্ম-কলহে লিপ্ত। সুযোগ বুঝে শত্রুরা এক পক্ষ অবলম্বন করে অন্য পক্ষকে ঘায়েল করে যাচ্ছে। আর আমীররা নাস্তিক্যবাদী ধোঁকাবাজদের ছলনায় পড়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তখনকার রাশিয়ার জার শাসনের অবসান ঘটাতে পারলে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে, তাদের ধর্মের ওপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবেনা। তাদের সে ওয়াদা কতটুকু রক্ষিত হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে; যেমনটি হয়েছিল স্পেনের ধ্বংসের সময় মুসলমানদের করুণ পরিণতি। পাঁচ কোটি মুসলমানের লাশের ওপর কায়েম হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।

আল্লামা খোতানী র. যে রাজ্যের সেনাপতি, একদিন কমিউনিস্ট বর্গিরা সে রাজ্যে হানা দিল। লড়াই চলল মাসের পর মাস। কয়েকটি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে প্রধান দুর্গে যখন অবস্থান করছিলেন, তখন বাড়ী থেকে খবর পেলেন তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। জীবনের প্রথম সন্তান। ছুটি নিলেন বাড়ী যাওয়ার জন্য, কিন্তু ছুটি বাতিল হলো। কারণ, কমিউনিস্ট বাহিনী পংগপালের মত ধেয়ে আসছে সংবাদ এলো। মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলেন। দীর্ঘ এক মাস চলল অবরোধ। এর মধ্যে বাইরের কোন সাহায্যও আসলোনা। এ দিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে রসদও প্রায় শেষ। ইতোমধ্যে শত্রুরা দুর্গের বহির্দেয়াল ঘেষে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। শিলা ঝড়ের মত বুলেটের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একে একে ধ্বসে পড়ছে দুর্গের দেয়াল। বুলেটবিদ্ধ হয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করছেন সাথী মুজাহিদরা। পাশের সহকারী সৈন্যরা বুলেটবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। শত্রু এগিয়ে

আসছে, আর সময় নেই। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে আল্লামা খোতানী তিন তলার ওপর থেকে ঝাঁপ দিলেন নিচে। দেখে ফেলেছে দুশমন। তাই গুলি করছে এ দিকে তাক করে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এদিকটা ফাঁকা ছিল, সামনের দিকে দৌড়ে চললেন। অলৌকিকভাবে একটি তাজী ঘোড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় সামনে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে সোয়ার হলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে। পেছনের দিকে আর তাকালেন না। সামনে চলতে লাগলেন। দীর্ঘ দুদিন দুরাত্রি অবিরাম চলার পর এক নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। ভীষণ পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে ঘোড়াটি মারা যায়। তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাতরে নদী পার হলেন। এ পারে এসে তিনি কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। নদীর অপর তীরের সেই অঞ্চলটি চীনের একটি অঞ্চল ছিল।

ঐ অঞ্চলটি তখনও কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে আসেনি। আল্লামা খোতানী র. মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হলেন, যেভাবেই হোক মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে হবে। তাঁর খুব আগ্রহ ছিল 'সার্জারী' বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া। কারণ, তিনি দেখেছেন, যুদ্ধের মধ্যে আহতদের শুশ্রূষা করার সময় সার্জারীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সে সুযোগ না হওয়ায় সেখানে সাধারণ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলেন। প্রয়োজনে জার্মান বা ইংল্যান্ড গিয়ে উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন, এ আশাই ছিল তাঁর। কিন্তু ঐ অঞ্চলটি যদিও কমিউনিস্ট শাসনের আওতায় ছিলনা, তবুও ঐ অঞ্চলের শাসকগণ কমিউনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। অসংখ্য ইসলাম বিরোধী কুপ্রথার অনুসারী ছিল তারা। এমনকি যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হতো, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি সামনে পেশ করা হত, সৈন্যদেরকে সেই প্রতিকৃতিতে কখনো বা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানকে মাথা নত করে কুর্নিশ করতে হত। আল্লামা খোতানী র. ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন, তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাকে বলা হয়েছিল,

اگر تم یہ نہ کروگے تو تمکو ٹکرا ٹکرا کرکے چوڑا جائے گا

"তুমি যদি এটা না কর, তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে।"

তিনি জবাবে বলেছিলেন,

اگر مجھے ٹکرا ٹکرا کیا جائے تب بھی یہ مجھ سے ممکن نہ ہوگا

"যদি আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়, তবুও আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবেনা।"

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি একমত না হতে পেরে ঈমানকে মূল্যবান মনে করে বাধ্য হয়ে ঐ সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিয়ে তিনি দুর্লঙ্ঘ হিমালয়ের পথ অতিক্রম করে

ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় গিয়ে উপস্থিত হন। এমনিভাবে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হওয়ার মুহূর্তটিতে মধ্য এশিয়ার উজবেক ও তুর্কমেন মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এসব এলাকার মুসলমানগণ হাজার বছরেরও অধিককালের বাসভূমি ত্যাগ করে পারস্য, আফগানিস্তান, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের এ উপমহাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর এটাই ছিল আল্লামা খোতানী র. এর উপমহাদেশে হিজরতের প্রেক্ষাপট।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত মক্কা-মদীনায় এমন বহু লোক দেখা যায় যাদের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাঁরা বুখারা সমরকন্দ থেকে আগত এবং স্থায়ীভাবে বসবাসরত। ঐ সময় বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশে যারা আগমন করেছিলেন, তাদের মধ্যে আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরী র. এবং আল্লামা খোতানী র. উল্লেখযোগ্য। আল্লামা কাশগরী র. বলেছিলেন, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় আমাদের এলাকার বয়স্করা যুবকদেরকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, এমনিভাবে আমাকে যখন হিজরত করার জন্য বিদায় দেয়া হয়, তখন আমার গোত্রের সকলেই সম্মিলিতভাবে উপস্থিত ছিলেন। আমার কাফেলার সাথীদের মধ্যে পথের কষ্ট, ক্ষুধা, অনাহার ও অসুখে পথে বারো আনা লোক মারা যায়।"

আজকের মুসলিম বিশ্ব :

তখন বুখারা সমরকন্দে যা ঘটেছিল তা আজ বসনিয়াতে ঘটছে। হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দিতে লোম শিউরে উঠে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে কেবলমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমান ও ইসলামের দুশমন, তারা আজও একইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে, মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকানরা রক্তের হোলিখেলা খেলে যাচ্ছে, সামান্য একটি প্লেন দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিবিয়ার মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে পংগু করে ফেলেছে। ইরাকের মত একটি শক্তিশালী দেশকে ধ্বংস করে ফেলেছে। সর্বোপরি মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পূর্বের মত একই অবস্থায় আছে, কোন পরিবর্তন হয়নি।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে অবাক লাগে। ও.আই.সি নামেমাত্র কাজ করছে, সফলভাবে শত্রুদের দমন করতে পারছেনা। য়াহুদ-যারা মুসলিমদের শত্রু, আজ তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির পায়তারা চলছে, য়াহুদীদের যে যত সন্তুষ্ট করতে পারবে, সে ততই ভাল। আরবলীগ নামেমাত্র আছে। মিশর য়াহুদীদের

ক্রীড়নক। আলজেরিয়া, কাশ্মীর এর দিকে তাকিয়ে দেখুন, মুসলিমদেরকে কিভাবে পাইকারী হত্যা করা হচ্ছে। বাবরী মসজিদ বলতে গেলে ভারত সরকারই ধ্বংস করেছে, তারপর ঘোষণা দিয়েছে, এখানে পূর্বের মত মসজিদ তৈরী করা হবে। আবার এখন শুনছি, সেখানে মন্দির করার জন্য ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

আমরাও বা কতটুকু নিরাপদে আছি? বুখারা সমরকন্দ থেকে যারা হিজরত করে এসেছিলেন, তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা? আমাদের তিন দিকে শত্রু বেষ্টিত, আমরা যদি সজাগ না হই, তাহলে আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাপ দেয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবেনা। অবশ্য তখনকার বুখারা সমরকন্দ এখন আর একই অবস্থায় নেই। তবে বহু ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে মুসলমানরা জেগে উঠেছে। রাশিয়ায় ছয়টি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও ২/১টি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ভিন্ন হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি হচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। তাই আমাদের জন্য করণীয়:

১. মুসলিম দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য চিন্তাভাবনা করা। আর এজন্য প্রয়োজন অস্ত্র, প্রয়োজন অর্থ।
২. আর করণীয় হলো, সকলের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৩. ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসাই একমাত্র কামিল (টাইটেল) মাদরাসা ছিল। ছারছীনার পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ র. ১৯৩৮ ইং সনে ছারছীনাতে ২য় কামিল (টাইটেল) মাদরাসা উদ্বোধন করলেন। একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সংগ্রহে তিনি শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের সহযোগিতা কামনা করলেন। শেরে বাংলার সহযোগিতায় দেওবন্দ মাদরাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী মুহাদ্দিস আল্লামা খোতানী র. কে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে খোতানী র. আরও ইলম শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করে আসতে চাইলেন না। তখন দেওবন্দের শায়খুল হাদীস খোতানী হুজুরকে বলেছিলেন,

دیکھو بھائ تم نے جو علم سیکھا وہ کافی ھے. اللہ تبارك وتعالی نے تم
میں جو علم عطاء فرمایا خود دیوبند بھی تمہارا محتاج ہے.

"দেখ ভাই! তুমি যে ইলম শিক্ষা লাভ করেছ তা যথেষ্ট, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে ইলম দান করেছেন, স্বয়ং দেওবন্দ তোমার মুখাপেক্ষী।"

এরপর খোতানী র. ১৯৪৫ ইং সনে ছারছীনায় আসেন। ১৯৮৬ ইং সনে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎছর তিনি ছারছীনাতেই ইলমে হাদীসের খেদমত করে গেছেন। খোতানী হুজুর র. বলতেন,

میں علم حدیث کی بنسبت منطق فلسفہ اور علم ہیئت زیادہ پڑھا، لیکن اللہ تعالی کا منظور میرے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں غزر گئے.

"আমি ইলমে হাদীসের তুলনায় যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র এবং জোতির্বিদ্যা বেশি পড়াশুনা করেছি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আমার সারাটা জীবন হাদীসের খিদমতে ব্যয় হয়েছে।"

তিনি এমনভাবে হাদীসের দরস (শিক্ষা) দিতেন, বুখারী শরীফের ২/৩ পারা তাঁর কাছে যারা পড়তে পারতে গোটা বুখারী শরীফ বুঝবার যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হত। তিনি উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন. তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর স্বহস্ত লিখিত ৮টি পাণ্ডুলিপি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আরবী ভাষা, সিহাহ সিত্তা এবং দর্শনের ওপর বিষয় ভিত্তিক লিখিত এ পাণ্ডুলিপিগুলো নতুন নতুন তথ্যে ভরপুর। সেগুলো প্রকাশ করতে পারলে সমাজ খুবই উপকৃত হবে।

উপসংহার :

আল্লামা খোতানী র. যেভাবে গোটা জীবনকে ইসলামের খেদমতে ব্যয় করে গেছেন, তাঁর জীবন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে প্রত্যেককে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণের জন্য অবদান রাখা উচিৎ। এজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিৎ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি যে ত্যাগ-তিতীক্ষার জ্বলন্ত নজীর তাঁর বাস্তব জীবনে দেখিয়ে গেছেন, এমনকি নিজের জন্মভূমি থেকে হিজরত পর্যন্ত করেছেন, পার্থিব কোন স্বার্থ তাঁকে তাঁর অবিচল আদর্শ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এর এই ক্রান্তিলগ্নে আল্লামা খোতানী র. এর জীবনাদর্শ থেকে দিকহারা এ জাতি পেতে পারে কাঙ্খিত দিক নির্দেশনা; যার ফলশ্রুতিতে তৈরী হবে অকুতোভয় এমন বীর মুজাহিদ, যারা জালিমের খড়গহস্ত ও অত্যাচারীর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েও নির্ভিকভাবে সত্যের মশাল ও দ্বীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করবে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমীন!

লেখক :
সাবেক ডীন ও অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

স্মৃতির পাতায় আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

ড.মুহাম্মদ মাসউদ আল মাহদী

এক.

১৯৮৬ সাল– সঠিক দিনক্ষণ বা তারিখ এখন মনে নেই, তবে মাসটি যে ছিল জানুয়ারী তা স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে। এই মাসটিতে আমার পিত্রালয় যশোর থেকে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে পিরোজপুর জেলায় অবস্থিত পূণ্যভূমি ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার উদ্দেশে আগমন করি। পারিবারিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় এলেম অর্জনের নিমিত্ত আমাদের পরিবারের অনেককেই নিজ এলাকা ছেড়ে সুদূরে অবস্থিত সনামধন্য বিদ্যাপিঠে গমন করতে হয়েছে। আমার পিতামহের দুই পুত্রের বড় পুত্র – যিনি আমার বড় চাচা, তাকে ইলম অর্জনের জন্য বাল্যকালেই দেওবন্দ ও চাহরানপুরে পাঠানো হয়েছিল। আমার পিতা মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ নিজামউদ্দীন, তিনিও বাল্যকালেই তদানীন্তন ছারছীনা গমন করেন এবং সেখান থেকেই লেখাপড়া করে কামেল পাশ করেন। তাঁর দু'পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম, কামিল অধ্যয়নের জন্যে ছারছীনাতে গমন করেন। ইলম অর্জনের জন্য এই ধারাবাহিকতায় আমাকেও বাল্যজীবনে (১৯৮৬ সালের জানুয়ারীতে) পূণ্যভূমি ছারছীনা মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়। কৈশোরে ছারছীনার অনেক কিছুই আমাকে অভিভূত করত যার মধ্যে উল্লেখ্য – মাদরাসার বিশাল বড় আঙ্গিনা (যার ব্যাপ্তি ছিল প্রায় অর্ধ মাইল), বৃহৎ হোস্টেল, শ্রেণীকক্ষ, চিকিৎসাকেন্দ্র, দীঘি,দরবার শরীফের বিশাল বড় মাঠ (মাহফিলের সময় যেখানে প্রায় ১/২ লাখ মানুষের সমাগম হত), পার্শ্ববর্তী অনেক প্রশস্ত সন্ধ্যা নদী, অগাধ পাণ্ডিত্য ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিক্ষকমণ্ডলি ইত্যাদি আরো অনেক অব্যক্ত বিষয়, যা আমার মাঝে বিস্ময়ের উদ্রেগ করত। তবে এত কিছুর মাঝে প্রশস্ত বক্ষ ও ললাট, বিস্তৃত চোয়াল বিশিষ্ট, গৌরবর্ণের বিরাট এক সৌম্য চেহারার জ্যোতির্ময় ব্যক্তি-আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছিলেন আমার কাছে সবচে চিত্তাকর্ষক। মাদরাসার সবাই তাকে চিনা হুজুর বলে ডাকতাম । বারবার আমি এই মহান ব্যক্তিকে অবলোকন করার চেষ্টা করতাম আর বিস্ময়ে অভিভূত হতাম । আমার এই স্মৃতি এখনো মনের মুকুরে সদা জাগরূক । ছ' ফুটের বেশী দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণের অধিকারী এই উস্তাদ বহু সংখ্যক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলির মাঝে ছিলেন ব্যতিক্রম। সুযোগ পেলেই এই পরমশ্রদ্ধেয় উস্তাদকে দেখার জন্যে আমার অনুসন্ধিৎসু কিশোর মনটি বারবার তাকে খুজেঁ ফিরত। কোন

সময় মাঠে হাটতে বের হলে, ক্লাসে গেলে অথবা নামাযে গমন করলে আমার ন্যায় বহু বালক তাকে একনজর দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকত।

দুই.

ছারছীনা মাদরাসার অনেক উস্তাদের উস্তাদ আল্লামা খোতানী র. শুধু কামিল ক্লাসেই দরস দিতেন। সে কারণেই, আমি এবং আমার আরও অগ্রজ, যারা কামিলের নিচের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন, তারা কেবল আমাদের কামিল ক্লাসের বড়ভাই এবং অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট থেকে খোতানী র. সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা শুনতাম । তবে আমার অগ্রজ, একমাত্র সহোদর, মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম এবং তাঁর সহপাঠীদের রুম অবাধে যাতায়াতের সুযোগে খোতানী হুজুরকে র. একটু বেশী দেখার এবং তাঁর সম্পর্কে সে সময় একটু বেশী জানার সৌভাগ্য হয়েছিল । তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দুঃসাহসিক গল্প শুনতাম। পরবর্তীতে তাঁর ওপর প্রামাণ্য কিছু লেখা থেকেও আরোও বেশী জানতে পারি এবং অনুভব করতে পারি তিনি মহান আদর্শের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা খোতানী র. চীন দেশের পশ্চিম সীমান্তের সিঙকিয়াং প্রদেশের খোতান অঞ্চলে ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বলশেভী আন্দোলনের মোকাবেলায় তিনি অকুতোভয় একজন সেনানায়ক হিসেবে আল্লাহর দ্বীন হেফাজতের উদ্যেশে লড়াই করেন । কিন্তু মুসলমানদের অন্তর্কলহ এবং কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যখন তিনি অনুভব করলেন বলশেভীদের ঠেকানো সম্ভব নয়, তখন পরিবার পরিজন ত্যাগ করে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে তিনি চলে আসেন ভারতের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদরাসায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেন। অত:পর যখন শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯৪২ সালে ছারছীনা মাদরাসায় প্রথম টাইটেল খোলা হয়। পীর নেছারুদ্দীন র. ১৯৪৫ সালে দেওবন্দ থেকে আল্লামা খোতানী (রঃ) কে ছারছীনাতে নিয়ে আসেন এবং প্রধান মুহাদ্দিস পদে তাকে নিয়োগ দেন। আমৃত্যু তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকেই নিরলসভাবে ঐকান্তিকতা সহকারে ইলমে হাদীসের খেদমত করে গেছেন। খোতানী হুজুর র. ছারছীনার আবু বকর হলের ২য় তলায় একটি রুমে কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তেমনি ছিলেন চরিত্র মাধুর্যে অনুপম। তাকে দেখেছি রুচিশীল পোশাকধারী সৌম্য চেহারার মানুষ হিসেবে। দেখেছি তিনি একজন মোখলেছ, অমায়িক, নিষ্ঠাবান,

নির্লোভ, নিরহংকারী সদালাপী মানুষ। আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় । নিজ হাতে বাজার করতেন। তিনি সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাঁর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ তায়ালার রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবীগণের কথা মনে পড়ত। দীর্ঘ ৪১ বছর হাদীসের জ্ঞান সাধনা এবং তাঁর বাস্তব প্রয়োগে তাঁর জীবনটাই হয়ে উঠেছিল হাদীসের আলোকে আলোকিত। আল্লামা খোতানী র. এর একজন খাদেম ছিলেন– একটু স্থূল প্রকৃতির। তাঁর মাঝে যে শিশুসুলভ সরলতা আমি সে সময় লক্ষ করেছি, তাতে রাসূলের সময় কালের মানুষের কথা মনে পড়ে। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, খোতানী র. এর নিকট থেকে সরাসরি দরস নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে সে সময়ে তাঁর দরসে যারা বসতেন, তাদের কাছ থেকেই তাঁর দরস সম্পর্কে তৎকলীন তাজা খবর আমি প্রায়ই পেতাম । আমার সহোদর ভ্রাতা এবং তাঁর সহপাঠীগণ তাঁর দরস সম্পর্কে যে আলোচনা করতেন, তাতে বুঝতাম তিনি একজন বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি একই সাথে কুরান, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, কালাম, সীরাত, আদব, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সমরবিজ্ঞান ও সম সাময়িক বিশ্ব ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তৎকালীন যুগে তথ্য প্রবাহের ধারনা রাখতে তিনি উন্নতমানের রেডিওর সংবাদও নিয়মিত শ্রবণ করতেন। তবে হাদীস শাস্ত্রের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য সমকালীন সময়ের সেরা বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রচণ্ড অসুস্থতা উপেক্ষা করেও তিনি ছাত্রদের হাদীসের দরস দিয়ে গেছেন। হাদীসের খেদমতই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। অতঃপর, ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর, এই মহান শাইখুল হাদীস পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

তিন.

আল্লামা খোতানী হুজুর র. নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ । তাঁর জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দশায় পরিপূর্ণ। আর সেই জীবনের শুরু সিঙকিয়াং প্রদেশের খোতান অঞ্চলে এবং হাজারও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতের দেওবন্দ হয়ে অতঃপর তাঁর সমাপ্তি ঘটে বাংলার মাটিতে। এত সমস্যা সংকুলের মাঝেও একচুল পরিমাণ তিনি দ্বীনী জীবন থেকে বিচ্যুত হননি। পর্বতের ন্যায় শরীয়াহ ও সুন্নাতের ওপর অটল ছিলেন। বাংলাদেশের দ্বীনী খেদমতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও, দুনিয়াকে তিনি উপেক্ষা করেননি। রাসূলের সুন্নাত পালনার্থে তিনি বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ৭

কন্যা সন্তানের জনক । তৎকালীন সময়ে দ্বীনী শিক্ষার চূড়ান্ত পর্ব টাইটেল মাদরাসা একমাত্র ছারছীনা হওয়ায়, উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাদানে তাকে সদা ব্যস্ত থাকতে হত। সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনে বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে তেমন সময় দেবার সুযোগ তাঁর ছিলনা এবং এটিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেননি । কিন্তু তাঁর পরিবারের প্রতি ছিল আল্লাহর অসীম রহমত । তাঁর ইন্তেকালের পর সেই পরিবার কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকার মুহাম্মদপুরের নিজস্ব জায়গায় ৪ তলা বাড়িতে বসবাস শুরু করেন । তাঁর অগণিত রূহানী সন্তান তাঁর জন্য ছিল সদা ব্যাকুল। তবে বিশেষভাবে যারা তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছারছীনা মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস, তাঁরই স্নেহভাজন ছাত্র জনাব মাওলানা আ.ম.ম.আহমাদুল্লাহ, যার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লামা নিয়ায মাখদূম সেবক সমিতি। তবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যিনি এই সমিতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন বর্তমান দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল জনাব মাওলানা আ.খ.ম.আবু বকর সিদ্দীক । হুজুরের ইন্তিকালের কিছুদিন পরই ছারছীনা মাদরাসার পড়াশুনা শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেবক সমিতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯০ সালে একঝাঁক তরুণকে নিয়ে আল্লামা নিয়ায মাখদূম রিসার্চ একাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। ত্যাগ ও নিরন্তর পরিশ্রমের ফলেই, হুজুরের পরিবারবর্গের জন্য বাসভবন নির্মাণ, তাঁর নামে বিভিন্ন সেমিনার ও একাডেমি ভবন নির্মাণ সহ বহু স্মৃতি এখনোও আমাদের মাঝে অম্লান হয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা এই মহান ওলীর মর্যাদাকে বুলন্দ করতে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে তাঁর অফুরন্ত যাযাহ্ যেন প্রদান করেন – এটাই মাওলায়ে হাকীমের দরবারে আকুল প্রার্থনা ।

চার .

আমার ন্যায় সামান্য একজন ব্যক্তির পক্ষে, আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. – এর স্মৃতি রোমন্থন করে কিছু লেখা অনেকটাই দুঃসাহসিক কর্মও বটে। কারণ, তাঁর ছাত্রগণ বা ছাত্রের ছাত্রগণ পৃথিবী ব্যাপী কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে অনেক বড় বড় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন । তবে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুরকে র. ছারছীনাতে আমি সামান্য কিছুদিন পেলেও, এখনও পর্যন্ত তাঁর রূহানী সত্তার সাথে কেমন যেন একটি অদৃশ্য সুতাঁর টান অনুভব করি। কারণ, আমার মরহুম

শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ নিজামউদ্দীন, ছারছীনাতে বাল্য জীবন থেকে শুরু করে টাইটেল পড়া অবধি, তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন । আমার একমাত্র অগ্রজও তাঁর কাছে সরাসরি কামিল ক্লাসে দরস নিয়েছেন। আর আমি ছারছীনাতে তাকে যেমনভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তেমনিভাবে পরবর্তীতে আল ফালাহ রিলেসন সমিতির ও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ একাডেমীর একজন সদস্য হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করি। মানুষ মরণশীল; সে কারণে আজ পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিলেও, তাঁর মর্যাদা ও স্মৃতি অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে ভাস্বর ও হিরণ্ময় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, যা আমার হৃদয়েও প্রদীপ্ত । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন । সেই সাথে দীনের উপর অটল রেখে মাওলায়ে হাকীম তাঁর আল আওলাদ ও আমাদেরকেও ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে নাজাত দান করুন। আমীন।

লেখক :
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

কুড়ানো মাণিক হারিয়ে গেল

এ.বি.এম. ছাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নায় বিজড়িত প্রকৃতি কাউকে হাসায়, আবার কাউকে কাঁদায়, কাউকে নিয়ে যায় অন্যকে শোকের গহীন সাগরে নিমজ্জিত রেখে। নিষ্ঠুর নির্মম ও হৃদয়হীন পৃথিবী তার অমোঘ বিধান থেকে আমাদের খোতানী হুজুরকে পরিত্রাণ দেয়নি। প্রকৃতি নিয়ে গেছে তাঁকে শত-সহস্র মানুষকে তপ্ত হৃদয়ের অশ্রুজলে সিক্ত করে, বেদনার অথৈ পাথারে নিমজ্জিত করে, আকাশ ফাটা করুণ কান্নায় মাতাল বানিয়ে। এমনকি তার মৃত্যুতে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস, পাখির কলকাকলি নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ অন্যতম মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দার্শনিক, তর্কবিদ, যুক্তিবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি ছিলেন দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ মহান আদর্শের মুর্ত প্রতীক ও সাহাবা চরিত্রের অধিকারী।

তার কিংবদন্তীময় জীবনেতিহাস ছিল অত্যন্ত ট্রাজেডিমূলক ও দুঃখময়। বহুবার বহুজনে তাঁকে তাঁর জীবন বৃত্যান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু তিনি বর্ণনার কতটুকু গিয়ে নিজ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলতেন। তবে যেটুকু আমরা জানতে পারি– তিনি মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ ও খোতান সীমান্তবর্তী এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে রক্ষাকল্পে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন। এতে তিনি বেশিদিন সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। কেনইবা পারবেন! বিশ্বনিয়ন্তা যাকে নিজ আশীষ ধারায় বেছে নিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি তার প্রিয় হাবীবের অমৃতবাণী উজ্জীবিত করবেন, যিনি হবেন শাইখুল হাদীস, যিনি হবেন অমর ইতিহাসের চির স্মরণীয় মানব, যিনি হবেন শত মানুষের আলোকবর্তিকা, যিনি অশ্রুজলে সিক্ত করাবেন পূর্ব বাংলার মাটি, তার কর মোবারকে কি শোভা পায় সাধারণ সৈনিকের সাধারণ তরবারি? তাই বিধাতার অদৃশ্য ইঙ্গিতে সত্যের মহান আদর্শকে উজ্জীবিত করে তদানিন্তন কমিউনিস্ট সরকারের আইনকে পদাঘাত করে সদ্য প্রসূত নবজাতক শিশুর এক নজর দর্শন লাভ না পাওয়ার গভীর দুঃখ-বেদনা নিয়ে পরিবার-পরিজনের বিরহ বিচ্ছেদের করুণ আর্তনাদ জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বদেশ ত্যাগের অনুতপ্ত হৃদয়ের চাপা কান্নাকে উপেক্ষা করে বহু বাধা বিপত্তি মরু কান্তার গিরি দুস্তর পেরিয়ে উপনীত হয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষে। বিধাতার

উদ্দেশ্য এবার সফল হতে যাচ্ছে। তাই তিনি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে হাদীসশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু তার দূরপাল্লার যাত্রা এখনো থামেনি, এখনো ক্ষান্ত হয়নি। সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা ও নীলিমাময়ী পূর্ব বাংলার মাটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ডাকছে তার বুককে ঐ মহা মানব দ্বারা ধন্য করতে। এ ডাক তিনি এড়াতে পারেননি। আর কোনদিন পারবেনও না। তাঁকে তো মধুর আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে পূর্ব-বাংলার সেই মাটিই, যে মাটি বহুদিনের শুন্যতা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল এ মহা মানবের।

যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল ছারছীনার পীরে মরহুম তাঁকে কুঁড়িয়ে এনেছিলেন পূর্ব বাংলার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে। তাঁর এই সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাধিক বৎসরের ইতিহাস কত অলৌকিক ঘটনার সাথে যে জড়িত, তা আমার এ ক্ষুদ্র মসি প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। বহু আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে দিন গুণছিলাম এইতো আর একটি বছর পার হলেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো। পারবো তাঁর মধু ঝরা কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনতে। কিন্তু মাঝে আজরাঈল এসে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভেঙ্গে দিয়েছে আমাদের সকল স্বপ্ন-সাধকে।

২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং বুধবার রাত্র ১১টার দিকে টেবিলে বসে পড়ছি। হঠাৎ সংবাদ ভেসে আসল খোঁতানী হুজুর ইহজগতে আর বেঁচে নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই মনে হল। সাথে সাথে দৌড়ে গেলাম মাদারীপুরী হুজুর ও সাতক্ষীরা হুজুরের কামরায়। তাঁদের চাপা কান্নায় অস্থির হয়ে উঠলাম। ডাবল ওয়ার্নিং বাজানো হল। পঙ্গপালের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে সকল ছাত্র মসজিদে একত্রিত হল। কুরআন খানি, দুআ ও মুনাজাত করা হল তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে। ছাত্র-শিক্ষকের কান্নার করুণ আর্তনাদে মনে হয়েছিল যেন নিথর নিস্তব্ধ রজনীর সমস্ত প্রাণী ঘুম ভেঙ্গে গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছে। মনকে সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। শেষবারের জন্যে হুজুরের বেহেশতি চেহারা দর্শনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। তাই রাতের তিমির ভেদ করে বাঁধনহারা পাখির ন্যায় ছুটে চললাম আমরা কয়েকজন ছাত্রভাই হুজুরের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে। কিন্তু ঢাকার বায়তুল মুকাররম উপস্থিত হয়েই শুনতে পেলাম, এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে মরহুমের জানাযা হয়ে গিয়েছে। আবেগ উদ্বেলিত হৃদয়ের চাপা কান্নাকে প্রশমিত করে উপস্থিত হলাম আজিমপুর

গোরস্তানে। দাঁড়ালাম গিয়ে হুজুরের শির মুবারকের কাছে। যিয়ারত করলাম তাঁর মাযার। মনে হল যেন শান্তির অমীয় সুধা আমার হৃদয় মনকে শীতল করে দিয়েছে। সালামের প্রতিউত্তর নিয়ে ফিরে আসলাম গন্তব্যস্থানে।

আমার সাথে হুজুরের দীর্ঘ সাত বছর সম্পর্কের মাঝে আমি তাঁকে পেয়েছি আচার ব্যবহারে মহান আদর্শের মহা মানব হিসেবে, মধুঝরা অমীয় বাণীর ধারক ও বাহক হিসেবে। এক দিকে তিনি যেমন ছিলেন উমর চরিত্রের অধিকারী, অপরদিকে তেমনি ছিলেন আবুবকর চরিত্রেরও অধিকারী। আর এ কারণেই তিনি গভীর শোকে শোকাতুর বানিয়ে গেছেন পূর্ব বাংলার প্রতিটি গুণগ্রাহীকে, প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষককে, এমনকি প্রতিটি সাধারণ মানুষকে।

উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক এই মহা মানবের স্থান আর পূর্ণ হবে না। হতে পারে না। যে কুঁড়ানো মাণিক একবার হারিয়ে গেছে, তাকে আর পাওয়ার আশা করা যেতে পারে না। তিনি যেন রোজ হাশরে তাঁরই ছাত্র হিসেবে আমাদেরকে পরিচয় দিয়ে আলিঙ্গন করেন, এ কামনাই আমরা সর্বদা আল্লাহর দরবারে জানাবো। আমীন। ছুম্মা আমীন।

লেখক :
সহকারি শিক্ষক, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

যুগের ইমাম বুখারী শাইখুল হাদীস
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.

মাওলানা এ.এস.এম.আত্‌হারুদ্দীন মোল্লা আহমাদাবাদী

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রা.- এর খিলাফত আমলে সাহাবী হযরত মস'আব বিন আবী সুফরা রা. কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার খোরাসান, তুর্কিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান ইত্যাদি এলাকা মুসলিম মুজাহিদীনের হাতে বিজিত হয় এবং হযরত আমীরে মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে আবু মুসলিম খোরাসানী কর্তৃক খাওয়ারিজম (খিবা), মাওরাউননাহার (প্রাচীন মার্ভ নগরী) হয়ে সুদূর রাশিয়া ও চীন সীমান্তের আমুর ও শির দরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলাম-রবি উদিত হয়। গড়ে ওঠে মুসলিম শাসন। বুখারা, সমরকন্দ, খোতান, তিরমিয, নিশাপুর ইত্যাদি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যবাহী বড় বড় শহরগুলোর বেশিরভাগই এ এলাকায় অবস্থিত। সিহাহ সিত্তার ছয়খানা হাদীসগ্রন্থের ছয়জন ইমামের জন্মস্থান অত্র এলাকায়।

হযরত ইমাম বুখারী র.-এর জন্ম বুখারায়। ইমাম মুসলিম র.-এর জন্মস্থান নিশাপুরে। ইমাম তিরমিযী র.-এর জন্ম তিরমীযে। ফকীহ ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী র.-এর জন্ম সমরকন্দে এবং এই সমরকন্দে রাজধানী ছিল আমীর তৈমুর লঙের। তাহলে ধরা যায়, এ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন যুগে যুগে মুসলিম মিল্লাতের অসংখ্য আলিম-উলামা, মুফাসসিরীন-মুহাদ্দিসীন, মুবাল্লিগেদীন, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অলী-আল্লাহ। আরবীভাষায় একটি প্রবাদ আছে, "লিকুল্লি শাইয়িন মুতাআস্‌সারাহ।" প্রত্যেক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

বক্ষমাণ এ নিবন্ধে যতকিঞ্চিৎ আলোচনা হবে এমন এক মুসলিম গুণী ব্যক্তির, যাঁকে সমকালীন উলামায়ে কিরাম ও জ্ঞান-গুণী ব্যক্তিরা 'যুগের ইমাম বুখারী' বলে মনে করেন। তিনিই হচ্ছেন বাংলার প্রথম টাইটেল মাদরাসা 'ছারছীনা দারুসসুন্নাত জামেয়ায়ে ইসলামিয়া'র প্রথম মুহাদ্দিসে আউয়াল। আর মুহাদ্দিসে ছানী ছিলেন বিহার প্রদেশের চম্পারন জেলার বেতিয়া নিবাসী শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার সিদ্দীকী বিহারী র.।

১৯৪৩ সালে আরিফে রব্বানী ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. যখন নিজ বাড়িতে ইলমে হাদীসের উচ্চতর কেন্দ্র খুলতে নিয়াত করলেন, তখন ব্রিটিশ আইনে একমাত্র রাজধানী কলকাতা আলিয়া

মাদরাসা ছাড়া গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল অজপাড়াগাঁয়ে কোন টাইটেল মাদরাসার সরকারী মঞ্জুরী বা অনুমোদন দেয়া হতো না। তখন যুক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন বৃহত্তর বরিশাল জেলারই কৃতি সন্তান মরহুম শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক। তিনি বঙ্গীয় ছোট লাট বাহাদুরকে বুঝিয়ে গ্রাম বাংলায় আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত অহী সম্বলিত উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-চর্চা ও বিতরণের বিদ্যাপীঠ মঞ্জুরীর বা অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। মিশর ও লাহোর থেকে সিহাহ সিত্তাহর কিতাব আনয়নের সুব্যবস্থা করা হয়। এ উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রয়োজন উচ্চতর হাদীসবিশারদ। হযরত পীর মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ রহ. মাদরাসার তৎকালীন কমিটির সাথে পরামর্শ করে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে পত্র দিলেন। তখন দেওবন্দের সদ্য মুহতামিম নিযুক্ত হন বানীয়ে দেওবন্দ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাবী র.-এর পৌত্র হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা হাফিয ক্বারী মুহম্মদ তৈয়্যেব ছাহেব র.। বাংলার গ্রামাঞ্চলে উলূমে অহীর সর্বোচ্চ শিক্ষালয় নদ-নদী খাল-বিল বন-জংগল নারিকেল সুপারির বাগানঘেরা ছারছীনা। ইতোমধ্যে ১৯১৫ ঈসায়ী সাল থেকে গোলপাতার ছাউনী-বিশিষ্ট দীনী শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমাদ র. ইলমে মারিফাতের উচ্চতর জ্ঞানলাভে খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর পীরের নির্দেশে নিজ বাড়িতে স্বল্প পরিবেশে দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রাখেন। আপন পীর মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা শাহ সূফী মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী র. ও একান্তভাবে চেয়েছেন যোগ্য খলীফার বাড়িতে ইলমে অহীর সর্বোচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক। এজন্য মুজাদ্দিদে যামান খাস দু'আও করেছেন। এ দুআর ফলেই ১৯২৪ সালে ছারছীনা মাদরাসা কলকাতা মাদরাসা বোর্ডের আওতায় সর্বপ্রথম আলিম অনুমোদন পায়। ১৯৩৪ সালে ফাযিল ও ১৯৪৩ সালে টাইটেল বা কামিল পর্যন্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দীকী র. তাঁর যোগ্য খলীফার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত এ দীনী প্রতিষ্ঠানের এ উন্নতি শ্রবণে খুব খুশী হন। ১৯৩৮ সালে মুজাদ্দিদে যামানের ইন্তেকালে ছারছীনা মাদরাসা ছিল ফযিল পর্যায়ে উন্নীত। ছারছীনা মাদরাসায় ইলমে হাদীসের উচ্চশিক্ষা প্রদান করা তিনি দেখে যেতে পারেননি।

যা হোক, ছারছীনার পীর সাহেবের পত্র পেয়ে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ খুব চিন্তায় পড়লেন। কোন মেধাবী ছাত্রকে সেই সুদূর বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় ইলমে হাদীসের উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন মুহাদ্দিস হিসেবে পাঠানো যায়? সে বছর দেওবন্দ মাদরাসার

মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত সেই মধ্য এশিয়ার খোতানের কৃতী সন্তান হযরত মাওলানা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কেই বাংলার যমীনে ইলমে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষাদানকল্পে পাঠিয়ে দেয়ার সুব্যবস্থা করেন দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ। পীর সাহেব কর্তৃক প্রেরিত পত্রের পঠন কী ছিল, জানা যায় না। গোটা বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রসারতার ইতিহাস আলোচনা বা লিখতে গেলে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর অবদান শীর্ষে ধরতে হবে। কারণ, ছারছীনার পূর্বেও বাংলার যমীনে ইলমে হাদীসের প্রসারতা ঘটেছিল। দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে সেই মধ্য-এশিয়া থেকেই ইলমে হাদীসের চর্চা বয়ে নিয়ে দিল্লী হয়ে পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগায়েঁ উপনীত হন শাইখুল ইসলাম হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী র.। সে কালে বাংলা ভূমে বহিঃবাংলার অনেক হাদীস শিক্ষার্থী সোনারগাঁয়ে ভীড় জমাতেন। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সত্য কথা এই, আজ যেমন সেই অলীউল্লাহী চিন্তা-দর্শনভিত্তিক ইলমে হাদীস শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা এবং বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও ও বর্তমান রাজধানী ঢাকা মহানগরীর মধ্যখানে শিল্পনগরী ডেমরায় অবস্থিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ মাদরাসা দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসায় ইলমে দীন অর্জনের লক্ষ্যে ভীড় জমায়।

১৭৮১ সালে শামসুল উলামা মোল্লা মাজদুদ্দীন দেহলভী (ওরফে মোল্লা মা'দান) র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ও ১৮৬৬ সালে মাওলানা হাজী সাইয়্যেদ আবিদ হুসাইন র., মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতাবী র. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদরাসা এবং মাওলানা মাযহার নানুতাবী র. প্রতিষ্ঠিত মাযহারুল উলূম সাহরানপুর মাদরাসা, ভারতীয় মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার দিল্লীর মেহেদীয়ানে অবস্থিত 'মাদরাসায়ে রহিমীয়া'ই ছিল ইলমে হাদীস শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। শাহ অলীউল্লাহ র. (ওফাত ১১৭৬ হিজরী) মুহাদ্দিসে দেহলভীর ওয়ালেদ শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী র. (ওফাত ১১৩১ হিজরী) ছিলেন অত্র মাদরাসায়ে রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁর ইন্তেকালে তাঁর যোগ্য চার পুত্র শাহ আবদুল আযীয র. (ওফাত ১২৩৯ হিজরী), শাহ রফীউদ্দীন র. (ওফাত ১২৪৯ হিজরী), শাহ আবদুল কাদের দেহলভী র. (ওফাত ১২৪১ হিজরী) ও শাহ আবদুল গনী র. (ওফাত ১২২৭ হিজরী) পিতার মাদরাসায় কুরআন-হাদীস তথা ইলমে শরীআত ও ইলমে তরীকাতসহ নেছাবভুক্ত সব ধরনের শিক্ষা প্রদান করতেন। ১৭৬২ সালে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমামুল হিন্দ আল্লামা শাহ অলীউল্লাহ র.-এর ইন্তেকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী

মাদরাসায়ে রহীমিয়ার অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। এ মাদরাসারই কৃতি ছাত্র ছিলেন উপমহাদেশের দীন, ঈমান, ইয়াকীন তথা ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও তাহযীব-তামাদ্দুন ধরে রাখার অগ্রনায়ক শহীদে বালাকোট হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ বেরলভী র. ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধান মাওলানা আল্লামা মজদুদ্দীন দেহলভী র.। এছাড়াও চট্টগ্রামের মাওলানা আসাদ আলী র., নোয়াখালীর গাজীয়ে বালাকোট হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী র. (ওফাত ১৮৫৬ ঈসায়ী), শহীদে বালাকোট আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল দেহলভী র. (ওফাত ১২৪৬ হিজরী) এবং আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী র. প্রমুখ্যাত বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ছিলেন উক্ত মাদরাসাই রহীমিয়ার কৃতী ছাত্র।

১৮৫৭ সালে দেশীয় মুনাফিকদের গাদ্দারীর কারণে ভারতীয় মুসলিম স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের পরাজয় বরণ করার পর উক্ত দীনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ ও মোঘল সম্রাট মুহাম্মাদ শাহের আমলে সম্প্রসারিত মাদরাসা বুলডোজার প্রয়োগে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যার ধ্বংসাবশেষ ১৯৮০ সালে আমি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেছি। ১৮৫৭ সালে মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী র. মককা মুআযযামায় হিজরত করেন। ওদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হাজী ইমদাদুল্লাহ র., মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী র., মুফতী মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী র. প্রমুখও মককা শরীফ হিজরত করেন। তখন কলকাতা মাদরাসাটি কোনমতে অব্যাহত থাকে। দেশ যখন শান্ত হয়, তখন-ই হাজী সাহেবের ভাব শিষ্য ও মাওলানা ইসহাক দেহলভী র. এর প্রশিষ্য এবং মাওলানা মামলুক আলী নানুতাবী র. এর শিষ্য মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাবী র. দেওবন্দ মাদরাসা পূর্ণ উদ্দমে চালু করেন। পরবর্তীকালে দেওবন্দ মাদরাসা ইলমে হাদীস বা উলূমে অহীর শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে অবদান রাখে। শাইখুল হাদীস হযরত খোতানী হুজুর র. এই দেওবন্দেরই উচ্চতর সনদপ্রাপ্ত হয়ে সম্মানিত আসাতিযায়ে কিরামের নির্দেশে সুদূর পূর্ব বাংলার অজপাড়াগাঁ ছারছীনায় চলে আসেন।

আল্লামা খোতানী হুজুর র.-এর কতিপয় সম্মানিত উস্তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। তাঁর মহান উস্তাদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন–

* দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব র.
* শাইখুত তাফসীর ওয়াল আদব হযরত মাওলানা হাফিয ইযায আলী সিওহারাভী র.

* হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন র.
* শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী র.
* হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াভী র.
* হযরত মাওলানা বশীর আহমদ র.
* হযরত মাওলানা আবদুস সামী’ র.
* হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলভী র.
* হযরত মাওলানা ক্বারী হিফযুর রহমান র.
* হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আমর র. প্রমুখ্যাত উলামায়ে কিরাম।

দেওবন্দ মাদরাসায় হযরত খোতানী র. যে সব বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন, তা হচ্ছে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে তাজভীদ, ইলমে ফিক্‌হ, ইলমে আক্বাইদ, ইলমে আদব, জ্যোতির্বিদ্যা, ইলমে তিব্ব ও ইলমে ফারাইয ইত্যাদি।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কে স্বচক্ষে দেখার এবং তাঁর নেক সুহবাত লাভের সুযোগ হয়েছে ১৯৬১-৬২ থেকে ছারছীনায় ও রাজধানী শহর ঢাকার তারা মসজিদে, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে ও তাঁর বাসায়। এ সাক্ষাৎগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। অতি সংক্ষেপে দু একটি ঘটনা ইনশা-আল্লাহ সামনে বলার আশা রাখি। এর পূর্বে তাঁর স্থানীয় বংশগত, শৈশবকালীন, যুবকালীন, জিহাদী জীবন, তলবে ইলমে দীন ও কর্মজীবন সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি যুগের বুখারী আল্লামা খোতানী হুজুরের তাদরীসী জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারিনি বিধায় দুঃখিত নই মোটেই। কারণ, ইসলাম জগতের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মু’মিনীন হযরত আলী রা. বলেন–
ওয়ালা তাছাফ আলা মা ফাতাকা। অর্থাৎ, “যে বস্তু তোমার থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে যায়, উহাতে আফসোস করো না।”
বাড়ির দরওয়াজায় ১৯৩৮ ঈসায়ী সালে প্রতিষ্ঠিত ইয়ারিয়া দাখিল মাদরাসায় ১৯৪৩ সালে বিসমিল্লাহ খানীর অনুষ্ঠান হয়ে ১৯৪৮ সালে কুরআন মজীদের সবক অনুষ্ঠান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দাখিল আউয়াল অর্থাৎ তৎকালীন জামায়াতে দাহমে ভর্তি হই। ছারছীনা মাদরাসায় পড়ানোর জন্যে বাবা-মা পরম উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়েও শেষ পর্যন্ত ছোট ও দূরবর্তী হওয়ার কারণে তাঁদের উক্ত নেক আশা বাস্তবায়িত হল না। তখন আমার এলাকার অনেক তালিবুল ইলম ছারছীনা মাদরাসায় অধ্যয়নরত।

বাবা-মায়ের নেক উদ্যোগেই ১৯৪২ সালে স্থানীয় মরহুম কুদম আলী মোল্লার বাড়ীর মসজিদের প্রাঙ্গনে সর্বপ্রথম ছারছীনার মরহুমে আউয়ালকে দেখা ও তাঁর ফয়েযপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল দম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। আজও ভুলিনি সেই দম। ১৯৩২/৩৩ সালে স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলিম নেতা আমার মাতামহ হাজী সমীরুদ্দীন মোল্লার নেতৃত্বে হিন্দু জমিদারের মুসলিম প্রজাবৃন্দের উপর খাজনা অনাদায়ের অজুহাতে নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা হিসাবে গুর্খা সৈন্যবাহিনী ও পুলিশদের লেলিয়ে দিয়ে মাঠে ধান কেটে নেয়ার পায়তারা করে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নানার নেতৃত্বে অস্তিত্ব রক্ষার জিহাদে সরকারী বাহিনী পরাজয় বরণ করলেও পরবর্তিতে উক্ত হিন্দু জমিদার বাদী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মামলা কোর্টে দায়ের করে দেয়। তখন আমার পিতা ও মামারা ছিলেন যুবক। মামলাটি চলছে, এমন সময় ছারছীনার পীর সাহেব র. উত্তর ঘটকের আন্দুয়া সালিহিয়া সিনিয়র মাদরাসার মাহফিলে তাশরীফ আনেন। তখন তিনি বোটে চড়ে তাবলীগী প্রোগ্রাম সমাধা করতেন।

আমার বাবা মৌলভী মোখতার আলী মোল্লা র. প্রায়ই বলতেন– "তোমার নানার নির্দেশে তোমার মামারাসহ আমরা তখন ছারছীনার পীর সাহেবের খিদমতে হাযির হয়ে মিথ্যা মামলার আনুপূর্বিক সব ঘটনা খুলে বলি। সময় বেশী হওয়ায় পীর সাহেব বললেন, 'বোট ছেড়ে দাও।' মাদরাসা ঘাট ছেড়ে দক্ষিণদিকে ভাটার টানে বোট চলতে থাকে, আর পীর সাহেব মন দিয়ে আমাদের কান্নাভেজা বর্ণনা শ্রবণে বললেন, 'আপনারা যুবক। সত্য ঘটনা বলে থাকলে, এ মিথ্যা মামলায় আপনারা বেকসূর মুক্তি পেয়ে যাবেন। এ মিথ্যা মামলায় আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না।'"

দাদা হুজুর র. সর্বনাশা শ্রীমন্ত নদের তীরে আমার বাবা-মামাদেরকে অবতরণ করানোর পূর্বে তাওবা করিয়ে মুরীদ বানিয়ে নেন। আল্লাহ-ওয়ালাদের মন্তব্য অলংঘনীয়। পরবর্তি তারিখেই বাবা ও নানা-মামারা উক্ত জমিদারের বানোয়াট মোকাদ্দমায় বেকসূর মুক্তি পান। সেই থেকে আমার মাতা-পিতা ছারছীনার প্রতি অগাধ ভক্তি মুহব্বত পোষণ করতেন। আজ তারা কবরবাসী। পীর সাহেবসহ সকল মুরব্বীদের ওপর আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক।

আমি ১৩৫৬ বাংলা সালেই বাবার সাথে সর্বপ্রথম নৌকা যোগে সুবিদখালী, ঝোপখালী, বিশখালী ও গাবখান নদী পথে ছারছীনায় আসার সৌভাগ্য লাভ করি এবং পুনরায় বাবা-মায়ের পরম উৎসাহে মরহুমে আউয়াল হযরত দাদা হুজুর র. কে দেখার এবং তাঁর থেকে ফুঁ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। বড় হুজুর হযরত

মাওলানা শাহ আবু জা'ফর মুহাম্মদ সালেহ র. মেঝ হুজুর হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সিদ্দীক র. ও ছোট হুজুর আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূর র. কে বাবার সৌজন্যে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

অতঃপর ১৯৫৯-৬০ সালে চৈতা নেছারিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন চৈতার মরহুম পীর সাহেবের সাথে তাঁর পাংশী নৌকাযোগে মাওলানা নূর মুহাম্মদ খান, মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান, আলহাজ্জ কাজী মুহাম্মাদ নূর ও মরহুম আমীনুদ্দীন হাওলাদারসহ অনেক মুরীদান সমভিব্যহারে ছারছীনা শরীফের অগ্রহায়নী মাহফিলে যোগদানের সৌভাগ্য হয়। তখন থেকেই ছারছীনা দরবার ও ছারছীনা মাদরাসার আসাতিযায়ে কিরামের সাথে পরিচয় ঘটতে থাকে। আসাতিযায়ে কিরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– হযরত খোতানী হুজুর, বিহারী হুজুর, হেড মাওলানা হুজুর, চাঁদপুরী হুজুর, ডামুড্যার হুজুর, রূপসার হুযর, আবুল খায়ের হুজুর, তিমির কাঠীর হুজুর, বাড়ির হুজুর, মাস্টার এমদাদ আলী, কায়েদ সাহেব হুজুর, মাদারীপুরী হুজুর ও হযরত মাওলানা মুজাফফর আহমাদ প্রমুখ্যাত বুযুর্গানে দীন (রহমাহুমুল্লা আজমাঈন)।

উল্লেখ্য যে, ১৩৫৬ সাল থেকেই ছারছীনা দরবার শরীফের কতিপয় খলীফার সাথে অধমের পরিচয় ঘটতে থাকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– হযরত মাওলানা মুসলিহুদ্দীন র., ক্বারী আবদুল্লাহ বি.এ. র., মাওলানা আবদুল আযীয বাঁকপুরী র., মাওলানা আবদুল বারী ভৈরবী হুজুর র., হযরত মাওলানা মাসউদ আলম র., ফরিদপুরী জামাতা হুজুর র., ধাওয়ার জামাতা হুজুর র., সোনাহারের জামাতা হুজুর র., রহমতপুরের ছোট জামাতা শরীফ ছাহেব র., ফয়রার পীর সাহেব হুজুর র., চিংড়াখালীর হাফিয র., পাঙ্গাশিয়ার পীর ছাহেব হুজুর র., মুহসিনুদ্দীনের পীর ছাহেব হুজুর রহ., চৌদ্দভুরিয়ার হুজুর র., কল্যাণকলসের হাজী ওয়াজেদ আলী খান র. ও মির্জাগঞ্জ ভয়াং-এর হুজুর র. প্রমুখ্যাত বুযুর্গানে দীন।

ছোট বেলায়ই ছারছীনা মাদরাসায় ইলমে দীন অর্জনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে আসছিলাম। দাখিল পাশের পরে কুতুবপুর আনিসিয়া ফাযিল মাদরাসা (১৯৬১-৬৬), পুকুরজানা সিনিয়র মাদরাসা (১৯৬৬), লাউরী যশোর কামিল মাদরাসা (১৯৬৯), মোকামিয়া সিনিয়র মাদরাসা (১৯৭০) ও নেছারাবাদ (হাজীগঞ্জ) ফাযিল মাদরাসা থেকে ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে যথাক্রমে আলিম-ফাযিল জামা'আতে উত্তীর্ণ হই।

অতঃপর ৫৬/এ প্যারিদাস রোডস্থ খানকায়ে নেছারিয়ায় অবস্থানরত ছারছীনার বড় হুজুর র. এর নিকট হাযির হয়ে খোতানী হুজুর ও বিহারী হুজুর র.-এর কাছ থেকে কামিল হাদীসের দরস নেয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি। হুজুর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন– "আপনি ছারছীনায় পড়বেন? তার চাইতে ফেনী আলিয়া মাদরাসায় চলে যান। সেখানে মাওলানা ওবাইদুল হক সাহেব প্রিন্সিপ্যাল আছেন। আপনার সুবিধা হবে। ছারছীনা আপনার ভালো হবে না।" হুজুর র. এর এহেন নির্দেশে আমি তখন নিরুৎসাহী না হয়ে ফেনী চলে গেলাম। মাওলানা ওবাইদুল হক র. সে সময় জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেও মাদরাসায় আসেননি। নোয়াখালীর মাওলানা আবদুল মান্নান র. তখন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। মাদরাসার অবস্থা দেখে পছন্দ না হওয়ায় সোজা চট্টগ্রাম জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়ায় চলে গেলাম। তখন উক্ত সুন্নিয়ায় মাওলানা মুসলিহুদ্দীন (এম.এ.) ও মাওলানা মুজাফফর আহমাদ যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া ও আচরণের মধ্যে আমার মন বসলো না। রাতে রেলওয়ে স্টেশন মসজিদে হযরত মাওলানা মুজাফফর আহমাদ র. এর সুহবতে খাওয়া-দাওয়া ও অবস্থান করি। পরদিন ভোর ৭ টার ট্রেনে সোজা ঢাকা চলে আসি।
একদিন পর মাদরাসা-ই-আলিয়ার তৎকালীন হেড মাওলানা ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান র. এর খলীফা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল আম্মার মুহাম্মাদ আবদুল বারী মাদানীপুরী হুজুর র. এর কাছে যাই এবং তাঁর মাদরাসায় উচ্চতর ইলমে দীন অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি। তিনি আমার দিকে চেয়ে কী বুঝলেন, আল্লাহ ভালো জানেন। বললেন– "তোম আয়েন্দা কাল বিলকুল সুবহে সবীরে আ জাও। মাই তুমকো স্পেশাল তওরপর দাখেলা দেওঙ্গা।" সে মর্মে পরদিন ভোরে মাদরাসায়ে আলিয়ায় পৌঁছতে আধা ঘণ্টা দেরী হওয়ায় ৫/৬ জন ছাত্রের পরেই আমার ভর্তি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। তখন মাদরাসা-ই-আলিয়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপ্যাল ও পদাধিকার বলে রেজিস্ট্রার ছিলেন আল্লামা ড. এ.কে.এম. আইয়ুব আলী র.।

অতএব, ছারছীনা মাদরাসায় আর কামিল হাদীসে অধ্যয়নের সুযোগ হল না। তাই খোতানী হুজুর, বিহারী হুজুর, হেড মাওলানা হুজুর, কায়েদ সাহেব হুজুর প্রমুখ্যাত বুযুর্গানে দীনের খিদমতে ইলমে হাদীস অর্জনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে চাপা রয়ে গেল। কিন্তু এখন মনে করি, বড় হুযুরের অন্তর্দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। যদি ছারছীনায় পড়তাম, তা'হলে মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো অন্যরূপ। হয়তোবা লেখক গবেষক অথবা বহিঃর্জগতের সাথে এতটা সম্পৃক্ত

হতে পারতাম না। তাই বলে, ছারছীনা দরবারের সাথে সম্পৃক্ততা বা যোগাযোগ কোন অংশে এখানকার ফারিগীনদের মধ্যে অনেকের চেয়ে কম নয়। এর প্রমাণ, আজ থেকে প্রায় পনের বছর পূর্বে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুরের নির্বাচিত নাম 'ছারছীনা শরীফের সার্বিক ইতিহাস' মাওলানা সাইফুল্লাহর অর্থায়নে আমার লিখিত গ্রন্থ প্রায় পঁচিশ ফর্মা বিশিষ্ট, যা আজো ছাপা হয়নি। অথচ এর কপি মাওলানা সাইফুল্লাহ ও বর্তমান পীর সাহেবের পক্ষে মাওলানা রফীকুল্লাহ নেছারীর অন্ধ প্রকোস্টে সম্পাদনার অপেক্ষায় রয়েছে। তথায় হযরত খোতানী হুজুর ও বিহারী হুজুর র. সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল, স্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া সেই লেখা থেকে এখন কিছু বর্ণনা আগ্রহী পাঠকদের খিদমতে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

<u>এক.</u>

ছারছীনা মাদরাসার কৃতী ছাত্র ও চৈতা নেছারিয়া ফাযিল মাদরাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদ খান বলেন– "আমাদের উস্তাদ হযরত খোতানী হুজুর র. যখন ক্লাসে আসতেন, আমরা বুখারী শরীফ নিয়ে বসে যেতাম। ক্লাস রুমে কেউ টু শব্দ করতে সাহস পেতাম না। ঘণ্টা পড়ার পূর্বেই খোতানী হুজুর রুমে চলে আসতেন। হুজুর এমন আদবের সাথে আমাদেরকে ইলমে হাদীসের দরস দিতেন, মনে হতো যেন হুজুর নামাযের বৈঠকে রয়েছেন। একনাগারে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেই অবস্থায় থাকতেন, যেই অবস্থায় প্রথমে বসতেন। হুযুরের দরসের সময় তার পকেটে রিভলভার থাকতো। কারণ, তিনি ছিলেন রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী মুসলিম সৈনিক। আর ছিলেন যুদ্ধংদেহী তুর্কী মুজাহিদ। সেহেতু তাঁর সাথে আগ্নেয়াস্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক।"

<u>দুই.</u>

খোতানী হুজুর সম্পর্কে তাঁর একান্ত অনুগত ভাবশিষ্য সফল ও আদর্শ শিক্ষাবিদ দেশের উচ্চতর দীনী প্রতিষ্ঠান দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক বলেন– "বীর সেনানী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী হুজুর র. সাথী মুজাহিদদের হারিয়ে শত্রুবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মাঝেও ছুটলেন সামনের দিকে। সামনে পেয়ে গেলেন জীন পরিহিত সুসজ্জিত একটি ঘোড়া। এর পিঠে আরোহনপূর্বক চলছেন তো চলছেন। পেছনে তাকাবার আর সময় নেই। পেছনে শত্রু বাহিনীও ধাওয়া

করে চলছে। অগণিত গুলি ছুড়ে চলছে কাফির বাহিনী আল্লামা খোতানী হুজুরের দিকে লক্ষ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাঁকে হিফাজত করেন, কার সাধ্য তার ক্ষতি করার? কয়েকদিন পাহাড়-পর্বত ঘেরা অরণ্যের মধ্য দিয়ে অজানার পথে চলছেন ছারছীনার সেই 'যুগের ইমাম বুখারী'। শেষ পর্যন্ত একটি নদীর তীরে এসে পৌছলেন তিনি। আহার ও পানির অভাবে দারুন কষ্টের ও দুঃসময়ের একমাত্র ঘোড়াটি সেখানে মারা যায়। নদী পারাপারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আল্লামা খোতানী ঝাঁপ দিলেন নদী বক্ষে। দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাঁটার পর পৌঁছলেন অপর পাড়ে। তখন একটু নিরাপদ ভাবলেন নিজেকে। নদীর অপর তীরের নাম না জানা গেলেও স্থানটি চীনের একটি এলাকা ছিল নিঃসন্দেহে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় হযরত খোতানী হুযুরের বিপদ সংকুল অবস্থায়। আপনজনকে হারিয়ে ইলমে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন পূর্বক ১৯৪৫ সাল থেকে প্রায় ৪১ বছর পর্যন্ত আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এর মহান বাণীর দরস প্রদানে জীবন অতিবাহিত করেন।"

তিন.

র্মির্যাগঞ্জ ইয়ারিয়া দরবার হাই স্কুলের সাবেক ধর্মীয় শিক্ষক ও আল্লামা খোতানী হুজুরের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গনী বলেন– "আমরা যখন ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র এবং লিল্লাহ বোর্ডিং-এর নিবাসী, তখন ছারছীনায় একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সন্ধ্যা নদীর ভাঙ্গল কুলে অবস্থিত ছিলো মাদরাসা প্রেস। মৌলবী হাকীম আবদুল আযীয ছিলেন প্রেস ম্যানেজার ও মৌলবী আবদুল গনী শায়েস্তাবাদী ছিলেন সহকারী ম্যানেজার। এ ঘটনার অল্প কয়েক বছর পূর্বে ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ র. ইন্তেকাল করেন। দীনী প্রতিষ্ঠানের পেছনে কিছু শত্রুলোক চির কালই লেগে থাকে। ছারছীনাও এর উর্ধ্বে নয়। তাই, কে বা কারা একটি মৃত মেয়ে লোকের কবর দেয়ার চেষ্টা করে মাদরাসা প্রেসের কাছাকাছি আম-সুপারীর বাগানে। ছারছীনা জামে মসজিদে এশার আযান হওয়ার পর জামায়াত শেষে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই যার যে রুমে পড়া-শুনা ও মুতালাআয় নিমগ্ন। এমন সময়ে হঠাৎ নদীর পার থেকে শোর-গোল ভেসে আসে দরবার অভ্যন্তরে। বড় হুজুর তাঁর বন্দুক নিয়ে, মেঝ হুজুর তাঁর দোনালা বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা তায়াম্মুল হুসাইন খান তাঁর বন্দুকসহ তৈরী হয়ে যান। ওদিকে খোতানী হুজুর তাঁর বন্দুক নিয়ে স্বরূপকাঠী থেকে দরবারে আসতে প্রধান ফটকের দোতলায় গুলি বোঝাই করে তৈরী হয়ে যান। গুজব আসলো, ছারছীনায় ডাকাত

ঢুকছে। সমস্ত ছারছীনায় হই-হুল্লোড় পড়ে যায়। ডাকাত! ডাকাত! পীর সাহেব কেবলা সাহস করে নদীর পাড়ে গিয়ে জানলেন, ঘটনাটি গুজব। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসছে। তাই, ছাত্র-শিক্ষক সবাই কথা বলতে বলতে প্রধান গেট দিয়ে দরবারে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। উপর থেকে হঠাৎ ধমকের আওয়াজে খোতানী হুজুর র. বললেন– 'কোন হ্যায়? বাতাও, অরনা মাই গুলি করোঙ্গা।' হযরত পীর সাহেব কেবলা সজোরে জওয়াবে বললেন, 'মাই মুহাম্মদ সালেহ হোঁ।' অতঃপর মুজাহিদে ইসলাম আল্লামা খোতানী র. নিচে নেমে আসেন এবং ঘটনা শুনে নিজ কক্ষে ফিরে যান।"

<u>চার.</u>

১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সরকারী খরচে মুসলিম বাংলার প্রাচীন রাজধানী পান্ডুয়া শরীফ দেওতলা, দেবীকোট, বাইস হাজারী ওয়াকফ স্টেট, ইংরেজ বাজার, মালদাহ, মুঙ্গের, আলীগড়, আযমগড়, দিল্লী, আজমীর, বিহার শরীফ, পাটনা, মুযাফফরপুর, সীতামারী, সিওয়ান, বালিয়া, সিকান্দরপুর, গোরক্ষপুর ও হরিয়ানা সফরের সৌভাগ্য হয়। মুযাফফরপুর জেলার অধীন আওরাই থানার অন্তর্গত চান্ডিহা নিবাসী ড. মুহাম্মদ মতিয়ার রহমান সাহেবের (আয়নায়ে ওয়ায়েসী লেখক) কাছে জানতে পারলাম, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার সিদ্দীকী বিহারী সাহেব তাঁর নিজ বাসস্থান পশ্চিম চম্পারণ বেতিয়া শহরে অবস্থান করছেন। আমি আগেও বলেছি, ছারছীনা মাদরাসায় যুগ-বিখ্যাত মুহাদ্দিসীনের খিদমতে দরসে হাদীসের ক্লাসে বসার একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা ভাগ্যে জুটেনি। তাই, ড. সাহেবের কাছে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন– "মাশরিকী পাকিস্তান মে ছারছীনা শরীফ ওয়াকে' হায়, ওহাঁ দারুসসুন্নাহ মাদরাসা নামী এক আ'লা দরজাকা মাদরাসা মওজুদ হায়। ওহাঁকা জোঁ শাইখুল হাদীস থে উনকা নাম হায় হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব।"

পরদিন 'আয়নায়ে ওয়ায়েসী'র লেখক ড. সাহেব থেকে বিদায় নিয়ে সীতামারীতে রাত যাপন করি। তারপরের দিন আসাম-দিল্লী ট্রেনযোগে উত্তর বিহারের ঢাকা (মহকুমা শহর), তথা থেকে বাসে বেতিয়া পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। যোহর, আসর, মাগরিব ট্রেনে ও বাসে আদায় করি। মনে মনে ভাবতে থাকি রইসুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. হাদীস সংগ্রহের কাজে মধ্য এশিয়ার দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ অবস্থায় তাঁর পেশাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত ঝরতো। তবুও আল্লাহর প্রিয় হাবীব

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান বাণী সংগ্রহ করতেই হবে। যাই হোক, বিদেশে অজানা অচেনা রাস্তার শহরে ঢুকে আঁকা-বাঁকা অলি-গলিতে উর্দুভাষায় জিজ্ঞেস করতে থাকি– "আপলোক জানতে হেঁ, শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব কোন হ্যায়, আওর উনকা মাকাম কাঁহা?" বেভূয়ে অসময় আমার কথা বুঝে তারা বলতে লাগলো– "হ্যাঁ, উনকো হাম জানতে হ্যায়, উনকি মাকাম আওর খানকাহ উস তরফ হ্যায়।"

সারাদিন গাড়ীতে। ক্ষুধায় পেট চৌ চৌ করে। তবুও আশার হাল ছাড়িনি। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরতের খানকাহ পেয়ে যাচ্ছি। তখন মনে পড়ছিল, ছারছীনায় বিহারী হুজুরের কক্ষে ১৯৬৪ সালের সেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা, পরে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা এম.এ. মান্নান র.। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাঙ্গাশিয়ার দ্বিতীয় মরহুম পীর সাহেব আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আমীন র.। আর আমি অধম ছিলাম দরজায় দাঁড়ানো।

দিন শেষ হয়ে রাত ঘনিয়ে আসলো। ব্যস্তভাবে যখন বিহারী হুজুরের খানকার সামনে উপস্থিত হই, তখন তিনি সেই এলাকার দিলদার নামক স্থানে প্রধান মেহমান হয়ে জনৈক কম বয়সী কলেজের ছাত্রকে খাদিম হিসাবে সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পায়ে হেঁটে গেটের বাইরে বের হয়ে আসছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমাকে সামনে দেখেই জিজ্ঞেস করেন, 'কোন হ্যায়?' আমি সালামান্তে বদমবুচী করে জওয়াব দিলাম, "মাই আতহারুদ্দীন মোল্লা হোঁ, মুলকে বাংলাদেশ ছে আ রাহা হোঁ।" হুযূর বললেন, "ঠিক হ্যায়, মাই এক মাহফিল মে জা রাহা হোঁ, আপ মেরে খানকাহ মে আরাম কি জিয়ে। ইনশা-আল্লাহ, মাই জলদীহি ওয়াপেছ আ-জাওঙ্গা। ইয়াতো আফ হামারে সাথ চলিয়ে।" আমি বললাম, "জি, হ্যাঁ আপকি আখিরী হুকুম তা'মীল করোঙ্গা।"

হুজুর খুশী হয়ে আমাকেসহ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে ভক্তদের একটা গ্যারেজে বসলেন। আমাকেও একটি চেয়ারে বসাবার জন্যে ভক্তদের বললেন। এরপর চা-পান খেয়ে গাড়ীতে বসলাম। কিছু দূর যেতেই মাহফিলে পৌঁছলাম। হুজুর আমাকে সাথে নিয়ে মঞ্চে গেলেন। তখন ওয়ায করছিলেন জনৈক আলিম। তিনি ছিলেন সরকারী কৃষি অফিসার। তার মাথায় ছিল পাগড়ী। পরিধানে সুন্নাতী জামা। তিনি বিহারী হুজুরের ইস্তেকবালে বললেন, "আভী আভী সুবায়ে বিহারকে

বলকে সারে হিন্দকে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব তাশরীফ লে রাহে হেঁ। নারায়ে তাকবীর।" অতঃপর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ বলে উঠলো, "আল্লাহু আকবার। মাওলানা আবদুস সাত্তার জিন্দাবাদ।" এরপর হুজুর আলোচনা করলেন। মীলাদ শরীফ ও আখেরী মুনাজাত করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা রাতেই শহরে ফিরে আসি। অতঃপর তিন দিন পর্যন্ত হুজুর আমাকে তাঁর সুহবতে রেখে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন।

হুজুর বারংবার ছারছীনার কথা আলোচনায় আনতেন। আমিও তাঁর আগ্রহ সাপেক্ষে সব অবস্থা বলতাম। পীর সাহেবের কথা, খোতানী হুজুরের কথা, ছাত্রদের কথা শুনতেন। এক পর্যায়ে আমি বললাম, "হুজুর! মাই লাড়কপান সে ছারছীনা মাদরাসামে হুসুলে ইলমেদীন কী তালিব হোঁ, মগর কিসমত মে নেহী।" হুজুর বললেন, "কিয়া তাআজ্জব কি বাত হায়! তবভী আপনে মেরে সামনে ছারছীনাকি আহওয়াল বিলকুল পেশ করদিয়া।" এই বলে তায়াম্মুম করে বুখারী শরীফ নামিয়ে তিনি নিয়তের সবকটি আমাকে দরস দেন এবং তা স্বহস্তে লিখে দেন। তিন দিন মেহমানদারীর পর যখন আলীগড়ের পথে দিল্লী রওনা হই, তখন একটি নতুন কম্বল ক্রয় করে আমাকে হাদীয়া দিয়ে বলেন, "আপ মওসূমে শেতা মে ঘরসে নেকালা, কম আজ কম এক কম্বলতো লাইয়ে।"

উল্লেখ্য যে, বিহারী হুজুরের তাকওয়া ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। উক্ত কম্বলটির এক কোণে একটি ছোট্ট প্রজাপতির ছবি ছিল। সেটি ফেরত দিয়ে বললেন, "ইসকো অয়াপেজ দেও। ইসমে পরেন্দাকী তাসবীর হ্যাঁয়। আলিম কে লিয়ে ইয়ে ইস্তেমাল করনা জায়েয নেহী।।" অতঃপর খাদিম কলেজের ছাত্রটি উক্ত কম্বলটি নিয়ে সাইকেল যোগে দোকানে গিয়ে ছবি-বিহীন সুতার তৈরি মূল্যবান একটি কম্বল নিয়ে আসলেন এবং হুজুর আমাকে তা হাদীয়া প্রদান করলেন।

ছারছীনার মরহুম পীর সাহেব সম্পর্কে বিহারী হুজুর বলেন, "মেরে শাইখ থে যামানা থে শাইখে কামিল। উনকি দু'আ সে আবদুস সাত্তারকে জীব মে হার ওয়াক্ত রূপায়ে পয়সা মওজুদ রাহতে হেঁয়।" গোটা বিহার ও দক্ষিণ নেপালে বিহারী হুজুরের অনেক মুরীদ বিদ্যমান আছে। হুজুর গোটা বিহার প্রদেশের নামকরা মুহাদ্দিস ও শাইখে তরীকত হিসেবে সুপরিচিত। আজ ৩৩ বছর পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ-খবর নিতে পারিনি বিধায় দুঃখিত।

বলছিলাম খোতানী হুজুরের কথা। বিহারী হুজুর তাঁর মূল্যবান আলোচনায় প্রায়ই খোতানী হুজুরের স্বাস্থ্য, অবস্থান, আর্থিক অবস্থা জানতে চাইতেন। আর বলতেন, "কাশ! ফের এক মর্তবা ছারছীনা শরীফ জানে কা নেক মওকা হোতা, তো মেরে শায়খ কা মাযার শরীফ যিয়ারত করনেকা তৌফীক হোতা। আওর পীর সাহেব ও মেরে বড়ে ভাই খোতানী হুজুরকে মুলাকাত করতা। আপ আগার ভিসাকা বন্দোবস্ত করে তো মাই ছারছীনা শরীফ জাওঙ্গা।" ইত্যাদি।

ওদিকে ভিসার সময় ফুরিয়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি দিল্লী রওনা হই। হুজুর তখন দুটি চিঠি লিখেন। একটি হযরত পীর সাহেব কেবলাকে, আরেকটি খোতানী হুজুরকে। দেশে ফিরে ঢাকায় আসলাম। একটি চিঠি বাংলাবাজারে অবস্থানরত পীর সাহেবকে পৌছে দিলাম। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিহার গিয়েছিলেন? আমি বললাম, জি। অতঃপর চিঠিটি হাতে নিয়ে কিছুটা পড়ে বললেন, বিহারী সাহেব কেমন আছেন? আমি বললাম, হুজুর বাড়ীতে ভালোই আছেন। এরপর পীর সাহেব কেবলা আর কিছু বলেছিলেন কিনা, এখন আর তা স্মরণে আসে না। চিঠিটি হুজুর স্বযত্নে সংরক্ষণ করলেন।

দ্বিতীয় পত্রটি নিয়ে ঐতিহাসিক তারা মসজিদে গেলাম। খোতানী হুজুর তখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে মা'যুর অবস্থায় লাঠিতে ভর দিয়ে মসজিদের সামনে আমাকে দেখেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান। আমি খুশিমনে অতি আগ্রহের চিত্তে সালাম দিয়ে কদমবুচী করতে গেলে হুজুর আমার মাথা ধরে আমাকে বুকে টেনে নেন। এক ফাঁকে আমি যুগের ইমাম বুখারী হযরত খোতানী হুযুরের কদমবুচী করেই ছাড়লাম। তারপর হুজুর আমাকে তাঁর বাসায় নেন। ট্রেতে করে চা-নাশতা নিয়ে আসেন। প্রিয় বন্ধু এবং একনিষ্ঠ সহকর্মী আল্লামা আব্দুস সাত্তার বিহারী হুজুর র. এর খোঁজ-খবর নেন। তারপর আমি যখন ফিরে আসছিলাম, তখন আমাকে খুব জোর করে কিছু টাকা-পয়সা হাদীয়া দেন। হুজুরের এ আন্তরিকতা এখনো মনে পড়ে। হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভূত হয়। তারপর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমসহ আরো কয়েক জায়গায় হুযুরের সাথে একাধিকবার সাক্ষাত হয় এবং তাঁর দুআ ও নজর নেয়ার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহ যুগের ইমাম বুখারী আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কে জান্নাতুল ফেরদাউসের আলা মাকাম দান করুন। আমীন।

লেখক :

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

সত্যের সাধক মরহুম খোতানী হুজুর কেবলা র.

হাফেজ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন

আজ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দু'চার কলম লিখতে বসেছি। লেখার মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের মাঝে খোতানী হুজুর নেই। আজিমপুর নতুন গোরস্থানের গেটের সম্মুখেই রাস্তার বাম পাশে আত্মগুপ্ত হয়ে অগণিত ভক্তবৃন্দের সালাম নিচ্ছেন। আর কোন দিন তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না এবং বলবেনও না قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। তিনি যে একেবারে শেষ বিদায় নিয়ে আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে যাত্রা করবেন, এ কথা কস্মিনকালেও কল্পনা করিনি। বর্তমান বিশ্বের মুহাদ্দিস জগতের এ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি যে এ রকম অকস্মাৎভাবে খসে পড়বে কেউ বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতাম, হুজুরের এ সফর ক্ষণিকের জন্যে নয়, এ যে এক অনন্ত দিনের সফর, লম্বা সফর, হুজুরের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না আমাদেরকে আর কোনদিন ছারছীনা টারমিনালে, তাহলে ক্ষমিয়ে নিতাম আমাদের বেয়াদবী, বে-হুরমতী। দেখে নিতাম নয়নভরে, দুআ নিতাম দিল খুলে। জানি না হয়ত সেদিন ছারছীনার জমিন, মাদরাসা-মসজিদ মৌনস্বরে ক্রন্দন করে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল। মরহুম হুজুরও হয়তবা আখেরী বিদায় দিয়েছিলেন। তিনিও মনে হয় চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়েছিলেন।

আমরা হুজুরের আশু রোগ মুক্তির জন্যে দুআ করছিলাম হরহামেশা। আশা করেছিলাম হুজুর অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। কিন্তু হঠাৎ গতকাল রেডিও বাংলাদেশের রাত ১১টায় এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসনের দুঃসংবাদে সমস্ত আশা ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে ছারছীনাসহ বাংলাদেশ তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের আকাশে নেমে আসল এক ঘনকালো ছায়া। সৃষ্টি হল এক অভূতপূর্ব দুঃখময় পরিবেশ। সর্বদিকে আহাজারী ও রোনাজারীর রোল পড়ে গেল। বিশেষত তারই স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত আমাদের আসাতিযায়ে কেরাম মাতৃ-পিতৃ বিয়োগের ন্যায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ছাত্ররাও বেহাল হয়ে মুষড়ে পড়েন। কেউ কিংকবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ হুজুরকে এক নজর দেখার জন্যে গভীর রাতে প্রতিকূল অবস্থার পরিবেশকে উপেক্ষা করে পাগলপারা হয়ে উম্মাদের মতো ঢাকার উদ্দেশে ছুটে চললেন। কেউবা যোগাযোগের প্রতিকূল পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরুপায় হয়ে হাশরের

দিন মুলাকাতের আশায় কুরআনখানি, তাসবীহ-তাহলীল করে সওয়াব রেছানী করে অশান্ত অন্তরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে কবির ঐ বাণীটুকুই বার বার স্মরণ পড়ে–

এমন জীবন ভবে করিবে গঠন,
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

সত্যিকারের কবির এ উক্তির বাস্তব প্রতিফলন পরিলক্ষিত হল এ কালজয়ী প্রতিভার তিরোধানে।

এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনা। বাংলাদেশ তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের যারাই কুরআন কিতাব সম্পর্কে একটু খোঁজ–খবর রাখেন, তাদের মাঝে তিনি অত্যন্ত এবং প্রতিটি মহলেই একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও অনন্য মুহাক্কিক ও মুহাদ্দিসরূপে খ্যাত। তিনি লিল্লাহিয়াতের ভিত্তিতে গোটা জীবন কুরআন-হাদীসের সাধনা করে গেছেন। যেহেতু একটি ইমারতের সকল ইট আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, কতিপয় ইট ভুগর্ভে থেকে ওপরের অন্যান্য ইটগুলোর অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়োজিত থাকে, তদ্রূপ হুজুরও ছিলেন বাংলাদেশের ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বিকাশের স্তম্ভগুলোর মূলভিত্তি।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম টাইটেল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয় ছারছীনা শরীফে। আর এর সূচনালগ্ন থেকেই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হেড মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। ছারছীনার পর বাংলাদেশে আরো বহু মাদরাসা ক্রমে ক্রমে টাইটেল মঞ্জুরী পেতে থাকে। এখান থেকেই হুজুরের স্নেহ ও ভালোবাসায় কুরআন-হাদীসের তালীম ও ট্রেনিং নিয়ে এ মাদরাসাগুলোর অধিকাংশ মুহাদ্দিস পদ পূরণ করতে থাকে। সত্যানুসন্ধিৎসু মনীষা নিয়ে একটু খাটিয়ে ও তলিয়ে চিন্তা করলে একথা দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর আলিয়া মাদরাসাসমূহ থেকে যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম বের হয়েছেন, তাদের প্রতি হুজুরের রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অমর অবদান। আমরা এদেশের মানী-গুণী-মনীষী, এর জীবদ্দশায় তাদের কদর করিনি। নজরুলের কদর বুঝলাম ১৯৭৬ সালে। এদেশের অগণিত কবি-সাহিত্যিকের দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়ে জীবনপ্রদীপের অবসান ঘটেছে। খোতানী হুজুরের এ বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে তাতে এ মুয়াজ্জাজ মুহাজির মেহমানের কাছে এ দেশবাসী চির ঋণী। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় হিজরতের কারণে যে রং রূপ পরিবর্তিত হয়েছিল, তদ্রূপ খোতানী

হুজুরেরও আগমনে অগণিত মর্দে মুজাহিদ তৈরীর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা-মসজিদ, সরকারী-বেসরকারী প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তাদের সমুপস্থিতিতে বাংলার ইসলামী রেনেসাঁর গতি উল্কার ন্যায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। সুতরাং অবনত শিরে স্বীকার করতে হয় যে, বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজ সংস্কারে তিনি ছিলেন জাতির অগ্রজ।

সত্যিই কি আমরা এ অমূল্য প্রতিভার সমাদর ও কদর করতে পারবো? অন্তরের মণিকোঠায় কি চিরদিন তাকে জিইয়ে রাখতে পারব? করতে পারব কি এ মুয়াজ্জাজ ও মুহতারাম মুহাজিরের মূল্যায়ন? গড়ে উঠবে কি তার নামে বিভিন্ন গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউট? তার ওপর চলবে কি রিসার্স তথা চিন্তা ও গবেষণা? দুনিয়ার দফতরে যারা নামী-দামী মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করে রাখেন; হয়ত তাদের অনেকের নজরে তিনি পড়বেন না। কিন্তু বাংলার কৃতজ্ঞ মানুষের স্মৃতিপটে ও আলেমুল গায়েবের দরবারে তার নাম সোনার হরফে লেখা হয়ে থাকবে।

হুজুর ছিলেন একজন মুহাজির ও মুবাল্লিগ। এখন দেখব হুজুর এদেশে কিভাবে এলেন এর পেছনে কোন হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিনা। অভিধানে বর্ণিত রয়েছে খতন (ختن) চীনের সীমান্তবর্তী একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানে প্রচুর পরিমাণে মেশক পাওয়া যায়। হুজুর এখানেরই একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে পড়াশুনা শেষ করে কাশগরে হেদায়া পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতঃপর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। অল্প দিনের মধ্যে অকুতোভয় প্রতিভার বলে তিনি একজন সেনা-নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী সময় চীনের কমিউনিস্টরা তাদের ওপর কমিউন ব্যবস্থা চালিয়ে দেয়ার জন্যে আগ্রাসন নীতি অবলম্বন করে। তাদের নিশ্চিত বিজয় দেখে একটি ঘোড়া নিয়ে অলৌকিকভাবে প্রাণে রক্ষা পেয়ে প্রথম সিন্ধুদেশের দিকে হিজরত করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এর কিছুদিন পূর্বেই হুজুরের একটি ছেলে হয়েছিল। তাকে দেখার সুযোগ হয়নি আর হুজুরের। ঘোড়াটিও পথিমধ্যে এক করুণ মৃত্যু বরণ করে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, অসহায় মুহাজির সিন্ধুতে একটি মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ও তথাকার কতিপয় ইসলামী আকীদার বহির্ভুত কার্যকলাপে সন্তুষ্ট না হতে পেরে দেওবন্দ চলে আসেন। সেখানে শাইখুল হাদীস হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী র. এর সংস্পর্শে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি তাফসীর, হাদীস, উসূল, ফিকহ, বালাগাত, মানতিক, হেকমত, ফাসাহাত, ফালসাফা ইত্যাদিতে অগাধ বুৎপত্তি লাভ করেন। এরপরও তিনি তথায় তিন

বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইলমে নুজুমেও ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। সেখান থেকে ছারছীনার পীরে মরহুম তাকে ছারছীনায় নিয়ে আসেন। অনেক সময় মরহুম হুজুরও তার হাদীসের দরসে বসতেন এবং তাকরীর শুনতেন। এ হল হুজুরের জীবনী টিকার সিন্ধু থেকে বিন্দুমাত্র। তাঁর একজন সহোদর বড় ভাই ছিলেন। তিনিও এ বছরই মাস তিনেক আগে ইন্তেকাল করেছেন। এদেশে আসার পর হুজুর বিবাহ করেন। এখানে তার কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনি স্ত্রী ও সাতজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

খোতানী হুজুরের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের লেখনী শক্তির উর্দ্ধে। তদুপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নিমিত্ত তার প্রতি শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। মনে করি, হুজুর স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ (Self-made man) ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। উর্দুতেই কথাবার্তা বলতেন। ছোটদের সাথে স্নেহসুলভ ভাষায় বাংলাতেই কথা বলতেন। তিনি দরসে হাদীসের এমনভাবে ব্যাখ্যা দিতেন যেমন তার আসাতিযায়ে কেরামকে দেখছেন। আতর-গোলাপ লাগিয়ে হাদীস বুকে জড়িয়ে ধরে দরসে হাজির হতেন এবং নামাযের সুরতেই দরস দিতেন। হাদীসের আদবের জন্যে কোন সময় হাদীসের ওপর হাত নাড়াচাড়া করে কোন উদাহরণও পেশ করতেন না। তিনি ছিলেন গোসানসীন ইখতেয়ারকারী একজন নিরীহ মানুষ। মাদরাসার ব্যাপারে হোক, কোন ফতোয়ার ব্যাপারে হোক কোন উচ্চবাক্য করতেন না।

মরহুম পীর সাহেবকে যে সমস্ত আমল করতে দেখেছেন, তার ওপরই আমল করে গেছেন। হুজুর মরহুম পীর সাহেব কেবলার নিকট দেওবন্দ থেকে আসার পরই মুরীদ হন এবং তার বাতানো সবক তথা তরীকা মশক করে গেছেন। হুজুরের তথা ছারছীনা দরবারের মিলাদে কেয়াম, মুনাজাত, কদমবুচি এক কথায় এখানের সকল আমল তিনি আদায় করে গেছেন এবং অন্যকেও করতে বলেছেন। পরবর্তী পীর সাহেব কেবলাকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। নিজের পীরের মতো জানতেন। সত্যিকারে বর্তমান হুজুর বাড়িতে আসলেই দরবারে দেখা করতে নিজে আগেই চলে যেতেন এবং এমন আদব সুরতে বসতেন এবং এমন তাজীম ও তাকরীমের সাথে কথাবার্তা বলতেন, এটা গোটা বাংলার উলামাদের আদর্শ হওয়ার যোগ্য বটে। তিনি সেথায় একটি মুস্তাহাবও ত্যাগ করেননি এবং অন্যকে এ বিচারে শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন। আজ বর্তমান পীর কেবলা তার বাড়িতে চল্লিশ বছরের মেহমান ও বাল্যবন্ধু ও আপনজনকে হারিয়ে যে, কত শুন্যতা বোধ

করছেন তা আলেমুল গায়েবই জানেন। বর্তমান পীর কেবলা ছিলেন পটুয়াখালীর এক মাহফিলে। সন্ধ্যে সাতটায় হুজুরের কাছে ঢাকা থেকে ফোন আসে। তৎক্ষণাৎই ওয়াজের মাহফিল বন্ধ করে দেন। বলেন : আমি আজ এমন ব্যক্তিকে হারিয়েছি, যার বেদনায় আমার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছি। আমার কোন কথা বলার শক্তি নেই। পীর ছাহেব কেবলা উপস্থিত জনতাকে নিয়ে দুআ ও মুনাজাত করেন। মহান ব্যক্তির ক্রন্দন মানব সম্মুখে ধরা পড়ে না, কিন্তু অন্তরের ক্রন্দন অনুভব করলে বোঝা যেত তাদের মধ্যকার সম্পর্ক।

খোতানী হুজুর ছিলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজাচ্ছাম নমুনা। হুজুরের যেমন ছিল ইলম, তেমন ছিল আমল। হুজুর প্রত্যহ পীরের বাতানো অজিফা আমল করতেন। হুজুরের জীবনে কারামত অকস্মাৎ প্রকাশ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তার বিস্তারিত বর্ণনার আশা রইল। হুজুরের ইন্তিকালটাই একটি আশ্চর্য কারামত। মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূর্বে আসরের আজান হল। এদিকে হুজুরের নাকে অক্সিজেনের পাইপ লাগানো ছিল। আজান কানে আসার সাথে সাথে সবকিছু ছুঁড়ে ফেললেন এবং ইশারায় নামায আরম্ভ করে দিলেন। নামাযান্তে এমন জোরে-জোরে জিকির শুরু করলেন, যাতে উক্ত ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরাও এসে ভীড় জমালেন। এভাবে জিকর করতে করতে তার প্রাণপাখী উড়ে যায় এবং হুজুর অগণিত ভক্তবৃন্দকে ইয়াতীম করে হাসতে হাসতে মাহবুবের দীদারে রওয়ানা হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুজুরের ইন্তিকালে বাংলাদেশ তথা মুসলিম বাংলা এমন এক ব্যক্তিকে হারালো যার শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়; বিশেষ করে ছারছীনার দরবার এমন এক মুহাদ্দিসকে হারালো যার স্থান পূরণ করার মতো বাংলায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি যে, হুজুরের রূহানী ফায়েজের বরকত ও ইলমের তাওয়াজ্জুহ নছীব করুন। তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি দান করুন আইয়ুবী ও ইয়াকুবী সবরে জামিল। আমার বর্তমান পীর ছাহেব কেবলা, আমার আসাতিযায়ে কেরামগণ ও অগণিত ভক্তবৃন্দের অন্তরে দান করুন তাসকীন ও তাসাল্লী; অন্তর থেকে দূর করে দিক সমস্ত বেকারারী, পূর্ণ করে দিক তার শূন্যস্থান। আর তাঁকে সাবের মুহাজির, মুহসীন, মুজাহিদ, ছালেহ ও শহীদানদের দরজা দান করে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন।

লেখক :

অধ্যক্ষ, গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা

স্মৃতির মুকুরে মরহুম খোতানী হুজুর

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক

১৯৮২ সন। মাওলানা ফজলুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া থানার পশ্চিম সৌলজলিয়া দারুচ্ছুন্নাত ইয়াতীমখানায় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ আল্লামা খোতানী হুজুরের মাহফিল প্রোগ্রাম। তাঁর সাথে হুজুরের অন্যতম প্রিয় শাগরেদ আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জনাব মাদারীপুরী হুজুরও ছিলেন। আর এ হতভাগা ছিল তাদের খাদেম হিসেবে। সেই হতেই হুজুরের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে।

ঠিক নির্দিষ্ট সময় সভাস্থলে পৌঁছলে মাহফিলের কাজ যথাযথ সমাধা করে পরের দিন ছারছীনায় আসি। তখন থেকেই হুজুরের আন্তরিক স্নেহ আমাকে এতোই মুগ্ধ করেছে, যা সত্যিই অবর্ণনীয়। من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মর্মবাণীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি তিনি। যেমন বড়দের সাথে আন্তরিক সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতেন, ঠিক তদ্রুপ ছোটদের প্রতিও ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। সাধারণ মানুষও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। একবার যদি কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারতো, সে জীবনেও তাঁর কথা ভুলতে পারতো না। আর এজন্যই তাঁর চির বিদায়কালে কেঁদেছে বহু শিশু, বহু যুবক, বহু ছাত্র, বহু শিক্ষক, এমনকি বহু সাধারণ মানুষও। ভিনদেশি একজন মানুষ হয়েও তিনি এটি অর্জন করতে পেরেছিলেন নিজ আদর্শের বলেই। আমাকে শুধু হুজুরের অন্যান্য আদর্শের সাথে এই মহান আদর্শটাই বিশেষভাবে বিমোহিত করে দিয়েছে।

তাছাড়া ঐ মাহফিলের সময় ইয়াতীমখানা সম্পর্কে আমার সামনে হুজুর কয়েকটি ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, যা এতো তাড়াতাড়ি বাস্তবে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা সত্যি আমাকে আশ্চর্যজনকভাবে বিস্মিত করেছে। যেমন ঐ মাদরাসার জমির ব্যাপারে বলেছিলেন– "আল্লাহর ইচ্ছায় অচিরেই সমস্ত জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" ঠিকই কিছু দিনের মধ্যে কয়েকজন মহান ব্যক্তি এতো অধিক জমি দান করলেন, যা ওখানকার কর্তৃপক্ষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বাস্তবিকই আল্লাহর অলীদের মুখের বাণী বের হবার সাথে সাথে যে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত হুজুরের ঐ কথাগুলো।

আমি ১৯৭৯ সনে ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হবার পূর্বেও হুজুর সম্পর্কে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনেছি। যার বাস্তবতা আমার নয়নাভিমুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠে তার সান্নিধ্যে এসে এই দীর্ঘ সাতটি বছরের মধ্যে। ছারছীনা মাদরাসার প্রাক্তন ভাইস প্রিন্সিপাল হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর একদা এক নিভৃত রজনীতে হুজুরের কক্ষে গভীর আলাপে মগ্ন। এদিকে কোন এক ছাত্র বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে কায়েদ সাহেব হুজুরকে খোঁজ করতে গিয়ে খোতানী হুজুরের রুমে দেখতে পান। কিন্তু সে ইতস্তত হৃদয়ে রুমের দ্বারপ্রান্তে বার বার উঁকি মারছে। সৈনিক মেজাযের অধিকারী খোতানী হুজুর অন্য কিছু ভেবে তাকে বেদম প্রহার করেন। পরক্ষণে তার কাছে বাস্তব ঘটনা প্রকাশিত হলে তিনি যে আদর্শের পরিচয় দেন, তাতে চৌদ্দশত বছর পূর্বের সাইয়েদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন উসওয়াতুল হাসানার বিভাবিত নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম শয্যায় হযরত আব্বাস রা. এর সাথে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। কেননা, হুজুর ঐ ছেলেটিকে কামরায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেন– "ভাই মাই আপকো পিটপর জেতনী জুতা মারা ওয়ছাছী জুতা তু মুজকো পিটপর মারো।" সুবহানাল্লাহ! এতো বড় জ্ঞানের ধারক ও বাহক হওয়া সত্বেও নিজের ভুল স্বীকার করতে এবং তার প্রায়শ্চিত্ত নিতে এতো আগ্রহী, যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর।

১৯৮৬ সালের কামিল পরীক্ষার কাজ সমাধা করে তিনি ঢাকার উদ্দেশে ছারছীনা থেকে বিদায় নেন। একটিবারও ভাবতে পারিনি এটি হবে তাঁর শেষ বিদায়। আসবেন না তিনি ছারছীনার বুকে দরসে হাদীসের মঞ্চ ময়দান অলংকৃত করতে। অবশ্য বিদায় মুহূর্তে তাঁর কলিজার টুকরা ছাত্রদের মাঝে এমন এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন এটিই তাঁর শেষ বিদায়। কিছুদিন যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় খোতানী হুজুর কিডনীর রোগে আক্রান্ত হয়ে অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অপারেশনও চলছে, এদিকে দুআ ও খায়রিয়াতের মুনাজাতও চলছে।

আরোগ্যও লাভ করেছেন। বাসায়ও চলে আসছেন। এমনকি বহু ছাত্রের কাছে ব্যক্ত করছেন যে, ছারছীনা গিয়েই তার দায়িত্বে যাবতীয় সিলেবাস, অতিরিক্ত সময় পড়িয়ে শেষ করে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ করে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো শুনলাম, তার পুনরায় অসুস্থতার খবর। মন বিচলিত হয়ে উঠল। কোন বুঝ কোন কথাই

যেন মন মানতে চায় না। বাঁধনহারা পাখির ন্যায় ছুটে চললাম তাঁর পৌরুষদীপ্ত নূরানী চেহারা মুবারক দর্শন উদ্দেশে। ২০/১০/৮৬ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় উপস্থিত হলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১ নং ওয়ার্ডের ১৪ নং বেডের কাছে। হাসপাতাল কক্ষে প্রবেশ করতে না করতেই হতচকিত হয়ে উঠলাম। এই কী আমাদের খোতানী হুজুর? আচমকা বিচলিত হয়ে উঠলাম। পলকহীন নেত্রে কতক্ষণ তাকিয়ে, আমার সম্বল শুধু অশ্রুজলে বুক ভাসালাম। চাপা কণ্ঠে মেয়েদের কাছে হুজুরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। আবার বিকেল তিনটায় হাজির হলাম হুজুরের কাছে। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আবেগাপ্লুত হৃদয়ে বহু কথা বললেন, বহু আশীর্বাদ করলেন, স্নেহের পরশ বুলালেন আমার শরীরে। মনে হলে আমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি শুধু তাকিয়েই রইলাম। আজ যেন আমার বলার কিছুই নেই, যা চেয়েছিলাম তার চেয়েও যেন অনেক বেশি পেয়েছি। বিদায়ের সময় মায়া বিজড়িত স্নেহাপ্লুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আর তার চোখ থেকে শুধু ঝর ঝর করে ঝরছিল পবিত্র অশ্রু। কে জানতো যে, জীবনের শেষ দেখার জন্যেই এ অশ্রুর প্লাবন।

তাইতো পরবর্তী বৃহস্পতিবার আসার পূর্বেই বুধবার বিকাল ৫ টা ৫ মিনিটের সময় তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এক অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে রেখে, লক্ষ লক্ষ গুণগ্রাহীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসের মাঝে তাশরীফ নেবেন, তা কি একবারও ভেবেছিলম?

লেখক :

অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

খোতানীর র. যুগে খোতানের চিত্র

মুহাম্মদ মাকছুদুল হক

বিশ শতকের বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ‘খোতান’ এর সীংগাঙ নামক স্থানে সম্ভ্রান্ত এক আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে ঐ এলাকাটি ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী শাসনাধীন। তাঁর পিতা, মাতা, দাদা, মামা, চাচারা ঐতিহ্যগতভাবেই ছিলেন আলিম ও শায়খ বংশীয়।

পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। কিন্তু জীবনের মাত্র পাঁচ বছর বয়:ক্রমকালে তাঁর পিতা এবং পরের বছরেই মাতার ইন্তেকাল হলে স্বীয় চাচা ও মামার তত্ত্বাবধানে তিনি স্থানীয় খালাক মাদরাসায় ভর্তি হয়ে বার বছর বয়সের মধ্যেই জ্যোতির্বিদ্যাসহ হিদায়া এর ন্যায় প্রামাণ্যগ্রন্থ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালীন নামকরা বিদ্যাপীঠ “কাশগর” এ আরো সাত বছর অধ্যয়ন করে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ছাত্রজীবনে দেশ ও ঈমান রক্ষার তাগিদে দেশের সকল ছাত্র-যুবাকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হতো। সেই সুবাদে নিয়ায মাখদূম খোতানী র.ও ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১৯৩৩ সালেই তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল দেশ-মাতৃকার সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে। স্বীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্য বলে অল্প দিনেই তিনি হয়ে গেলেন প্রধান সেনাপতি।

দেশ ও ঈমানসহ ব্যাপক বিধ্বংসী কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ চূড়ান্ত লড়াইয়ে টিকতে না পেরে তিন তলার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে অলৌকিক এক ঘোড়ায় চড়ে স্বজন-স্বদেশ সব ত্যাগ করে শেষে তিনি হিজরত করেন ভারতে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৩৫ সালে তিনি ভর্তি হলেন ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়। একান থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ইলমে হাইয়াত, ১৯৪২ সালে প্রকৌশলবিদ্যা, ১৯৪৩ সালে দাওরায়ে হাদীস এবং ১৯৪৪ সালে দাওরায়ে তাফসিরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ

লাভ করেন। ১৯৪৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত এখানেই তিনি উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন।

এদিকে পীরে কামিল আল্লামা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমাদ র. কর্তৃক বাংলাদেশের ছারছীনাতে দেশের প্রথম কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর একান্ত ইচ্ছা এবং তৎকালীন শিক্ষা ও মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ১৯৪৫ সালের ৩০ জুন তারিখে ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ ইং তারিখে ইন্তিকাল পর্যন্ত ৪১ বছর ৩ মাস ২৯ দিন এখানেই তিনি শায়খুল হাদীছ পদ থেকে ইলমে হাদীছের খিদমত করে যান। এখানে এসে সব পরিচয় ছাপিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন হাদীছে নববীর একনিষ্ঠ সেবক। তিনি নিজেই বলতেন; "আমি ইলমে হাদীছের তুলনায় যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বেশি পড়াশুনা করেছি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা আমার সারাটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইলমে হাদীছের খিদমতে।"

তিনি ছিলেন হাদীছ বিজ্ঞানের নিরলস ও নির্মোহ সাধক; আজীবন খাদিম। তাঁর নিকট থেকে সরাসরি ইলমে হাদীছের সনদপ্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ২,৮৫৮ জন। বাংলাদেশের সেরা সব আলিমগণের অধিকাংশই তাঁর ছাত্র বা তাঁর ছাত্রের ছাত্র। "খোতানে" জন্ম বিধায় বাংলাদেশে তিনি "খোতানী হুজুর" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রোক্ত নিবন্ধে আমরা উক্ত খোতানী হুজুর র. এর যুগে তার জন্মস্থান সেই খোতানের সমাজ চিত্র খানিকটা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। ইনশাআল্লাহ।

যেহেতু আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর জন্মস্থান 'খোতান' ছিল তৎকালীন চীনা-তুর্কিস্তানের অংশ, সেহেতু উক্ত এলাকার এবং পার্শ্ববর্তী বুখারা-সমরকন্দের তৎকালীন করুণ ও ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে খোতান এর সমকালীন হৃদয় বিদারক চিত্রও কিছুটা সহজেই আঁচ করা যায়। কেননা, পার্শ্ববর্তী রাজ্য হওয়ায় একই রুশ প্রথার কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা আন্দোলিত ও লণ্ডভণ্ড হয়েছে খোতানও। আর সে সময়ের এসব এলাকার করুণ ইতিহাসের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগি মাওলানা আযম হাশেমী।

আযম হাশেমী সেই সহস্রাধিক তুর্কি মুহাজিরগণের একজন, যারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে পড়ে বাধ্য হয়েছেন স্বদেশ ত্যাগে তথা হিজরত করতে। তিনি আফগানিস্তানের পথ ধরে হিজরত করে চলে আসেন এই উপমহাদেশে এবং বসবাস করতে থাকেন এখানেই। তিনি কোন লেখক বা ঐতিহাসিক নন। কিন্তু ৩৫/৩৬ বছর যাবত তিনি এই হৃদয় বিদারক ইতিকথা সযতনে হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর বন্ধু মহলের অনেকেই তাঁকে সেই রক্তাক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানালেও তিনি তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের দরজা খুলে সেই রক্তমাখা সফরনামা বর্ণনার হিম্মত পাচ্ছিলেন না। ঠিক এই মুহূর্তে যখন উপমহাদেশেও লাল সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা স্যোশালিজমের শ্লোগান বুলন্দ করল এবং পশ্চিমাযাদা মুসলমানরা ছাড়াও এক শ্রেণীর তথাকথিত "মুফতি-মাওলানা" তাদের তল্পীবাহক হিসেবে মাঠে অবতীর্ণ হলেন, তখন এসব দেখে উক্ত আযম হাশেমী শিউরে উঠলেন। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় বদন পুনরায় রক্তাশ্রু ঝরাতে শুরু করল। তিনি দেখলেন বুখারা-সমরকন্দে লাল সাম্রাজ্যবাদীরা যে খেলা খেলেছিল, এখানেও সেই অভিন্ন খেলা শুরু হয়েছে।

সেখানে স্যোশালিজমের ধ্বজাধারী ও গোমস্তা-দালালরা সামাজিক অর্থনৈতিক সমতা-স্বাধীকার ও দীন মজুর এবং মেহনতি মানুষের জন্যে মায়াকান্না কেঁদে ও সমবেদনার শ্লোগান দিয়ে মাঠে নেমেছিল। সাথে সাথে তথাকথিত কিছু মোল্লা মৌলভীও তাদের তল্পীবাহকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিল। তুর্কিস্তানের মুসলমানরা তাদের কাছে চরমভাবে ধোকা খেয়ে যান। তাঁরা স্যোশালিজমকে নিরেট একটি সমাজ ব্যবস্থা মনে করেন। কিন্তু যখন পরিপূর্ণভাবে এই প্রেতাত্মা তাঁদের ওপর সওয়ার হয়, সে যখন মুসলমানদের তাহজীব-তামাদ্দুন, আদর্শ-কৃষ্টি, স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সবকিছু এক ঢোকে গিলে ফেলল, সে মুহূর্তে তথাকার মুসলমানদের "ইয়া লাইতানী কুনতু তুরাবা"- হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম- ছাড়া আর বেশি কিছু বলার ছিল না। তখনই আযম হাশেমী উপমহাদেশের মুসলমানদের বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার মানসে স্যোশালিজমের এপিঠ-ওপিঠ খুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আযম হাশেমী ১৯১৫ সালে ফারগানা (বর্তমান উজবেকিস্তান) এর জিলা আন্দরজানে কায়েকী নামক ছোট্ট একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোজা খান দামলা। সে দেশে ঐ সময় আলিমকে

দামলা বলা হতো। হয়তোবা এটি ইংরেজি ও ফারসি ভাষার শব্দ (দ্যা+মোল্লা=দামলা) সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। আর মোল্লা বা মোন্‌লা তুর্কী শব্দ। এর অর্থ আল্লামা বা মহাজ্ঞানী, সুপণ্ডিত। সারকথা, তুর্কিতে মাওলানাকে দামলা বলা হতো। তাঁর মাতৃবংশ হযরত হুসাইন রা.- এর সাথে সম্পৃক্ত এবং পিতার উর্দ্ধতন পুরুষ বড় আলিম ও নকশবন্দিয়া তরীকার পীর ছিলেন। এগার ভাই-বোনের পরিবারে মা সহ সবাই আরবী-ফারসি জানা বড় মাপের আলিম ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও তাঁরা ছিলেন বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু তুর্কিস্তানের ওপর স্যোশালিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর দ্বীনি শিক্ষা এখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় গোপনেই তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করতে হয়। কারণ, তখন প্রকাশ্যভাবে এখানে দ্বীন শেখার অর্থই ছিল নিজের ওপর জুলুম অত্যাচার এমনকি আজরাঈলকে দাওয়াত দেয়া। কমিউনিস্ট শাসনামলে বুখারা-সমরকন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বড়ই করুণ। জেনারেল শিক্ষা তখন নামে মাত্র ছিল। প্রথমত পাঠের ভাষা ছিল রুশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায় দায়িত্বে ছিল চরমপন্থী ও সঙ্কীর্ণমনা ক্যাথলিক পাদ্রীরা। শিক্ষকতাও করতো এরাই। শিক্ষার প্রচার-প্রসারের চেয়ে খ্রিস্টবাদ প্রচারই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীরা সাধারণত ধর্মহীন ও রুশদের দালাল হতো। এজন্য মুসলমানরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করেছিল।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ লাগে। রাশিয়ান জার শাহীর তখত উল্টে যাওয়ার পর গণতন্ত্রপ্রিয় জাতীয়তাবাদী রাশিয়ানরা আলেকজান্ডার কারেনসকীর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এদিকে তুর্কিস্তানও স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। কারেনসকী সরকার তুর্কিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু তাদের কোন সেনাবাহিনী ছিলনা। বরং মিলিশিয়া (ন্যাশনাল গার্ড) নামে সীমিত পুলিশ বাহিনী ছিল মাত্র। তথাপি দেশপ্রেমিক আলিম ও নেতৃবৃন্দ দেশটির উন্নতি-অগ্রগতিতে দ্রুতগতিতে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কমিউনিস্টরা লেনিনের নেতৃত্বে কারেনসকী সরকারকে উৎখাত করল। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্যোশালিস্টিরা তুর্কিস্তানের ওপর চড়াও হলো এবং দেখতে না দেখতে কয়েকদিনের মধ্যে তুর্কিদের নব্য স্বাধীনতাকে গিলে ফেলল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে তারা বুখারা ও খেওয়া রাষ্ট্র দখল করে নিল।

তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা হরণ করেই কমিউনস্টরা এর জমি-জমা, বাগ-বাগিচা এক কথায় এর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদের ওপর জবর দখল কায়েম করল। কৃষক, ব্যবসায়ী, উলামা ও দীনদার শ্রেণী চাই শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত সকলকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করল। রোযা রাখা এখানে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। হজ্জের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেয়া হলো। মোটকথা, ইসলাম ও মুসলমানদের কোন চিহ্নই না রাখার মিশন নিয়ে তারা মাঠে নামল একেবারে আদা জল খেয়ে।

আগে এখানে মসজিদ-মাদরাসাগুলোর জন্যে অসংখ্য জমি ওয়াক্ফ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা এসেই এসব দীনি প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ-মাদরাসাগুলো বন্ধ করার জন্যে কূট-কৌশলস্বরূপ প্রথমেই এগুলোর ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করলো। এভাবে মসজিদ-মাদরাসাগুলো ভীষণ অর্থ সঙ্কটে পড়ল। অত:পর মসজিদের ওপর বিশাল অংকের ট্যাক্স আরোপ করে বসল। তখন মসজিদের চাঁদা দানকারীদের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হলো যে, যেসব লোক মসজিদে ট্যাক্স আদায় করে, তারা সরকারি খাজনা চুরি করে মাল সঞ্চয় করছে। অন্যথায় তারা মসজিদের ট্যাক্স আদায় করার এত টাকা কোথায় পায়? আমরা সেই সম্পদের তন্ন তন্ন তল্লাশি চালাবো। তারপর দেখবো কারা মসজিদের ট্যাক্স আদায়ের বাহাদুরী দেখায়?

এদিকে মসজিদের ট্যাক্স যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে তা চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকত, যাতে মসজিদ পরিচালনা কমিটি মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়তেন। পরে এক পর্যায়ে মসজিদে নামাযীদের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হলো। পরিণতিতে পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, লোকজন ঘরে নামায পড়তে শুরু করলো। আর মসজিদগুলো বিরাণ হতে লাগলো। কমিউনিস্টরা বাহানা পেল যে, মসজিদে কেউ নামায পড়ছে না। তাই হঠাৎ একদিন ওরা জমায়েত হয়ে ঘোষণা দিত যে, মসজিদটি বেকার পড়ে আছে; কেউ এতে এখন আর নামায পড়ছে না, সে জন্যে সরকার এটাকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। ব্যাস! যেমন কথা, তেমনি কাজ। দ্বিতীয় দিনই সরকারী লোকজন মসজিদটি দখল করে নিত। অত:পর সেটাকে হয় শহীদ করে দিতো অথবা, ক্লাব, আস্তাবল কিংবা খেলাঘর বানাতো।

ছলে-বলে-কূটকৌশলে স্যোশালিস্টরা রাশিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করার কাজে উঠে পড়ে লাগল। দেশের সর্বত্র কমিউনিটি অফিস খুলে নতুন নতুন চাল চালতে লাগল। সর্বস্তরের মানুষের জন্যে তারা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করল। ফলে কৃষক, শিল্পপতি, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী এমনকি দীন-মজুরেরও লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার অনুমতি রইল না। ধার্মিক ও সমাজপতি শ্রেণীর লোকদের লাইসেন্স পাওয়া ভয়াবহ রকমের মুশকিলই ছিলো। লাইসেন্স পেতে হলে তাঁদের হক দ্বীন ও ইসলামের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দিতে হতো। অপরদিকে গুণ্ডা-বদমাশ ও সন্ত্রাসীদেরকে দিনদার শ্রেণীর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হতো। সন্ত্রাসীরা সমাজের নামাযি, রোযাদার ও প্রসিদ্ধ দীনদার ব্যক্তিবর্গকে প্রকাশ্যে-গোপনে নৃশংসভাবে হত্যা করে চলল। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করেও খুনি-সন্ত্রাসীরা বুক ফুলিয়ে জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াত। এভাবে শহীদ করা হলো অসংখ্য অগণিত মুসলমানকে।

১৯২৭ সালের পর হত্যা, গুম, ইসলাম দুশমনী মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। কমিউনিস্টরা মেতে উঠল নতুন নতুন আরো অনেক ভয়ঙ্কর খেলায়। ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধের কালিমা লেপন করতে লাগল। কুরআন, হাদীছ, ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ, হাসি-মজাকপূর্ণ কার্টুন তৈরি করে পথে ঘাটে ও মসজিদে লাগিয়ে দিল। নবী সা. এর পুত:পবিত্র চরিত্র নিয়েও শুরু করল কাঁদা ছোড়াছুড়ি। সিনেমা থিয়েটারে ধৃষ্টতাপূর্ণ ছবি দেখানোর পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো এবং তা দেখা বাধ্যতামূলক করা হলো। এক পর্যায়ে নবী করিম সা. এর কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে চৌরাস্তাগুলোতে স্থাপন করা হলো। আর প্রত্যেক পথচারিকে সেই কাল্পনিক মূর্তিটি জোর পূর্বক দেখানো হতো। মোটকথা, মুসলমানরা এমন একটি কঠিন দুর্দিনের মুখোমুখি হয়েছিল যে, হিজরত অথবা জিহাদ করা ছাড়া তৃতীয় কোন রাস্তা ছিলনা।

আযম হাশেমী বলেন: একদিন আমাদের গ্রামের সব লোককে বড় মসজিদে একত্রিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলো। সাথে সাথে অনুপস্থিত লোকদেরকে কঠিন শাস্তিরও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হলো। ঘোষণামতে গ্রামের সব লোক মসজিদে জমায়েত হলো। সভাপতি শুরুতেই ঘোষণা দিলেন, রূহানী (আলিম-উলামা) লোকেরা চলে যান। উল্লেখ্য যে, নিষ্ঠাবান দ্বীনদার, ধার্মিক বা আলিমগণকে তৎকালীন তুর্কিস্তানে রূহানী বলা হতো। যা হোক, এই ঘোষণার পর অনেক

লোক উঠে চলে গেলেন। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে আওয়ারা, উচ্ছৃঙ্খল ও বদমাশ প্রকৃতির লোকই বেশি ছিল। বাকীরা ছিল মুর্খ ও কমজোর ইমানদার।

যারা চলে গেলেন তাদের নাম লিখে রাখা হলো। এরপর মসজিদের মধ্যেই গীর্জার মতো খ্রিস্টানী কায়দায় বিকট আওয়াজে হঠাৎ ঘণ্টা বাজানো শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর মুসলিম দার্শনিক তকমাধারী একজন মঞ্চে এসে এক ঘণ্টা যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষোদগার করলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। বক্তৃতার সার কথা ছিল, ধর্মের বিশেষত ইসলামের যত বিধি-বিধানের কথা বলা হয়, সব হলো ওসব রূহানীদের বানানো, স্বার্থবাদী কথা। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, হাশর-নশর, জান্নাত-দোযখ, ফিরিশতা ইত্যাদি সবই জুজু বুড়ির গল্পের ন্যায় রূপকথা বৈ কিছু নয়। কমিউনিস্ট পার্টি এসব কিছুকে সমূলে উৎপাটনে বদ্ধপরিকর। বক্তৃতার নামে বক্তার বকবকানি শেষে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কিনা প্রশ্ন করলে আমি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দীপ্তকণ্ঠে বললাম, যাঁরা তোমাদের এসব অপলাপের জবাব দিতে পারে, তাদেরকে তো তোমরা প্রথমেই মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছ। এখানে তোমরা কার কাছে জবাব চাও? এ বুদ্ধ বখ্‌শ্‌রা কি তোমাদের জবাব দিতে পারবে? জোশের সাথে এ কথা বলার পর কিছু সময় মজলিসে পিন পতন নীরবতা বিরাজ করল। পরক্ষণেই চারদিক থেকে ধর ধর ধর- এর আওয়াজ শোনা গেল। যেই কথা সেই কাজ। চতুর্দিক থেকে কমিউনিস্টরা মৌমাছির মত ঘিরে ধরে আমাকে কিল, ঘুসি, লাথি, চড়-থাপ্পর যে যা পারলো মারলো। এতে পরনের কোটটা ফেটে, কাপড় চোপড় ছিড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে পুলিশরা বুটের লাথি মারতে মারতে আমাকে মসজিদের বাইরে ফেলে দিল।

অনেকক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরে ফিরে এলে ছোট ভাই-বোনেরা বিশেষত আম্মাজান খুবই বিচলিত হলেন। কারণ, ইতোপূর্বে স্যোশালিস্ট পুলিশরা আমার চাচাজান, দু মামাজান, একজন ভগ্নিপতি, দুজন খালাতো ভাই এবং বেশ কজন অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ধর্মীয় মুরুব্বী হওয়ার অপরাধে সেই যে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল, আজ অবধি তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। আমার এই সাহসিকতামূলক কার্মকাণ্ডের জন্য (ওদের দৃষ্টিতে ধৃষ্টতা) ১৫ দিন পর ওরা আমার আলিমা মায়ের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়।

পরিস্থিতির আরো ভয়াবহতায় টিকতে না পেরে দীন ও ঈমান রক্ষার্থে আব্বা, দাদা ও নানাজানের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান কিতাবগুলো আমাদের মেহমানখানার মোটা দেয়ালে ৬ ফুট গভীর ও দীর্ঘকায় গর্ত করে তার মধ্যে রেখে প্লাস্টার করে দিলাম। অত:পর আম্মাজানের নির্দেশ ও অনুমোদনে তাঁর নাগরিকত্ব হারানোর ঠিক তেইশ দিনের মাথায় ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের প্রথম তারিখে পরম আপনজন মাতা, ভাই-বোন ও পরম প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরতের পথে পা বাড়াই।

পথে পথে দেখলাম "খোতানে" রোজ ৭০/৮০ জন মানুষ গুম হয়ে যাচ্ছে, প্রখ্যাত আলিমগণকে শহীদ করে দেয়া হচ্ছে। সমরকন্দে দেখলাম, কমিউনিস্টরা কৃষকদের থেকে চাল-ডাল ছিনিয়ে নেয়ার কারণে সেখানে সীমাহীন দুর্ভিক্ষ চলছে। বুখারার গাজদানি মহল্লাতে এসে সুদর্শন একটি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি কতগুলো ইয়াহুদি কমিউনিস্ট পরিবারের মহিলারা এর ভেতরে কাপড় ধুইছে, আর কিছু লোক তাবু টানিয়ে মসজিদের বাকী অংশের দখল নিয়েছে। বাইরে এসে সম্মুখীন হলাম আরো বিব্রতকর পরিস্থিতির।

দেখলাম, একজন পুরুষ তাঁর পেছনে একজন নারী- এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সৈনিক ও কমিউনিস্টদের দুটো দল তাদের পতাকা উঠিয়ে ব্যান্ডের তালে তালে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। মিছিলটি দেওয়ান বৈগী নামক হাউজের কাছে গিয়ে থামলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ তাদের "বে-পর্দা" দিবস। কয়েক বছর পূর্বে এই দিনে লাল সৈন্যরা মুসলিম মহিলাদের থেকে বোরকা ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। আর যেসব মহিলা তাদের বোরকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে এবং তাঁদের অভিভাবকগণকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে শেষ পর্যন্ত বোরকা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি বছর এ দিনটি তাঁরা আনন্দ মিছিল করে বে-পর্দা দিবস হিসেবে পালন করে। মিছিল পরবর্তী মিটিং এ সিদ্ধান্ত পাশ করা হলো যে, দেশের সকল মসজিদে লেনিনের মূর্তি স্থাপন করা হবে।
সারা তুর্কিস্তান জুলুমের যাঁতাকলে পিষ্ট ছিল। কিন্তু বুখারার মুসলিমগণ যেসব জুলুমের শিকার ছিল তা বর্ণনাতীত। ইমাম বুখারীর র. সেই বুখারায় একসময় যেখানে ৮০০ দীনিয়া মাদরাসা ছিল। কিন্তু এখন তার সবগুলোই قال الله تعالى আর قال رسول الله صلى الله عليه وسلم এর আওয়াজ থেকে বঞ্চিত। কোনটি

আস্তাবল, কোনটি গুদামঘর, কোনটি ক্লাব, কোনটি সার্কাস ঘর বানানো হয়েছে। কোনটি আবার ইয়াহুদি ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বাপ-দাদার দেয়া বাড়ি ঘরের ন্যায় ব্যবহার করছে। অনেক মসজিদ ছিল তালাবদ্ধ। (ইসলাম বিদ্বেষী) গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক দেশের সর্বত্র এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছিল যে, নাগরিকদের প্রত্যেকে একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখত। ধর্মীয় নেতাদের কাউকে শহীদ, কাউকে দেশান্তরিত করা হয়েছে। জেলখানাগুলো ছিল দীনদার মুসলমানে ভরপুর। একদিন সুবহি সাদিকের সময় মুয়াজ্জিনের আযান শুনে মসজিদে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আরো দু'জন লোক আসাতে চারজন মিলে জামাতে সালাত আদায় করলাম। জামায়াতে এত নগণ্য উপস্থিতির কারণ হিসেবে জানতে পারলাম যে, রাতে শহরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছিল। মূল ঘটনা হলো, কমিউনিস্টরা ইসলাম বিরোধী একটি মিছিল বের করলে কিছুসংখ্যক তরুণ মুসলিম ক্ষুব্ধ হয়ে কমিউনিস্টদের দু/তিনজন শীর্ষস্থানীয় লোককে হত্যা করে ফেলে। এর পাল্টা জবাবে কমিউনিস্ট পার্টির গুণ্ডা-পাণ্ডা আর লালবাহিনী যৌথভাবে পুরো শহরে গণহত্যা চালায়। যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই তাঁকে হত্যা করেছে। এক পর্যায়ে ঘর থেকে টেনে বের করেও শহীদ করেছে বহু মুসলিম ব্যক্তিকে। সকাল বেলা বুখারার অলিতে-গলিতে শুধু লাশ আর লাশ। আর ড্রেনগুলোতে চলছিল মুসলিম রক্তের স্রোত, যদ্দরুণ মসজিদে মাত্র দুজন লোক এসেছিলেন। এক পর্যায়ে একজন লোক আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুরবানীর খাসী বানাতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তার স্ত্রী ও যুবতী কন্যার দয়ায় তার খঞ্জরের মুখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। তারা এমনকি দম্ভভরে বলে বেড়াত যে, "আমরা খোদাকে বুখারা থেকে বের করে দিয়েছি"। (নাউজুবিল্লাহ)

আসলে তো "হাতি যে দাঁত দেখায়, সে দাতে চিবায় না"। হাজারো পীর-আউলিয়ার দেশ এই তুর্কিস্থান অঞ্চলেও কমিউনিস্টরা প্রথমে তাদের আসল রূপ প্রদর্শন না করে ছলে-বলে-কূটকৌশলে ও শঠতা-প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এ অঞ্চল থেকে আলিম-উলামা তথা দীন-ইসলামকে উৎখাতের আয়োজন করল। তাঁদের এ জঘন্য কর্মের প্রতিবাদ করায় সিরআসিয়া গ্রামের অসংখ্য উলামায়ে কিরামকে গ্রেফতার করে শীর্ষস্থানীয় তিরানব্বই জনকে বাদ দিয়ে বাকীদেরকে সাইবেরিয়ার বরফের দেশে নির্বাসিত করা হলো। আর সেই তিরানব্বই জনকে গাড়িতে করে উষ্ণ শহরের কাছে পর্বতমালায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে এক বস্তা ছোলা ও একটি করে কোদাল দিয়ে সেখানে প্রত্যেক আলিমকে দুফুট গভীর ও পাঁচ ফুট লম্বা

একটি করে গর্ত খুড়তে বলা হলো। মাওলানাগণ সরল বিশ্বাসে গর্ত খুড়লেন। অত:পর নিদের্শ দিল তাতে নামার। নির্দেশ মতো গর্তে নামার সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করা হলো। এভাবে সমস্ত আলিমকে গর্ত খুড়ে জীবিত ও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ কুদরতে অলৌকিকভাবে এক ব্যক্তি বেঁচে রইলেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাটি সরিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে কাশগর হয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন। ১৯৩৫ সনে দিল্লীতে তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে হুবহু এ ঘটনার কথা জানান।

আযম হাশেমী আরো বলেন- ইমাম কারখীর র. মাযারে গমন পথে শুনলাম যে, এলাকার প্রখ্যাত আলিমগণকে কেনার জন্যে রুশরা সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন ব্যর্থ হলো, তখন তাঁদের ওপরও অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে তাঁদেরকে শহীদ করে দিল। তথাপি তাঁরা ঈমানচ্যুত হননি। এই জালিমরাই সে এলাকার প্রখ্যাত আলিম কাজী আব্দুল মজিদ খাঁকে রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে তাঁকে বেঁধে এমনভাবে প্রহার করল, যাতে শুধু তাঁর প্রাণটা বেঁচে থাকে। এরপর জালিমরা তার জখমগুলোতে চুন লাগিয়ে দিয়ে একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে গরম ছাই ঢালতে থাকে আর তাঁকে জিজ্ঞেস করে "এখনো বলো, তুমি আমাদের কথা মানবে, তাহলে ছেড়ে দেব"। তখন তিনি সূরা আদ দাহর এর فاصبر لحكم ربك ولاتطع منهم اثما أوكفورا আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকেন। এর পর তাঁকে এ অবস্থায় চুন দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীনকে ধরে নিয়ে বলা হয়, "যদি আপনি লেনিনকে হযরত মুহাম্মদ সা. এর সমকক্ষ মনে করেন এবং আপন অনুসারীদের মঝে তার শিক্ষা দেন, তাহলে আপনাকে, আপনার সন্তানদিগকে এবং আপনার অনুসারীদেরকে আইনের উর্ধ্বে ঘোষণা দেয়া হবে। যতো বড় অন্যায়ই করা হোকনা কেন, আইনের আওতায় এনে কখনো তাদেরকে বিচার করা হবেনা। হযরত মাওলানা তখন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে, সুস্থ মস্তিষ্কে বলেন যে,"পবিত্র জগতের সাথে মাটির কি তুলনা হতে পারে? লেনিনতো সেই মাটির সমানও হতে পারবেনা, যে মাটিতে নবীজী সা. পবিত্র মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। সে তো চরম জালিম, চরিত্রহীন, বস্তুবাদী।"

মাওলানার এ জবাব শুনে কমিউনিস্টরা তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে একটি উঁচু স্থানে দাঁড় করালো। অত:পর ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচটি গ্রুপ তৈরি করা হলো। এরপর এক গ্রুপ মাথাকে, এক গ্রুপ রানকে, এক গ্রুপ বুককে, এক গ্রুপ কাঁধকে আরেক গ্রুপ হাটুকে নিশানা বানিয়ে সবাই একসাথে ফয়ার শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীর মুবারক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, আর প্রাণ পাখিটি জান্নাতের পথে পাড়ি জমালো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমাম কারখী র.-এর মাযারে যাওয়ার জন্য লঞ্চে উঠে এক কোণে বসে পড়লাম। অর্ধেক যাওয়ার পর এক সশস্ত্র সৈনিক এসে পাসপোর্ট ও পারমিট চাইলো। "আমি একজন ছাত্র। বড় মাযার দেখতে যাচ্ছি, দু একদিনের মধ্যে চলে আসব। কিন্তু কোন পারমিট কার্ডতো নেই"– এ কথা বলতে দেরী, সাথে সাথে সে ধপাস করে আমার মুখে এমন এক থাপ্পড় মারলো, তৎক্ষণাত আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। চোখে কিছু দেখছিনা। মাথা ঘুরতে লাগল। এক কোণায় বসা ছিলাম বলে দুরুম করে দরিয়াতে পড়ে গেলাম। ভাগ্যিস সাতাঁর জানা ছিল। তাই অনেকক্ষণ পানির নিচে ডুব দিয়ে রইলাম। উপরে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সৈনিকটি আমাকে লক্ষ্য করে অনেক গুলি করল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে একটিও আমার গায়ে বিদ্ধ হলো না। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। ২০-২৫ মিনিট অনেকটা বেহুশ অবস্থায় পানিতে ডুবে-ভেসে রইলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি লঞ্চটি বহুদূর চলে গেছে। শরীরে শক্তি পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায়ে আবার বেহুশ হয়ে গেলাম। হুঁশ আসার পর অনেক কষ্টে তীরে উঠলাম। ১৫/২০মিনিট পর সিজদা থেকে উঠে মনে হলো আমি পূর্ণ সুস্থ। কোন রকম দুর্ঘটনার শিকার আমি হইনি। সুবহানাল্লাহ!

পথিমধ্যে একটি কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। দূর থেকে ব্যবসায়ী কাফেলা মনে হলেও কাছে এসে তাদের দেখে রীতিমত বিস্মিত হলাম। কারণ, কাফেলাটি ছিল বন্দী তরুণীদের। যাদের বয়স বার থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে। সবার মুখে-মাথায় ধুলো-বালি। দেখে মনে হচ্ছিল সবাই এক করুণ পরিণতির শিকার। অধিকাংশের পোষাক ছেঁড়া-ফাটা, চেহারা-সুরত দেখে সহজেই মনে হচ্ছিল এরা সবাই কোন বড় ঘরের কন্যা। কাজের লোকদের মত প্রত্যেক মেয়ের হাতেই একটি করে কোদাল ও পায়ে মোটা চামড়ার জুতা ছিল। আনুমানিক

পঞ্চাশজন সৈন্য তাঁদেরকে ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে সবাই কেঁদে ফেলল। বলতে লাগল: আমরা কেউ জমিদারের মেয়ে, কেউ বড় আলিমের মেয়ে, কেউ বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে, কেউবা কোন নেতার মেয়ে। আমাদের সকলের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দেশান্তরিত করা হয়েছে। আমাদের মা-বাবাদের সাথেও এরূপ দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বেঁচে আছেন, কেউ মারা গেছেন। তবে আমরা জানিনা, তারা কে কোথায় এবং কী অবস্থায় আছেন। এখানে দিনে আমাদের দ্বারা ছয় ঘণ্টা আর রাতে চার ঘণ্টা বিভিন্ন ধরনের কাজ করানো হয়।

সমকালীন যুগে সেই এলাকার আরেক করুণ চিত্র বিধৃত হয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দীন মাসিক, মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন এর বর্ণনায়। তিনি বলেন; "বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক শেষ হওয়ার মুহূর্তটিতে মধ্য এশিয়ার উজবেক ও তুর্কমেন হতে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এসব দেশের বহুলোক প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের এ উপমহাদেশে এমনকি বাংলাদেশেও এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য ছিল গণ অত্যাচারের লীলাভূমি। খ্রিস্টান জার সম্রাটদের নির্যাতনের হাত মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলোতেও প্রসারিত হতো। এ জন্য জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন বলশেভিকদের ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়, তখন মুসলিম মধ্য এশিয়াও এ আন্দোলনে সমভাবে শরীক হয়। বিপ্লবীরা অবশ্য এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, বিপ্লব সফল হওয়ার পর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। কিন্তু দেখা গেল, ১৯১৭ সালে বিপ্লব সফল হওয়ার পর কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সেই অঙ্গীকার পালন করার পরিবর্তে খ্রিস্টান প্রাধান্য বিশিষ্ট শ্বেতচর্ম ইউরোপীয় অংশের রুশীয়রা মধ্য এশিয়ার মুসলিম এলাকাগুলোকে জার সম্রাটদের মতোই চিরকাল পদানত রাখার ষড়যন্ত্র কার্যকর করতেই বরং বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যায়ে আন্দোলন সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নেয়। প্রায় এক যুগের এ প্রতিরোধ যুদ্ধে সর্বপেক্ষা বেশি অংশগ্রহণ করেন আলিম-উলামা, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের ধর্মপ্রাণ মুসলিম শ্রেণীটি। কিন্তু সংগ্রাম

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর এ শ্রেণীটিরই হতাবশেষ একটি অংশ প্রায় পর্যুদস্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তিনি আরো বলেন, সে সময় আমাদের এদেশেও যারা এসেছিলেন, তাঁদের থেকে দুজন বিরল প্রতিভাধর পুরুষ এ বাংলায় মনীষার ক্ষেত্রে কালজয়ী প্রভাব রেখে একের পর এক এদেশের মাটিতেই চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। তাঁদের একজন ছিলেন আরবী সাহিত্যের এক মহান দিকপাল প্রখ্যাত কবি আব্দুর রহমান আল কাশগরী র.। তিনি ছিলেন আমার একজন শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এবং আমি পুত্র-পরিজনহীন এ মহান জ্ঞান সাধকের নিকট পুত্রবৎ স্নেহ লাভে ধন্য হয়েছি। আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ প্রথম লাভ করি ১৯৫৩ সালে।

খোতান-কাশগরের সেকালের অনেক তথ্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান উদঘাটন করেছেন উক্ত মাওলানা আব্দুর রহমান আল কাশগরীর জবানীতে। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহিউদ্দিন খান বলেন; বড় ইচ্ছা হতো কাশগরী সাহেবের অতীত জীবন কথা জানবার। কিন্তু সে প্রসঙ্গে কোন কথাই তাঁর মুখ থেকে বের করতে পারতামনা। শুধু এতটুকু জানা গিয়েছিল, চীনা তুর্কিস্তানের কাশগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামন্ত শাসক। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী গণহত্যা এবং পাইকারী নির্যাতনের কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে নিতান্তই কিশোর বয়সে দেশত্যাগীদের কাফেলায় শরীক হয়ে হিন্দুস্তান এসেছিলেন তিনি। পরে লক্ষ্ণৌর নদওয়াতুল উলামার ইয়াতিম খানায় আশ্রয় লাভ করে এখানেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যখন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী, তখন একবার নদওয়ার কোন এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। কাশগরি সাহেব তখন সদ্য পাশ করা তরুণ যুবক। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে শেরে বাংলা তাঁকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করার অনুরোধ জানালে কাশগরী সাহেব সাগ্রহে তা গ্রহণ করেন। কলিকাতা আলিয়া পরে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনিও এর সাথে এখানে চলে আসেন এবং ১৯৭১ সালে এখানেই ইন্তিকাল করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তার মাযার রয়েছে।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আরো বলেন, "আমি লক্ষ্য করতাম, মাঝে মাঝেই তিনি কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন। অনেক সময় একান্তে বসে তাঁকে কাঁদতে দেখেছি। তাঁর এমনি একটা দুর্বল মুহূর্তে একদিন তাঁকে আমি ধরে ফেলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি তাঁর ভার কিছুটা লাঘব করেছিলেন

আমাদের দু/একজনের সামনে তাঁর জীবনের করুণ ইতিহাস কিছুটা বর্ণনা করে। ধরা গলায় বলেছিলেন: 'কাশগরের সর্বাপেক্ষা বড় আমীর ছিলেন আমার আব্বা। তিনি ছিলেন একজন বড় আলিম ও খুব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আমার বড় এক ভাই ও দু'বোন ছিল। বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর সারা দেশের গণ্যমান্য সব মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে আমার আব্বাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে গেল কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীরা। অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে ওরা আমার বড় ভাই এবং দুবোনকেও ধরে নিয়ে গেল। তারা আর ফিরে এলোনা। কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এ খবরও আর উদ্ধার করা যায়নি। আমাদের বাগান, খামার, পশুপাল এবং সহায় সম্পদের সব কিছুই দখল করে নেয়া হয়েছিল। আমাকে এবং আমার আম্মাকে খামারের একটি ছোট বাড়ি দেয়া হলো থাকার জন্য। আম্মা ততদিনে শোক বেদনায় মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। আমার বয়স তখন চৌদ্দ/পনের বছর, ভাল-মন্দ সবকিছুই বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। বিশেষত আমরা যে একেবারে নি:স্ব এবং ধ্বংস হয়ে গেছি, এতটুকু অন্তত বুঝতে পারছি। এমনি অবস্থায় একরাতে আমার এক মামা গোপনে আম্মার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। তিনি খবর দিলেন, কিছু সংখ্যক সাহসী মুসলিম যুবক একটা গোপন দল গঠন করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। উদ্দেশ্য, কমিউনিস্ট সন্ত্রাসীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে হতাবশিষ্ট মুসলমানদের যথাসম্ভব আড়াল করে রাখা এবং তাঁদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র হিজরতের সুযোগ করে দেয়া। তিনি আরও খবর দিলেন, দু'এক দিনের মধ্যেই একটি কাফেলা হিন্দুস্তানের পথে রওনা হয়ে যাবে। আমাকে যেন সে কাফেলার সাথে হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আম্মাকেও দেশ ছাড়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু দুটো বোন এবং বড় ভাইয়ার আশা তিনি তখনও ছাড়েননি। হয়তো ওরা জালিমদের হাত থেকে ছাড়া পাবে অথবা অন্তত একটা খবর আসবে- এই আশায় বুক বেঁধে ছিলেন দিনের পর দিন। নির্ধারিত সময় একটা পুটুলি হাতে দিয়ে আমাকে কাফেলার সঙ্গী করে দেওয়া হলো। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিলনা। সন্ধ্যায় রাতের আবছা অন্ধকারে মা আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। শেষটায় একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বিলীয়মান কাফেলার দিকে।

শেষ বারের মতো মায়ের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম, চিৎকার করে তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমাদের কাফেলাটি তখন পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে

গেছে। আমার পরে যারা দেশ ছেড়ে এসেছিল তাঁদের মুখে শুনেছি আমাকে বিদায় দেয়ার পর মা পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি সেই পাহাড়ী টিলাটার ওপর এসে দাঁড়াতেন। কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় চিৎকার করে ডাক দিতেন, আব্দুর রহমান! আব্দুর রহমান!!

শুনেছি, একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমার মা টিলাটার ওপরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। বিশ্বাস কর, প্রতি সন্ধ্যায় এখনো আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি যেন 'আব্দুর রহমান,আব্দুর রহমান বলে আমাকে ডাকছেন।"

এর পর আল্লামা কাশগরী র. -এর মুখে টুকরো টুকরো অনেক ঘটনাই শুনেছিলাম। মধ্য এশিয়া এবং চীনা তুর্কিস্তানের মুসলমানদের ওপর কমিউনিস্টরা যে অবর্ণনীয় যুলুম অত্যাচার করেছে, সে সবের টুকরো বর্ণনা তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। একদিন সেই বিভীষিকার বর্ণনা সম্বলিত একখানা উর্দু বই তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ বইটি যেন আমি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে,"উসমান বুতরী" নামক সে বইটি আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনি চরম নিষ্ঠুর নির্যাতন আর ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা চালিয়ে পাঁচ কোটি মুসলমানের লাশের ওপরই সেদিন কায়েম হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। আর তার অনলেই দগ্ধিভূত হয়েছিল আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর প্রিয় জন্মভূমি "খোতান"ও।

লেখক :
প্রভাষক, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

আল্লামা নিয়ায মাখদূম তুর্কিস্তানী র.: আমল ও কারামত

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর

ঐতিহ্যবাহী ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ১৯৭৫ ইং সনে আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে একটানা ১৯৮০ পর্যন্ত পড়াশুনা করার সুযোগ হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে বহু অলৌকিক ঘটনা- যা ছারছীনা মাদরাসার মুহাদ্দিস মুদাররিস ও মুফাসসির আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানীর র. থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যার থেকে একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১৯৭৯ ইং সনে কামিল হাদীস বিভাগে পড়াশুনার সময় হতেই ছারছীনা শরীফ সংলগ্ন একটি ফাযিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক পদে খেদমত করার প্রস্তাব আসায় খোতানী হুজুরের নেক পরামর্শে উক্ত মাদরাসায় ১৯৮০ সনে যোগদান করি। একদিন ফাযিল ক্লাসের তাফসীর বিষয়ে পাঠদান অবস্থায় ছাত্রদের থেকে জটিল জটিল প্রশ্নের সম্মুখিন হই। এবং নিজের জানা মতে উত্তর প্রদান করি। যে উত্তরে নিজের মনের আস্থা পুরোপুরি তুলে ধরতে সক্ষম না হয়ে পরবর্তী দিনের সবকে সমাধানের আশ্বাস দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান স্থগিত করি। অত:পর ঐ দিন বিকালে ছারছীনায় উপস্থিত হয়ে পরদিন সকাল বেলা আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ খোতানী হুজুরের স্মরণাপন্ন হয়ে গতকালকের ফাযিল ক্লাসের তাফসীর বিষয়ের প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে হুজুরকে অবহিত করে এভাবে বলি যে, "হুজুর! আপকা খাদেম দরস-তাদরিস কে ওয়াক্ত দেল এধার ওধার কারতা হ্যায় আওর হরকত ভি কারতা হ্যায়। মুঝে লিয়ে দোয়া করনা। হুজুর ইয়ে সুনকর বোলা কে, কেয়া ভাই আপকা দেল এধার ওধার করতা হ্যায়? আভি মেরে পাস আও! আওর খেয়াল কারো কে, খোতানী তোমহারা সাথ হ্যায়। যাও ভাই, তুমকো আল্লাহ রাসূলে পাককি তোফায়েল মে রহমত কারনে ওয়ালা হ্যায়। যাও ভাই, জলদি যাও।"

যার অর্থ এই যে, হুজুর আপনার খাদেম পাঠদান অবস্থায় কেঁপে যায় ও ভয় পায়। একথা শুনে হুজুর বললেন, তোমার হৃদয় মন কেঁপে যায়? আজ খেয়াল করো যে, খোতানী তোমার সাথে আছে। আল্লাহর রাসূলের মেহেরবানীতে ভয় নাই। যাও, তাড়াতাড়ি যাও। অতঃপর মাদরাসায় পৌঁছতে ঐ দিন একটু দেরি হয়ে যায়। গিয়ে শুনি, অধ্যক্ষ সাহেব মাদরাসার দফতরি আদমকে ধমকাচ্ছেন যে, পটুয়াখালীর হুজুর প্রায় ছারছীনায় যায়, মাদরাসায় আসতে দেরি করে।

ইতোমধ্যে আমি ফাযিল ক্লাসে গতকালের তাফসীর বিষয়ের বাকি আলোচনা শুরু করি। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে দীর্ঘ একঘণ্টা কেটে যায়। এক পর্যায়ে আমি দেখি, আমার সাথে খোতানী হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন। বলছেন, বলো ভাই জু ছুয়াল আয়ে, জওয়াব মিলেগা। বলো, কুওয়াত ছে বলো। সুবহানাল্লাহ! আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় ছারছীনা! কতদূর এই ফাযিল মাদরাসা! অবশ্যই খোতানী হুজুর নিজ সবকে থেকেও আমি নালায়েককে নজর দিচ্ছেন। একেই বলা হয় ফেরাসাতুল মু'মেন। এর মধ্যে মাদরাসার অধ্যক্ষ সাহেব এসে আমাকে বলেন, হুজুর অনেক হয়েছে, আর নয়! আজকে তাফসীর বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা আমরা অনেকেই জীবনে শুনি নাই। থামুন! অন্য ক্লাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
এ ছিল খোতানী হুজুরের নিয়মিত কারামতের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

আমার ছাত্রজীবনে আমরা ছারছীনায় এ মন্তব্য করতাম যে, আমরা সব ছাত্র যে অধ্যয়ন করি, তার চেয়ে বেশি মুতালায়া করেন খোতানী হুজুর। দিবারাত্র যখনই হুজুরের রুমে যেতাম, দেখতাম, হুজুর কিতাব মুতালায়া করছেন। মাদরাসা বন্ধের পর খোলার তারিখ শুধু হাজিরাই নিতেন, পড়াতেন না। বলতেন, মুঝে তাজা মুতালায়া নেহি হ্যায়। দরইওজা ইমরোজ সবক নেহি হোগা। বস্তুত হুজুর বলতেন, আমি ত্রিরিশ বছর আগে যে কিতাব দেখেছি তা আজো মনে আছে। তবুও তাজা মুতালায়া না করে পড়াতেননা। কারণ, বিন্দুমাত্র ভুল হলে আল্লাহ মুঝে ছুড়েগা নেহি। এছাড়া হুজুর দীর্ঘ দুই/তিন ঘণ্টা আরেজী ক্লাসে পাঠদান শেষে শরীর জমাট বেধে যেত। এরপর কিছু সময় ব্যায়াম করে রুমে যেতেন। আমরা বলতাম, "হুজুর! আপ আগার দরসকে ওয়াক্ত এধার ওধার করে, রিয়াজাতে জিসমানি করে, তব তো আপকা ইতনা তাকলীফ নেহি হোগা।" হুজুর জওয়াবে বলতেন, "দেখো ভাই, মাই গুনাহগার হো, মেরে জবান ছে ওহী নবীকি হাদীস নিকালতা হ্যায় জু একদফা রাসূলে পাক (সা.) কি যবানছে নিকালা থা। মাই ওহী আওয়াজ কি তা'যীম করতাহো। এ তা'যীম করতে করতে আগার মেরা জান নেকাল জায়ে তো ওসসে বেহতর আওর কোই নেহি হ্যায়।" সুবহানাল্লাহ!
এ ছিল হুজুরের নিয়মিত আমল।

ঐ সময় ছারছীনা শরীফে তিনটি মাহফিল হতো। মাহফিলের সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্বে সর্বোচ্চ পদে পীর সাহেব কেবলার পরেই খোতানী হুজুরের নাম থাকতো। মাঘ মাসের এক মাহফিলে রাত্রি আড়াইটার সময় একদা হুজুর

মাহফিলের খেদমতে রত। ছাত্র ভাইদেরকে বলেন, "কেয়া ভাই! তোমকো ঠান্ডা আতা হ্যায়? তোমহারে লিয়ে মাই চা আওর বিস্কুট লেকে আও? ভাই খেদমত করো, তোমপর আল্লাহকা রহমাত আনেওয়ালা হ্যায়।"

কামিল ক্লাসের সিহাহসিত্তার দরসে কোনো মুহাদ্দিস কোনো বিষয়ে জটিল সমস্যায় পড়লে সকলেই খোতানী হুজুর থেকে সমাধান নিতেন। হুজুর বলতেন, "ভাই, বুখারী শরীফ কি একছো ছে যিয়াদাহ শুরুহাত নেকালা হ্যায়। উস শুরুহাত জিন হাযরাতনে লেক্ষা, ওহী হাযরাত ছে মাই তা'লীম হাসিল কিয়া। সব বাত শুরুহাত কে আন্দার লেক্ষা নেহি। হাম ওহী ক্লাস ছে হাসিল কিয়া থা।" সুবহানাল্লা!

হুজুর যতক্ষণ দরস দিতেন, কখনো পাঠ্য বিষয় ছাড়া কৌতুক, নড়াচড়া, হাসি-তামাশা বিন্দুমাত্র করতেন না। কোনো কোনো সময় হাদীস পড়াতে পড়াতে চোখের পানি ফেলে দিতেন। এ কারণেই ছারছীনায় তরীকতপন্থী সালেকগণ সবকে বিশ্বনবীকে মোরাকাবার হালতে দেখতেন যে, রাসূলে পাক সা. এই আশেকে নবী খোতানী হুজুরের সবক মনযোগসহকারে শুনছেন। এ কারণেই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কামিল মাদরাসার সিহাহসিত্তার দরসের অধিকাংশ মুহাদ্দিস ছারছীনা মাদরাসা থেকে হাদীসের সনদপ্রাপ্ত। হুজুর ছারছীনায় খেদমতে রত অবস্থায় অন্য মাদরাসা-মসজিদ এর খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব আসলেও কখনো উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতেননা। হুজুর বলতেন, এ রকম শরীয়ত ও মারেফাতের খেদমতগাহ আমার জানা মতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই দয়াময় যতদিন রাখেন, এখানেই খেদমত করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

মহান রব্বুল আলামিন হুজুরের এই মুনাজাত কবুল করেছেন। তাই মওত পর্যন্ত ছারছীনা মাদরাসায় হাদীসের খেদমত করেছেন। আল্লাহপাক খোতানী র. কে রাসূলে পাকের সান্নিধ্যে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন। এবং আমাদেরকেও তাঁর নেক নজরে আমল করে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি হাসিল করার তাওফিক দান করুন। আমীন

লেখক :

উপাধ্যক্ষ, কাশীপুর দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ

হাদীসে নববীর এক মহান খাদেম আল্লামা খোতানী র.

অধ্যক্ষ খালিদ সাইফুল্লাহ

তখন আমার বয়স ৭/৮ বছর। আমাদের গ্রামের বহুল পরিচিত ও নন্দিত মাদরাসা-পশ্চিম শৌলজালিয়া দারুচ্ছুন্নাত মুসলিম এতিমখানা, দাখিল মাদরাসা ও হিফজখানা কমপ্লেক্স। এ কমপ্লেক্সের বার্ষিক মাহফিল। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করবেন একজন হাদীস বিশারদ। একজন মুহাদ্দিস। ছারছীনা মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস। যিনি আমাদের কাছে চীনা হুজুর নামে সুপরিচিত। তাঁর প্রিয় ছাত্র আমার আব্বা অধ্যক্ষ আ.ছ.ম. ফজলুর রহমান ও দুই মামা অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম এবং অধ্যক্ষ আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক, এঁদের মুখে প্রায়ই চীনা হুজুরের গল্প শুনতাম। এঁদের আলোচনায় তিনি থাকতেনই। যাহোক যথাসময়ে হুজুর আমাদের গ্রামে আগমন করলেন। প্রথমেই তাশরিফ আনলেন আমাদের নিজ বাড়িতে। সাথে ছিলেন বিখ্যাত মুফতি আ.ম.ম. আহমাদুল্লাহ মাদারীপুরী হুজুর র.।

হুজুরের চেহারা মুবারকের সঠিক অবয়ব আমার মনে অঙ্কিত নেই; তবে তাঁর চেহারার রক্তিম আভা যেন এক জ্বল জ্বলে আলোকময় নক্ষত্র। যার বিচ্ছুরণ আমার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত রোশনাই করে যাচ্ছে। সাথে সাথে আরও একটি নসীহতপূর্ণ দর্শন-*"মানুষ কামিল হতে তিনটি জিনিস দরকার-হাফেজ হওয়া, আলিম হওয়া এবং হাজী হওয়া"* যা তিনি উর্দু ভাষায় তাঁর প্রিয় ছাত্র আব্বাকে প্রদান করেছিলেন। আজও এই দর্শনপূর্ণ নসীহত তিনটি পাথরে খোদাই করা কোন কারুকার্যের ন্যায় আমার হৃদয়পটে সোনালি বর্ণে লিপিবদ্ধ আছে এবং আমরণ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কে এই চীনা হুজুর? কে এই মহান মুহাদ্দিস? তিনি আর কেউ নন; তিনি হচ্ছেন উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.। যার পূর্ণ নাম হচ্ছে আল্লামা নিয়ায মাখদূম আল খোতনী আততুর্কিস্তানী র.। হাদীসে নববীর এ মহান খাদেম মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল খোতানের সিংগাঙ (পূর্বনাম ইচলিকো শহর) নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ মুহাম্মাদ সিদ্দীক, পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। যাঁরা উভয়ই দেশ বরেণ্য আলেম

ও মুফতি ছিলেন। তাঁর আম্মা সাইয়্যেদা আয়েশা খানম ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারের মেয়ে। খোতান এলাকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ ছিলেন খোতানী হুজুরের মামা। ইলমের স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তায় পরিপূর্ণ দুটি উচ্চবংশের ধারা এক মোহনায় সম্মিলনের স্বর্ণ ফসল এই নিয়ায মাখদূম খোতানী র.।

দেখতে দেখতে দিন, মাস, বছর পেরিয়ে ফুটফুটে, তুল-তুলে শিশু নিয়ায চার বছরে উপনীত হলে লেখাপড়ার প্রথম ছবক দেয়া হয়। পিতা-মাতাসহ আত্মীয়-স্বজনের আদর-স্নেহের মাধ্যমে ছোট্ট নিয়াযের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। যেখানে দুঃখ-কষ্টের সামান্য স্পর্শও ছিল না। ছিল না কোন কিছুর কমতি। কিন্তু এইত নিয়ম-নীতি, জীবনে যারা বড় হবেন তাঁদের জীবন পথে তো আর ফুল বিছানো থাকে না! থাকে না নরম-কোমল গালিচা বিছানো! থাকে অগণিত, অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটা। যেগুলো সতর্কভাবে একটি একটি করে উপড়ে ফেলে সামনে এগুতে হয়, হতে হয় প্রত্যয়ী, সংযমী এবং মনযিলে মাকসুদে পৌঁছার একরাশ স্বচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার অধিকারী।

যা হোক, আল্লামা খোতানী যখন পাঁচ বছরের বালক তখন তাঁর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্রয় পিতাকে হারান। পিতৃশোক কাটাতে না কাটাতে এক বছর পর তাঁর মাতাও দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। নিয়াযের চারদিকে অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে আসে। এ যেন সুন্নাতে রাসূলের এক বাস্তব নমুনা। ছয় বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পিতৃ-মাতৃহারা হয়ে চাচার কাছে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ঠিক তদ্রুপ নিয়ায র.ও পিতৃ-মাতৃহারা হওয়ার পর আপন চাচার কাছে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। চাচার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় খালাক নামক মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ফারসী ভাষা বিশেষভাবে দখল করে নেন।

জীবন আকাশে আবারো কালো মেঘ। বিকট আওয়াজে বজ্রপাত। যার ছোবলে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হন তিনি অন্য আরেক জগতে। যে জগতে কেবল মারামারি, হানা-হানি, রাক্তারক্তি। তিনি দেখলেন কমুনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় নিতে চলছে। খোদাদ্রোহী কমিউনিস্ট হায়েনারা মুসলমানদেরকে খতম করার নেশায়

উন্মাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করছে। ইসলামী ঐতিহ্য বহন করে এমন সব মাদরাসা, মসজিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে সিনামা হল, ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। যার রক্তে হযরত ওমর, খালিদ, আলী রা. মুজাহিদগণের শিক্ষা, তেজ, তিনি কি আর বসে থাকতে পারেন? না, তিনি বসে থাকলেনও না। সেনা বেশ ধারণ করলেন। হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন। মুখে তাওহীদের জয়ধ্বনি আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খোদাদ্রোহী হায়নাদের দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মেধা ও ইখলাসের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে তিনি সেনা-নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু তাঁর মিশনের শেষ রক্ষা হলো না। সঙ্গী, সাথীগণ প্রায়ই শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেছে দেখে ভাবলেন একাকী জীবন দানে কোন গৌরব নেই, আবার সুসংগঠিত হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে পিছু হাঁটলেন।

এবার আল্লামা খোতানী র. আপন মাতৃভূমি থেকে হিজরত করত সুন্নাতে নববীর অরেক অনুসরণ করে সুদূর খোতান থেকে হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতে আসেন। প্রায় এক বছর ভবঘুরে হয়ে থাকলেন। নিজের লক্ষ্য সামান্যতম বাস্তবায়নের পন্থাও খুঁজে পেলেন না। আর পাবেনই বা কি করে, স্বয়ং প্রভুইতো তাঁকে দিয়ে গোলা-বারুদের যুদ্ধ করাবেন না, যুদ্ধ করাবেন জ্ঞানের রাজ্যে, জয় করাবেন জ্ঞান রাজ্যের বিশাল বিশাল চূড়াগুলো। যাহোক আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তিনি জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হৃদয় নিয়ে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার আজহার দারুল উলুম দেওবন্দে এসে হাজির হন। অতঃপর একের পর এক না জানা, অল্প জানা বিষয়ের কালো পর্দাগুলো অকপটে তুলে ফেলে উড়িয়ে দিলেন সোনালি পর্দা। হয়ে গেলেন জ্ঞানের রাজ্যে বিজয়ী সোনালি শাহজাদা। ২৯ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালে সেখানকার সকল বিষয় থেকে মহাকৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দেওবন্দে তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী, হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা ইযায আহমদ প্রসিদ্ধ ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা খোতানী র. এর সনদের দিক থেকে ইমাম বুখারী র. ছিলেন তেইশতম শায়খ।

১৯৩৮ ঈসায়ী, কলিকাতার বাইরে আর কোন টাইটেল মাদরাসা ছিল না। প্রথম টাইটেল খোলা হয় বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা মারকাজ ছারছীনা আলিয়া

মাদরাসায়। টাইটেল খুলেই প্রয়োজন পড়ে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের। ছারছীনা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা নেছারুদ্দীন আহমদ র. সিদ্ধান্ত স্থির করে দারুল উলূম দেওবন্দে চিঠি লিখলেন মুহাদ্দিস চেয়ে। সেখান থেকে আল্লামা খোতানী র. কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৫ সনের এক সোনালি ক্ষণে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছারছীনা এসে হাজির হন। পীর মরহুম হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন ছাহেবসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে গ্রহণ করে নেন। এতদিন যে রত্ন দিয়ে নিজ হৃদয়-মন পরিপূর্ণ করেছিলেন, এবার তা বিলাবার পালা। শুরু করলেন দরসে হাদীস; ভীড় জমাতে লাগল বাংলার আনাচ-কানাচ থেকে হাজার হাজার হাদীস শিক্ষানুরাগী। তাঁর দরসে হাদীস জ্ঞান লাভ করে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের সংখ্যা ২,৮৫৮ জন। এছাড়া অল্পদিন পড়তো অথবা কোন না কোনভাবে ছাত্র– এর সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত। যারা আজকের নিজ দেশসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. শুধু বড় শিক্ষাবিদই ছিলেন না, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁর বাস্তব নমুনা হিসেবেও তিনি ছিলেন জ্বল-জ্বলে তারকার ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অধ্যায় আপন ছাত্রদের মধ্যে আজও দিবালোকের ন্যায় অম্লান হয়ে আছে এবং আমরণ থাকবে।

হাদীসে নববীর এ মহান খাদেম আল্লামা খোতানী র. ১৯৮৬ সনের ২৯ অক্টোবর ৫টা ৫মি. এর সময় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। দিনটি ছিল আখেরী চাহার শোম্বার বরকতময় দিন। মৃত্যুকালে তিনি সাত কন্যাসন্তান রেখে যান। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কি সৌভাগ্য তাঁর; এখানেও তিনি রাসূলের জীবন কর্মের সুন্নাতের পাবন্দ হিসেবে মাকবুলিয়াত পেয়েছেন। তাই আজ প্রত্যয় হোক, এ মহান মনীষীর অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে হাদীসে নববীর খেদমত তথা প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার।

লেখক :
অধ্যক্ষ, ভুঁইঘর দারুচ্ছুন্নাহ্ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

খোতানী হুজুরের মাযারে কিছুক্ষণ

মুহাম্মাদ জান্নাতুন নাঈম

৬ জুন ২০১৪ ইং। সকাল বেলা দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য ও স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল হুজুর আমাকে ডেকে বললেন, বিকেল বেলায় তিনি আমাকে নিয়ে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর মাযার যিয়ারত করবেন। আমি ঠিক সময়ে হুজুরের অফিস রুমের সামনে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুজুরও সঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সিএনজি চালকের আসতে দেরী হচ্ছিল। আমরা তাই অপেক্ষার সেকেন্ডগুলো গুণতে লাগলাম। কখন আসবে সিএনজি! কখন পৌছব কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে! একেকটি সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল একেকটি ঘণ্টা। এভাবে কয়েক হাজার সেকেন্ড অতিবাহিত হওয়ার পর সিএনজি এল। আমরা সিএনজিতে উঠলাম।

হুজুরের চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ। মুখে তেমন কথাবার্তা নেই। যখন আমরা সানারপাড় এলাকা অতিক্রম করছিলাম, তখন আমাদের সামনেই একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটল। মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর তখন উচ্চকণ্ঠে আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করলেন। এছাড়া যাবার পুরোটা সময় মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর আমার সাথে একটু-আধটু কথা বললেন। বাকী সময়ে তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন। সিএনজি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার দিয়ে শাঁই শাঁই গতিতে ছুটে চলল আপন গন্তব্যের উদ্দেশে। আমি অবাক চোখে দেখছিলাম বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর সুন্দর সুন্দর মাসজিদে সমৃদ্ধ আমাদের রাজধানী শহর ঢাকাকে। এ ঢাকা একটি বরকতময় প্রাচীন নগরী। এর স্থানে স্থানে আছে অসংখ্য আলেম-উলামা, গাউছ-কুতুব, পীর-মাশায়েখ এবং অলী-আল্লাহর মাযার। ইচ্ছে করলেই রাজধানীবাসী এসব অলী-আল্লাহর মাযারে গিয়ে বিপুল বারাকাত হাসিল করতে পারেন। আর আমরা বরকত লাভের উদ্দেশেই ছুটে চলেছি মহান অলীর মাযার প্রাঙ্গণে। অনেক সময় ইমাম শাফেয়ী র.ও বরকত লাভের উদ্দেশে ছুটে যেতেন ইমামে আযম আবু হানীফা র. এর পবিত্র মাযার প্রাঙ্গনে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, নিশ্চয়ই আমি ইমাম আযম আবু হানীফা র. হতে বরকত হাসিল করি। যখন আমার কোন সমস্যা দেখা দেয়, আমি তাঁর মাযার শরীফে এসে প্রথমে দু রাকাত নামায আদায় করি। অতঃপর তাঁর উসিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের নিকট সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রার্থনা করি। ফলে তা অতি তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যায়। (মুকাদ্দিমা, শামী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম আজীমপুর বাসট্যান্ডে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে একটু এগুলেই আজীমপুর পুরাতন কবরস্থান। আর এ কবরস্থান থেকে সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত আজীমপুর নতুন কবরস্থান। হাজার হাজার কবরবাসীর শেষ আশ্রয়স্থল এখানে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। কর্তৃপক্ষ এটিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এখানেই শুয়ে আছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আল্লামা খোতানী হুজুর র.। প্রিন্সিপাল হুজুর সিএনজি থেকে নেমে ধীর কদমে আল্লামা খোতানীর মাযারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে।

আল্লামা খোতানী হুজুরের মাযারটি একবারে ছিমছাম। তবে এ ছিমছামের মধ্যেই রয়েছে প্রবল এক গাম্ভীর্য। ব্যক্তিজীবনেও আল্লামা খোতানী র. ছিলেন বড়ই সাদামাঠা জীবনের অধিকারী এক কিংবদন্তি মহাপুরুষ। সাধারণের মধ্যে থেকেই তিনি আপন জ্ঞানে, গুণে, প্রজ্ঞায় এবং দূরদর্শীতায় হয়ে উঠেছিলেন বড়ই অসাধারণ। ছোট্ট পাথরে আরবী ও বাংলাভাষায় খোদাই করা আছে তাঁর নাম, দরসগাহ এবং জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। মাযারটি বাঁধাই করা হয়েছে ধবধবে সাদা টাইলস দিয়ে। ইলমে হাদীস এবং ইলমে তাসাওউফের নূরে উদ্ভাসিত আল্লামা খোতানী হুজুরের বিশুদ্ধ এবং সফেদ অন্তরের জানান দিচ্ছে এ টাইলসগুলো। আল্লামা খোতানী সারাটি জীবন ইলমে হাদীসের সাধনা করেছেন। ইলমে হাদীসের সঠিক দীক্ষা গ্রহণ এবং প্রদানই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম।

আল্লামা খোতানী হুজুর র. এর মতো হাদীস বিশারদদের জন্যেই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসখানা; হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ.
অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির চেহারাকে (কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে মুখস্ত করে, অতঃপর তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৬৬২)

আল্লামা খোতানী হুজুর র. বর্তমান যুগের তথাকথিত ইসলামি স্কলারদের মতো ছিলেন না। যে স্কলাররা জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হলেও আমলের ব্যাপারে বড় উদাসীন। তিনি ছিলেন উচ্চমার্গের মস্ত বড় এক অলী। দিনের বেলায় তিনি মগ্ন থাকতেন দরস ও তাদরীসের খেদমতে, আর রাতের বেলায় নিমগ্ন হতেন মহান প্রভুর ইবাদত-বন্দেগীতে। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন পবিত্র কুরআনে কারীম। ইশরাক-আওয়াবীন ছুটতো না তাঁর কখনো। অর্থাৎ, ইলমে তাসাওউফচর্চাতেও তিনি ছিলেন

এক মহান নীরব সাধক। এ মাযারের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে তাঁর সে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অনুভব করা যায়। মাযারটি ধুলাবালিমুক্ত পরিচ্ছন্ন। আল্লামা খোতানীও ছিলেন পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী। শারীরিকভাবে তিনি সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা থেকে দূরে থাকতেন। আবার আত্মিকভাবেও তিনি হিংসা, অহংকার, লোভ, ক্ষোভ, ক্রোধ, পরনিন্দা, লৌকিকতা প্রভৃতি অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত থাকতেন। খোতানী হুজুরের মাযারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর কিছু পুষ্প বৃক্ষ। বৃক্ষগুলো জানান দিচ্ছে, আল্লামা খোতানী এখন যেখানে আছেন, সেখানেও আছে কিছু বৃক্ষ। জান্নাতী বৃক্ষ। আল্লাহ সে বৃক্ষগুলো দ্বারা তাঁর প্রিয় বান্দাকে বেহেশতি ছায়ায় সিক্ত করছেন।

প্রিন্সিপাল হুজুর প্রথমেই আপন উস্তাদের দরজা বুলন্দির উদ্দেশে কিছু তেলাওয়াত করলেন। এরপর দরুদ শরীফ পাঠ করলেন। তারপর প্রিয়তম উস্তাদের উসিলা দিয়ে হাত তুললেন মহান রাব্বুল আলামীনের আলীশান দরবারে। আপ্লুত হৃদয়ে মহীয়ান সকাশে নিবেদন করলেন মনের সকল আকুতি। শিশুদের মতো করে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। আমি নিশ্চল-নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে রইলাম হুজুরের দিকে। আল্লাহর দরবারে কী আবেগাকুল প্রার্থনা! কী হৃদয়স্পর্শী কাকুতি-মিনতি! আপন উস্তাদের রূহানী ফায়েজ ও তাওয়াজ্জু লাভের জন্যে মহান প্রভুর নিকট কী অভিব্যক্তি! হে আল্লাহ! এ অধমসহ সমস্ত পাঠকের ভাগ্যেও যেন জোটে এ ধরনের বিনম্র-প্রার্থনা।

পাঠক! এখানে এসে শুধু প্রিন্সিপাল হুজুর-ই প্রার্থনা করেন না। এখানে এসে মহান আল্লাহর দরবারে মনের মিনতি তুলে ধরেন খোতানী হুজুরের আরো অনেক শাগরেদ, ভক্ত এবং অনুরক্ত। তারা এখানে এসে দুআ করে তৃপ্ত হন। বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এ.এইচ.এম.ইয়াহইয়ার রহমান স্যারের নিজ মুখ থেকে শুনেছি, তিনি প্রায়ই এ মাযার প্রাঙ্গণে আসেন, আল্লাহর কাছে উস্তাদের উসিলা দিয়ে আপন আরজি পেশ করেন এবং অন্যরকম এক প্রশান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেন। এছাড়া প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.র.ম. আলী হায়দার মুর্শেদী স্যারের কথা শুনেছি প্রিন্সিপাল হুজুরের মুখ থেকে। প্রফেসর মুর্শেদী হচ্ছেন আল্লামা খোতানীর একান্ত প্রিয় স্নেহধন্য খাস শাগরেদ। তিনি একবার আপন উস্তাদের বিয়োগ-বেদনা ও বিচ্ছেদ-বেদনা সইতে না পেরে ছুটে এসেছিলেন এ মাযার প্রাঙ্গণে। পরম ভক্তি সহকারে যিয়ারত করেছিলেন আপন উস্তাদের পবিত্র মাযার শরীফ। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন

গোলাপের খুশবু। তবে এ খুশবু পৃথিবীর কোন গোলাপবৃক্ষের ছিল না। এ খুশবু এসেছিল জান্নাতের বাগান থেকে। পূর্ণ বিশ্বাস আর বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে যারা হুজুরের মাযার যিয়ারত করতে আসেন, তারা এখনো অনুভব করেন জান্নাতী ফুলের সে অমৃত খুশবু।

আল্লামা খোতানীর মাযার যিয়ারত শেষে প্রিন্সিপাল হুজুর আমাকে নিয়ে গেলেন উপমহাদেশের আরেকজন বরেণ্য বিদগ্ধ আলেমে দীন আল্লামা কাশগরী র. এর মাযারে। মাযারটি খোতানী হুজুরের মাযারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। আল্লামা কাশগরী ছিলেন আল্লামা খোতানী হুজুরের দূর সম্পর্কীয় ভাই এবং বাল্যবন্ধু। আল্লামা খোতানী হুজুর যে বিভীষিকাময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশ-ভূমি ছেড়ে ভারত-ভূমিতে হিজরত করেছিলেন, আল্লামা কাশগরী সে এক-ই পটভূমিতে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লামা কাশগরীর জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত আল্লামা খোতানী ছিলেন তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন সভাপতি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আন্তরিক অনুরোধে আল্লামা কাশগরী খোতানী হুজুরকে উৎসাহিত করেছিলেন ছারছীনাতে আগমনের জন্যে। তাই বলা চলে, বাংলার মাটি খোতানী হুজুরের পদস্পর্শ পেয়ে ধন্য হবার পেছনে অন্যতম কারণ আল্লামা কাশগরী র.। তাই আল্লামা কাশগরীর প্রতিও রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং দুআ ও প্রার্থনা।

আল্লামা কাশগরীর মাযারটি অবলোকন করে আমরা ফিরে আসছিলাম সিএনজির উদ্দেশে। প্রিন্সিপাল হুজুর তখন বললেন, আজ তো খুবই অল্প সময় খোতানী হুজুরের মাযার যিয়ারত করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতাম। আল্লাহর অলীর উসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতাম। সাহায্য প্রার্থনা করতাম। এছাড়া প্রিন্সিপাল হুজুর দারুননাজাতে অবস্থান করেও বারবার আপন উস্তাদের মাযার যিয়ারত করছেন। কঠিন সব বিপদ-আপদ থেকে খুব সহজেই উদ্ধার পাচ্ছেন খোতানীর মাযারে খোতানীর উসিলা দিয়ে দুআ করার কারণে। সত্যিই এ এক বিস্ময়কর খোতানীভক্তি! এক আশ্চর্য উস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্ক!

খোতানীভক্তির আরো কয়েকটি নজির এখানে দেয়া দরকার। খোতানীকে তাঁর রূহানী সন্তানেরা ভালোবাসে বিধায় প্রতি বছর-ই জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম। জাতীয় দৈনিকগুলোতে তাঁকে নিয়ে লেখা হচ্ছে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাঁকে চির অমর করে রাখার জন্যেই তাঁর রূহানী

সন্তানেরা গঠন করেছে আল্লামা নিয়ায মাখদূম স্মৃতি সংসদ, আল্লামা নিয়ায মাখদূম সেবক সমিতি এবং আল্লামা নিয়ায মাখদূম রিসার্চ একাডেমি। আল্লামা খোতানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীনী বিদ্যাপীঠ দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসায় নির্মিত হয়েছে মনোরম আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ভবন।

পাঠক! ইন্তেকালের ২৮ বছর পর আজ অবধি কেন এ মনীষী হাজারো তালিবে ইলম, আলেম-উলামা আর বিদগ্ধজনদের উষ্ণ ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন এবং অনন্তকাল ধরে সিক্ত হতে থাকবেন? উত্তর একটাই। আল্লামা খোতানী হুজুর ভালোবেসেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর অনন্ত অক্ষয় পবিত্র বাণীসমূহকে। নীরবে নিভৃতে করে গেছেন হাদীসশাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারের নিরলস সাধনা। আর সে সাধনায় সাফল্য লাভের উদ্দেশেই তিনি আলেম-উলামাদের ভালোবেসেছেন। তালিবে ইলমদের মমতা করেছেন। দুঃখী-অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অপরকে শ্রদ্ধা করেছেন। অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়েছেন। অপরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন এবং অপরের কল্যাণ-চিন্তায় অস্থির হয়েছেন। অনেক দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছেন। তিনি প্রায়স বলতেন, আমার দুঃখ-কষ্টগুলো যদি একত্র করে পাহাড়ের ওপর রাখা হতো, তাহলে পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এখানে তাঁর সে পবিত্র ভালোবাসা, নির্মল মমতা আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তির কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হল।

দেশের অন্যতম আলেমে দীন, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিস ও মুফতী, আল্লামা খোতানী র. এর প্রিয় শাগরেদ এবং একনিষ্ঠ সহকর্মী আল্লামা আ.ম.ম.আহমাদুল্লাহ র. একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই খোতানী হুজুর বারবার প্রিয় এ ছাত্রকে দেখতে আসতেন। এসে দেখতে পেতেন ছোট্ট এক কিশোর আমাদের মুহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর পরম ভক্তি ভরে মাদারীপুরী হুজুরের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাই তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে কামিল জামাআতে দরস দান বন্ধ করে দিলেন। কারণ, সিনিয়র ছাত্ররা উস্তাদের খেদমতে নিযুক্ত হয়নি। খেদমত করছে ছোট্ট এক কিশোর। কামিল জামাআতের ছাত্ররা তাদের ভুল বুঝতে পেরে খোতানী হুজুরের কাছে মাফ চাইতে গেলেন। খোতানী হুজুর তখন তাদেরকে মাফ চাওয়ার জন্যে অসুস্থ মাদারীপুরী হুজুরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সে ছাত্ররা মাদারীপুরী হুজুরের কাছে এলে, মাদারীপুরী হুজুর আবার তাদেরকে পাঠিয়ে দেন খোতানী হুজুরের কাছে। কারণ, খোতানী হুজুর কষ্ট

পেয়েছেন, তাই তারা যেন হুজুরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তখন তারা আবার কান্নাচোখে খোতানী হুজুরের কদমে লুটিয়ে পড়ে। পাঠক! আলেমের জন্যে এ কষ্ট পাওয়া কি ভালোবাসা নয়!

খোতানী হুজুর র. একবার স্থানীয় এক মাহফিলে গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকজন তাঁকে এক ছড়া কলা হাদীয়া দিয়েছিলেন। খোতানী হুজুর কয়েকদিন পর তাঁর ব্যক্তিগত খাদেমকে দিয়ে আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুরকে ডেকে পাঠালেন। আপত্যস্নেহে রূহানী সন্তানকে কলা খাওয়ালেন। আরেকবার প্রিন্সিপাল হুজুর জরুরী এক প্রয়োজনে বাজারে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে আসতে হোস্টেলের খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। রুমের জানালায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর থেকে খোতানী হুজুর তখন প্রিন্সিপাল হুজুরের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। প্রিন্সিপাল হুজুর রুমে পৌছলে খোতানী হুজুর তাকে ডাকলেন। প্রিন্সিপাল হুজুর তাঁর কাছে গেলে বললেন, "এখন তো হোস্টেলের খাবারের সময় শেষ হয়ে গেছে। হোস্টেলের খাবার তো তুমি এখন পাবে না। আমার রুমে খাবার আছে। তুমি এখান থেকে খেয়ে নাও।" প্রিন্সিপাল হুজুর তখন তাঁকে অনেক করে বোঝালেন যে, কোন অসুবিধা নেই, খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু খোতানী হুজুর ছিলেন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল হুজুর তাকে বললেন, "আমি বাজারে যাওয়ার সময় আমার এক রুমম্যাটকে আমার খাবার তুলে রাখার জন্যে বলে গিয়েছি। সে আমার খাবার তুলে রেখেছে। আমি সেখান থেকে খেয়ে নেব।" অতঃপর হুজুর তাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত গিয়ে রুমে খেতে বললেন। এই তো শাগরেদের প্রতি উস্তাদের মমতা!

খোতানী হুজুরকে তাঁর শাগরেদরা খুব ভালোবাসতো। তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো একটুখানি দুআ নেয়ার জন্যে। ১৯৮৩ সনে দাখিল পরীক্ষা দেয়ার সময় আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুরও প্রতিটি পরীক্ষার আগে তাঁর থেকে দুআ নিতে যেতেন। তখন এতো সহিংস হরতাল-অবরোধ ছিল না। তাই একাধারে প্রতিদিন ১০ টায় পরীক্ষা শুরু হতো। প্রিন্সিপাল হুজুর ৯ টা কি সোয়া ৯ টার দিকে খোতানী হুজুরের নিকট যেতেন। তিনি বেশির ভাগ সময়েই মাছ দিয়ে ভাত খেতেন। কাটাহীন ঝামেলামুক্ত শিং ও মাগুর মাছ ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। প্রিন্সিপাল হুজুর যাওয়ার সাথে সাথে তিনি খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিতেন। অতঃপর মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বলতেন, ফী আমানিল্লাহ, আল্লাহ কামিয়াব করে। পরীক্ষা শেষে আমাদের প্রিন্সিপাল হুজুর খোতানী হুজুরের কাছে গেলে তিনি বললেন, "ভাই মাই হার তোলাবা কি লিয়ে দুআ করতে হো, লেকিন আপকে লিয়ে খাছ দুআ করতে

হো। মেরা উমিদ হায়কে আল্লাহ আপকে দরজায়ে আউয়ালমে কামিয়াব করে গা।" অর্থাৎ, ভাই আমি সকল ছাত্রের জন্য দুআ করি কিন্তু তোমার জন্য বিশেষভাবে দুআ করি। আমি আশা করি আল্লাহ তোমাকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ করবেন। পাঠক! শাগরেদের জন্যে এ প্রাণভরা অকৃত্রিম আন্তরিক দুআও তো এক প্রকার ভালোবাসা। এ ভালোবাসার বিপরীতে ভালোবাসা ছাড়া আর কী হতে পারে? মহীয়ান আল্লাহও দুআর চাদরে ঢাকা উস্তাদের সে শুচি শুভ্র পবিত্র ভালোবাসাকে কবুল করেছেন। শিক্ষাজীবনে প্রিন্সিপাল হুজুর ১৯৮৩ সনে দাখিল, ১৯৮৫ সনে আলিম, ১৯৮৭ সনে ফাযিল এবং '৮৯ সনে কামিল অর্থাৎ, সবগুলো কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যয়ন শেষে অর্জন করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ওপর উচ্চতর বি.এ.অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি। আর কর্মজীবনেও তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান দারুননাজাত প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সারা দেশে প্রথম স্থান অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছে। এ পর্যন্ত দারুননাজাত সারা দেশে ২০১৪ সনে আলিম পরীক্ষায়, ২০১২ সনে ৫ম সমাপনী ও ৮ম সমাপনী পরীক্ষায় এবং ২০১১ সনে অনার্স আলকুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, খোতানী হুজুরের রূহানী ফায়েজ ও তাওয়াজ্জুহর কারণে দারুননাজাত আরো উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

আল্লামা খোতানী হুজুরের কক্ষে কেউ প্রবেশ করলে তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। ছাত্র, সহকর্মী বা সাধারণ কোন মানুষ এলেও দাঁড়াতেন। তিনি তাঁর এক ছাত্র থেকে কিছু বাংলা বর্ণমালা শিখেছিলেন। তাই আশ্চর্য! যখনই সে ছাত্র তাঁর সে কামরায় প্রবেশ করতো, তখনই তিনি উঠে দাঁড়াতেন। আর উপস্থিত সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতেন, 'এ আমার উস্তাদ' বলে। ছাত্রের প্রতি উস্তাদের এ স্নেহের সম্মানবোধ বিরল। এছাড়া আল্লামা খোতানী কর্তৃক উর্দুভাষায় লিখিত প্রফেসর ড. এ.এইচ.এম.ইয়াহইয়ার রহমানকে প্রদত্ত পত্রগুলো পড়ে বোঝা যায়, কতটা সম্মানপূর্বক বিনয়-নম্র, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় ছাত্রকে সম্বোধন করতে হয়! তাই আমরা নতুন প্রজন্মের ছাত্ররা ভাবি, আগের যুগের শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের প্রাপ্য স্নেহটুকু দেয়ার পরও অতিরিক্ত সম্মান করতেন বিধায়, আজ তাঁরা এতো স্মরণীয়, এতো বরণীয় এবং এতো গ্রহণীয়! হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফীক দিন এ মহান আদর্শ গ্রহণের।

পরিশেষে বলতে চাই, হৃদয়ের প্রশস্তি ও জ্ঞানের বিস্তৃতির কারণেই শাইখুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. আজ আমাদের সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধা ও

নিখাদ ভালোবাসার পাত্র। আর আপন সাধনা ও রিয়াযতের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন নিম্ন-লিখিত হাদীসটির বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আমীরুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ - قَالَ - فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ - قَالَ - ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرْضِ.

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আকাশের অধিবাসীরাও তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর সে বান্দার জন্যে যমীনেও স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। আর যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামও তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর এবং আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। অতঃপর তার জন্যে যমীনেও ঘৃণা স্থাপন করা হয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৪৭৮৪)

আল্লামা খোতানীকে বাস্তবে কখনো দেখিনি। কখনো শুনিনি তাঁর কোমল কণ্ঠস্বর। স্পর্শ করিনি তাঁর নূরানী হস্তদ্বয়। ধূলি নিতে পারিনি তাঁর মুবারক পদযুগলের। তারপরও তাঁর স্নেহের শাগরেদের সাথে বিমল এক ভালোবাসা নিয়ে ছুটে এসেছি এ পবিত্র মাযার প্রাঙ্গণে। কিন্তু কেন? উত্তর খুবই সহজ। আল্লামা খোতানী তাঁর ইলমে হাদীসের সাধনা ও রিয়াজত বলে এতো উচ্চমার্গে পৌঁছেছেন যে, আজও শত সহস্র মানুষ তাঁর ভালোবাসায় আপ্লুত। আমি তাদের-ই একজন।

লেখক :

শিক্ষার্থী, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

فضل الله الغني في ترجمة نياز مخدوم الخوتني رحـ.

محمد عبد اللطيف شيخ

التقديم :

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى علماء أمته من الفقهاء والمفسرين والمحدثين . وعلى من سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد فقال الله تعالى : {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الأعراف: ١٧٦] وقال الإمام سفيان: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة،[الزهد لأحمد بن حنبل (ص: ٣٢٦)]

والمترجم العلامة نياز مخدوم لا أشك فيه أنه كان من الصالحين . فذكره إن شاء الله يكون سببا لنزول الرحمة . وبيان قصة حياته يكون وسيلة الفكرة والعبرة . لهذا أخذت القلم و قصدت كتابة بعض الجهات من حياة العلامة وإن لم أكن أهلا لها . لأني أحبه . ولله در القائل : أحب الصالحين ولست منهم ، لعل الله يرزقني صلاحا. أردت أن أكتب وليس عندي ما أكتب ، لأني لم أراه، فلا أعلم من حياته المنورة أكثر مما يعلمه قراء التراجم . نعم وجدت بعض تلاميذه الذين تنوروا بنوره الكريم و استفاضوا بفيضه العميم و تعلموا بتعليمه العظيم فصاروا لنا أسوة وفي معرفة حياته أمثلة . وكتبت في هذه العجالة مما وجدت منال يدي مستفيدا من المكتوبات في حياته الكريمة من الكتيبات والمقالات. وهناك رسالة الماجستر في الفلسفة حول حياته التى كتبه بعض زملائي .الا و هو محمد مقصود الحق . محاضر مدرسة دارالنجاة الصديقية للكامل . وقد استفدت منها كثيرا . ولله الحمد . وحان أوان الشروع . فافتتحت المقالة باسمه تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل. واعلموا أيها القرأ الكرام أنه بعد التفحص والتتبع في حياته يوجد أن حياته الكريمة منقسمة في ثلاثة مراحل . وهي

١- المرحلة الأولى : حياته في مولده أعني في وطنه تركستان الشرقية.

٢- المرحلة الثانية : حياته في الهند أعني في دار العلوم ديوبند وهي حياة الدراسة العليا له.

٣- المرحلة الثالثة : حياته في باكستان الشرقية ثم بنغلاديش أعني في سرسينة المشرفة وهي حياته الطويلة و الأخيرة وكان في هذه المرحلة في خدمة الحديث النبوي الشريف إلى أن توفي.

فنحن إن شاء الله نذكر أطوار حياته و مراحله على التوالى فيما يلى مختصرا والله الموفق والمعين . وهوحسبي ونعم الوكيل.

المرحلة الأولى من حياة العلامة الخوتني

قد ذكرنا من قبل أن المرحلة الأولى من حياته هي حياته في مولده ، و تشتمل هذه المرحلة ولادته و تعريف أسرته و تعاليمه الأبتدائية و بعض حياته العملية . وبيانها أيها القراء الكرام فيما يلى :

مولده :

ولد شيخ الحديث أستاذ الأساتذة العلامة نياز مخدوم الخوتني رحمه الله تعالى في مقام "شينغانغ" في منطقة "خوتن" من تركستان الشرقية ، سنة ١٩١٤م على الأصح في أسرة شريفة مسلمة متدينة مولعة بالعلوم الدينية. وقال الدكتور مستفيض الرحمن كانت ولادته سنة ١٩١٧م نظرا إلى جوار السفر الذي كان عنده في بنلاديش . و رجح الدكتور عبد الرشيد أن ولادة الخوتني كانت سنة ١٨٩٧م ورجح الباحث مقصود الحق أن ولادة الشيخ الخوتني كان في عام ١٨٩٧م بناء على أن حرب كاشغر وقعت سنة ١٩١٥م. ولكن الصحيح الذين ذكرنا أن ولادته كانت سنة ١٩١٤م لأنه اشترك "حرب كاشغر" ضد الشيوعين سنة ١٩٣٣م ووإن كانت الحرب ابتدأت سنة ١٩١٥م وذلك بعد ان درس في مدرسة كاشغر سبع سنين وقد التحق فيها وله ١٢سنة من عمره على ما سيأتي . فالحاصل أن له ١٩سنة حين اشترك حرب كاشغر . فإن ولد سنة ١٨٩٧م أو سنة ١٩١٧م فكيف اشترك حرب كاشغر سنة ١٩٣٣م في التاسعة عشر من عمره. وإن كانت ولادته سنة ١٩١٤ كما في جواز السفر الذي عنده وهو في الصين فهذا يلائم. لأنّ ١٩١٤+١٩= ١٩٣٣ . ولأنه ذهب إلى دار العلوم سنة ١٩٣٥م و ذلك بعد

الهزيمة في حرب كاشغر الثانية و بعد احتلال الشيوعين حصن "يانغ حسن" في أبريل سنة ١٩٣٤م فهذا يلائم مع التواريخ الأخرى. وإن حسبت ولادته سنة ١٩١٧م أو سنة ١٨٩٧م فلا يلائم هذا مع تاريخ التحاقه بدارالعلوم سنة ١٩٣٥م بعد حرب كاشغر في التاسعة عشر من عمره. وإن صدق أنه اشترك حرب كاشغر سنة ١٩١٥م فماذا فعل بعد الحرب تقريبا ٢٠عاما قبل التحاقه بدار العلوم سنة ١٩٣٥م؟ فالصحيح أن ولادته كانت سنة ١٩١٤ كما حققه المدير أبو الخير محمد أبو بكر الصديق نظرا إلى جواز السفر الذي كان عنده وهو في الصين. فتاريخ هذا الجواز يكون مقدما على تاريخ الجواز البنغلاديشي. لأنه أقدم. وقد وافق على هذا التحقيق المحامي صديق الرحمن و بنت الشيخ الخوتنى خالدة صديقة.

نسبه و أسرته :

كان العلامة نياز مخدوم سليل أسرة نبيلة معروفة بِ "الشيخ" . وكان أبوه من رجال الدرجة العالية في خوتن . فإن أهل خوتن حينئذ كانوا على أربع درجات كما قال الباحث محمد حيدر وهي (١) الفلاحون (٢) الجيوش (٣) الأعراب المتجولة (٤) العلماء والعملة . وكان أبوه الشيخ محمد صديق و جده الشيخ محمد رحمة الله من أبرز العلماء و المفتين في خوتن . وأمه السيدة عائشة خانم كانت أيضا من سلالة العلماء البارزين هناك . وكانت متدينة صالحة زكية. و خاله الشيخ أحمد كان قاضي القضاة في خوتن . وكان خاله الآخر أيضا محدثا بارزا في تلك المنطقة . وكانت أسرته ذات ثروة هائلة . لأن لهم تجارة الحرير والديباج. ولهم مصنع يصنع فيه الحرير الثمين . و يصدر الحرير و السلك المصنوع منه إلى الهند و غيرها من البلدان . فللشيخ الخوتني حسب و نسب عالٍ . فكان رفيع القدر من جهتي الأب والأم . وكان له خمسة إخوان وهم : (١) الشيخ محمد يوسف (٢) والشيخ محمد أبو بكر (٣) والشيخ محمد على (٤) والشيخ محمد تخنة أحمد (٥) والشيخ محمد عمر رحمهم الله و أربع أخوات أيضا و هن (١) حليمة خانم (٢) سارة خانم (٣) نثار خانم (٤) سليمة خانم رحمهن الله تعالى . و أكثرهم ماتوا قبل وفاة الخوتني .

الطفولية والتعليم الابتدائي:

الطفولية والتعليم الابتداالطاالطفبيد أن أسرة الشيخ الخوتني كانت ذات أموال كثيرة و ثروة هائلة مع كونها متدينة نشأ الشيخ جيدا في حجر الوالدين. وابتدأ التعليم الابتدائي في أسرته . لكن القدر غلب عليه فمات أبوه الشيخ محمد صديق وقد بلغ الخامسة من عمره فقط. ثم ربته أمه الشفيقة بتربية حسنة، إذ جاءها أجلها و صار نياز مخدوم الخوتني يتيما في الحقيقة وهو ابن ست سنوات فقط . ثم تكفل له عمه الشيخ محمد قاسم . فنشأ الخوتني تحت حجره والتحق بمدرسة محلية مسماة بِ " خَلَاك" . و حصل الشيخ الخوتني في هذه المدرسة علم اللغة الأمية والعلوم الضرورية الإسلامية من القرآن والسنة والفقه والأصول والأدب والقواعد واللغة الفارسية واللغة التركية . ونجح في كل امتحان بالدرجة الممتازة . ودرس الشيخ الخوتني في هذه المدرسة إلى جماعة شرح الجامي .

حصول العلوم العالية :

ولما فرغ الشيخ الخوتني عن حصول العلوم الإسلامية الابتدائية بمدرسة "خلاك" . أحس في قلبه عطشا شديدا لحصول العلوم العالية في الإسلام فذهب إلى مدرسة "كاشغر" المشهور في ذلك الزمان على مسافة ثلاثة عشر ميلا من خوتن و له حينئذ اثنتا عشرة سنة . فدرس هناك سبع سنوات متواليا و تبحر في التفسير والحديث والفقه والعقائد والأصول والأدب العربي والقواعد والهندسة وغيرها من العلوم العقلية و النقيلة لاجتهاده في حصول العلم و نجح في كل امتحان في الدرجات الممتازة . وكان الشيخ الخوتني تعارف هناك مع عظماء منهم الأديب المشهور مولانا عبد الرحمن الكاشغري رحمه الله .

زواجه :

ولما انتهت دراسته في مدرسة كاشغر تزوج الشيخ الخوتني ابنة خاله الشيخ أحمد الخطيب وله إذ ذاك تسع عشرة سنة . و ولدت له هذه الزوجة ولدا ذكرا ولكن الشيخ الخوتني لم يمكن له رؤية وجه ابنه . لأنه كان مشغولا في الجهاد ضد الشيوعيين لإنقاذ الإسلام والوطن عن الشيوعية . ولم يجد الشيخ فرصة قط لرؤية وجه زوجته و ابنه منها . لأنه

سمع بعد أيام أن زوجته ماتت عند وضع ابنه و مات الابن أيضا بعد موت أمه بأيام . وكانت هذه الحادثة أحزنت قلب الشيخ الخوتني جدا . ولم يقدر نسيانها حتى مات .

حصول العلوم العسكرية و الالتحاق في الجيش الإسلامي :

لما أحس الشيخ الخوتني أن الشيوعيين تدخلوا على أمور وطنه و أرادوا أن يؤثروا على تهذيبه و تمدنه و شعر الشيخ أهمية حرية الوطن و استقلال الإسلام فهم أنه لا بد له من تعليم عسكري . فالتحق بالجيش الوطني و تعلم العلوم العسكرية كلها بجد و جهود . ولما رأي الخوتني ظلم الشيوعيين عزم أن يكون مجاهدا و ينقذ الوطن والإسلام من أيد الشيوعيين إن شاء الله . لهذا اجتهد الشيخ واهتم بهذه العلوم و في أيام قليلة نالت منصب القائد بمهارته و تجربته .

الشيخ الخوتني في ميدان الجهاد :

وكان الشيخ الخوتني تركي الأصل . فكانت له شجاعة عظيمة . وقد ذكرنا آنفا أنه تعلم العلوم العسكرية لإنقاذ البلاد من أيدي الكفار الشيوعيين . فالتحق في الجيش و صارت قائدا في أقل الأوقات . وكان أهل الصين الكفار الشيوعيون يظلمون على المسلمين في تركستان الشرقية وكانوا قد احتلوها والشيخ الخوتني اشترك في الجهاد ضد الشيوعيين. واتحد مسلمو خوتن و مسلمو المناطق القريبة منها ضد الشيوعيين . وأعد الشيخ الخوتني جيشا عظيما بسعي نفسه و حمل على الأعداء مع أعوانه وغلب على الأعداء. ويقال لهذه الحرب "حرب كاشغر" وذلك سنة ١٩٣٣م. ثم حاول الأعداء مرة ثانية. وسمع الشيخ خبرا محزنا بأن الكفار يأتون إلى المسلمين للحملة عليهم . . فاستعد الشيخ مرة ثانية للجهاد وكان في حصن "يانغ حسنّ . فحاصر الأعداء الحصن شهرا . وأرسل الخوتني إلى مناطق لطلب المعونة ولكن المعونة لم تصل إليه للحصار و انتهى الزاد الموجود في الحصن . ودخل الأعداء في الحصن بعد كسر الجدار وحملوا على جيش الخوتني . دفع الخوتني و أعوانه حملة الأعداء حسب الإمكان لكنهم في آخر الأمر فشلوا و استشهدوا كلهم إلا الشيخ الخوتني . أنقذه الله برحمته لعمل آخر عظيم . ألا هو خدمة الحديث الشريف.وذلك كان في أبريل سنة ١٩٣٤م

الهجرة :

فلما مات جميع أعوان الخوتني بحملة الأعداء اضطر الشيخ الخوتني فنزل من الحصن . حتى إذا جاء خارج الحصن رأي فرسا مسرجا قائما . فركب الفرس و أجراه شديدا . وطرده الأعداء من خلفه . ولكن الله أنقذه من العدو حتى جاء إلى شاطئ نهر غير معروف بعد أن أجرى الفرس يومين أو ثلاثا متواليا . فلما نزل من الفرس مات الفرس لكثرة التعب و استراح تحت شجرة حزينا . فنام نومة للتعب الشديد . فرأى في النوم أن رجلا صالحا يدعوه ليذهب إلى الشاطئ الآخر . فلما استيقظ لم يتفكر إلا أن نزل في النهر و عبره بالسباحة . ثم ذهب من ذلك المكان و ارتحل كثيرا حتى وصل إلى سهارنفور . وكانت نيته ان يلتحق في كلية الطب للحكيم المشهور أجمل خان ولكن الله يريد أن يخدم به أحاديث نبيه . فوجد الشيخ الخوتني كلية الطب في العطلة وذهب إلى ديوبند والتحق بمدرسة دار العلوم للدراسة العليا في التفسير والحديث و غيرهما من العلوم الإسلامية . ومن هنا ابتدأت المرحلة الثانية من حياة العلامة نياز مخدوم الخوتني رحمه الله .

المرحلة الثانية من حياة العلامة الخوتني

الالتحاق بدار العلوم ديوبند :

ولما وصل الشيخ الخوتني إلى منطقة سهارنفور وعلم أخبار دار العلوم و شهرتها عزم على أن يلتحق فيها . فذهب إلى دار العلوم و كلم مع أصحاب الإدارة فأخبروه أنه يجب عليه أن يشترك في امتحان القبول و ينجح فيه و أعلموه أن الامتحان في حقه يكون من كتاب شرح الجامي . فاستعار كتابا من بعض الأساتذة و طالع في ليلة . وفي الصباح دعي الخوتني لامتحان القبول وكان الممتحن ذلك الأستاذ الذي استعار منه الخوتني كتاب شرح الجامي. فلما سأل الأستاذ عن بعض المسائل المشكلة من كتاب شرح الجامي أجاب الخوتني فورا كما كتب الأستاذ في حاشية كتابه . فتعجب الأستاذ لفرط قوة حفظه وقال: أ حفظت كل الحواشي في ليلة واحدة . فأجاب أن : نعم . ثم التحق الشيخ الخوتني في دار العلوم و بدأ يدرس و يحصل العلم.وذلك سنة ١٩٣٥م

الدراسة في دار العلوم :

بعد الالتحاق في دار العلوم جعل الشيخ الخوتني يتلقى العلوم بالرغبة الكاملة حتى صار معروفا عند الأساتذه بقليل من الأوقات. و كان أصحاب إدارة دار العلوم ينفق عليه نفقاته الدراسية لنجاحه في كل امتحانات داخلية بالامتياز. وكان يسكن في " الدار الجديدة" احد مساكن الطلاب في دار العلوم . وفي هذا الوقت صحب العلماء الأفاضل منهم القاري طيب صاحب، رئيس دار العلوم و الشيخ حسين أحمد المدني، محدث دار العلوم . وغيرهم من الأساتذة الجهابذة الآتي أسماؤهم.

الأساتذة الذين تلقى عنهم الشيخ الخوتني في دار العلوم:

وأساتذته الأعزة الذين تلقى عنهم الشيخ الخوتني في دار العلوم منهم (١) الشيخ القاري طيب صاحب رحـ. (٢) الشيخ مولانا حسين أحمد المدني رحـ (٣) الشيخ مولانا أنوار الشاه الكشميري رحـ (٤) الشيخ مولانا إعزاز علي (٥) الشيخ مولانا إدريس الكندهلوي (٦) الشيخ مولانا إبراهيم البلياوي (٧) الشيخ مولانا بشير أحمد (٨) الشيخ مولانا عبد السامي (٩) الشيخ مولانا حفظ الرحمن وغيرهم .

العلوم التي تبحر فيه الشيخ الخوتني في دار العلوم وفي غيرها:

إن الشيخ الخوتني حين درس في دار العلوم ديوبند المشهور بأزهر الشرق تبحر في علوم عديدة وهي : التفسير و علومه و الحديث و علومه والفقه و أصوله و العقائد والكلام والمنطق والبلاغة والحكمة والهندسة . ودرس الطب عند الحكيم أجمل خان وعلم الهيئة عند فننا لال وهما أيضا من علماء الهند.

التخرج من دار العلوم :

كان الشيخ الخوتني التحق في دار العلوم سنة ١٩٣٥م على أصح الأقوال و تخرج منها سنة ١٩٤٤م ونال شهادة دورة الحديث والتفسير والهندسة والهيئة من دار العلوم بالدرجة الممتازة . وكان مدة دراسته في دار العلوم عشر سنين. وقد صار بعد تخرجه

معينا للمدرسين في دار العلوم حسب عادة دار العلوم . حتى أتى سرسينة سنة ١٩٤٥م في شهر يونيو.

الكتب التي درس الخوتني في دار العلوم:

(١) تفسير الجلالين (٢) تفسير البيضاوي (٣) تفسير الكشاف (٤) تفسير روح المعاني (٥) تفسير ابن كثير (٦) صحيح البخاري (٧) صحيح مسلم (٨) جامع الترمذي (٩) سنن النسائي (١٠) سنن أبي داود (١١) سنن ابن ماجة (١٢) شمائل الترمذي (١٣) الموطأ لمالك (١٤) شرح معاني الآثار (١٥) مشكاة المصابيح (١٦) كتاب الهداية (١٧) نور الأنوار (١٨) التوضيح والتلويح (١٩) مسلم الثبوت (٢٠) شرح العقائد النسفية (٢١) الأمور العامة (٢٢) السراجي في الفرائض (٢٣) شرح المطالع (٢٤) المقامات الحريرية (٢٥) ديوان المتنبي (٢٦) ديوان الحماسة (٢٧) القطبي (٢٨) سلم العلوم (٢٩) المبدع في الفلسفة (٣٠) رسالة سكندر زاهد في الفلسفة (٣١) التصريح في الهئية (٣٢) شرح الزاغوني في الهئية (٣٣) سبع الشداد في الهئية (٣٤) بنت باب في الهئية (٣٥) الأقدلس في الهندسة (٣٦) الموجز في الطب (٣٧) الفوائد المبيئة (٣٨) المقدمة الجزرية (٣٩) هدية الوحيد . وهذه الثلاثة الأخيرة في علم التجويد .

بعض القصص الرائعة في الحياة الدراسية للخوتني :

وكانت حياة الشيخ الخوتني مملوءة بالعجائب حتى حياته الدراسية أيضا. وفيها نصيحة غالية لطلاب العلم في هذا الزمان . قال الشيخ الخوتني نفسه " أني عندما وجدت فرصة كنت أذهب إلى الأساتذة لخدمتهم . وكنت كثيرا ما أكون في صحبة الشيخ حسين أحمد المدني و الشيخ إبراهيم البلياوي . وفي كل مساء كنت أذهب في خدمة الشيخ القاري طيب صاحب و أذاكر معه في أمور العلم حتى العشاء. أحيانا أغسل أقمصة أساتذتي و أحيانا أحتطب لهم للطبخ . وكان الخوتني يقول: كان مدير الطعام يعطيني خبزين خبزين في كل صباح و مساء وهذه الأخبزة الأربعة كان لي طعام يوم واحد في أوائل أيامي في دار العلوم ولكني أحسست كثرة النوم لكثرة الطعام فانقصت من طعامي المقدر خبزا

خبزا في كل صباح و مساء. وجعلت أكل خبزين طول اليوم بدل الأربعة. فنقص نومي و وجدت للدراسة فرصة كثيرة . " وكان الشيخ الخوتني لا يغيب عن الفصل أبدا. فسأله بعض تلاميذه في سرسينة "ألم يصبك يا استاذي مرض قط فتغيب؟" فقال: نعم، ذات وقت أصابتني الحمى شديدا حتى لم أقدر أن آكل شئيا منذ يومين ولكني مع ذلك لم أغب عن الفصل بل كنت حضرت الفصل و جلست خلف الطلاب متكيا بالجدار و متزملا بالبطانية. و ذات يوم أصابتني رمد العين حين كنت في جماعة المشكاة فمنعني الطبيب عن القراءة في الضوء . فلم أقدر أن أقرأ إلا بعض صفحات من مشكاة المصابيح ولكن الله رحمني فنلت الدرجة الأولى في الامتحان السنوي مع أني لم أكتب إلا ما سمعت في الفصل من أفواه الأساتذة. هذا كله ببركة دعاء أساتذتي و لمواظبتي في الفصل .والحمد لله .

المرحلة الثالثة من حياة العلامة الخوتني

كانت المرحلة الثالثة من حياة العلامة نياز مخدوم الخوتني في سرسنة المشرفة في بلاد العلامة نثار الدين رحمه الله تعالى أعني في باكستان الشرقية ثم بنغلاديش و ذلك من سنة ١٩٤٥ إلى أن توفي سنة ١٩٨٦م. وفي خدمتكم بيان ذلك على التدريج.

تاريخ قدوم الخوتني إلى سرسينة لخدمة الحديث :

وكان الشيخ نثار الدين أحمد رحمه الله الذي هو الخليفة الأول لمجدد الزمان أبي بكر الصديقي الفرفروي أسست مدرسة دينية لقراءة القرآن بأمر شيخه سنة ١٩١٢م فجعلها مدرسة ابتدائية سنة ١٩١٥م ثم جعلها مدرسة عالية على التدريج و أجرى فيها درس الحديث سنة ١٩٣٨م و وافقت عليها الحكومة سنة ١٩٤٤م.وكان في البداية يدرس فيها الحديث الشيخ مولانا عبد الجليل بيشواري و مولانا نور عالم بهاري و مولانا سعد الله ولكنهم تركوا الخدمة و ذهبوا. ثم جاء محدث ممتاز من دار العلوم اسمه عبد الستار البهاري سنة ١٩٤٥م. فخدم الشيخ في هذه المدرسة حتى عام ١٩٦٥م. وكان هذا الشيخ الأخير أعني عبد الستار البهاري من زملاء العلامة الخوتني. و هو الذي أشار الشيخ نثار الدين رحمه الله ليأتي بالعلامة الخوتني من دار العلوم . فرضي الشيخ نثار

الدين عن اقتراحه الجميل . و كتب رسالة إلى دار العلوم ليرسل محدثا إلى سرسينة لخدمة الحديث النبوي الشريف . و تكلم مع أسد البنغال ابي القاسم محمد فضل الحق ليشفع في هذا الأمر . فكلّم أسد البنغال مع عبد الرحمن الكاشغري أحد أصدقائه و رئيس علماء المدرسة العالية الحكومية بدكا. وكان الأديب الماهر عبد الرحمن الكاشغري صديقا للعلامة نياز مخدوم و من أبناء وطنه . فالتمس الكاشغري الخوتني لإتيانه. حتى إذا وصلت رسالة الشيخ نثار الدين رحـ إلى دار العلوم في طلب المحدث و انتهى بحوث العلامة الخوتني هناك . جلس أساتذة دار العلوم مع الخريجين و حرضوهم ليذهب أحدهم إلى بريسال في بنغلاديش لتدريس الحديث . ولكن الطلاب لما سعموا عن بيئة بريسال أنها منطقة ذات أنهار كثيرة و أشجار عديدة وأن سرسينة قرية غير معروفة لم يرضوا حتى إذا يئس الأساتذة قام الشجاع البطل الشيخ الخوتني و أظهر رضاءه ليذهب إلى بريسال لخدمة الحديث فقط لمحبة صاحب النبوة شفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وسلم . ففرح الأساتذة لرضائه و سُرّوا سرورا.لكن الخوتني طلب منهم الإجازة لأيام قليلة للبحوث في علم الحديث . فقال أساتذة دار العلوم : "اذهب يا بني ! ما تعلمت إلى الآن فدار العلوم نفسها محتاجة إليك." وبعد إجازة الأساتذة ارتحل الخوتني و وصل سرسينة في وقت مبارك سنة ١٩٤٥م في شهر يونيو.

تعيين الخوتني رئيس المحدثين و ملاقاته مع الرجل الذي رآه في المنام :

فلما وصل الشيخ الخوتني إلى سرسينة فرح الجميع و عينه الشيخ نثار الدين أحمد رحمه الله رئيس المحدثين لمدرسته .و اشترك الشيخ في العمل في ٣٠ من شهر يونيو سنة ١٩٤٥م وخدم لعلم الحديث حتى وفاته سنة ١٩٨٦م طول واحد و أربعين (٤١) عاما. وهذا هو الصحيح و الراجح ولا يلائم ما قيل أنه جاء سرسينة ١٩٤٦م مع أقوال الباحثين . لأنهم أجمعوا على أنه خدم الحديث طول ٤١ عاما. وهذا العدد موافق مع مدة خدمة أول من جاء في بنغلاديش بالحديث . ألا وهو شيخ الحديث شرف الدين أبو توامة البخاري رحمه الله . وإنه أيضا خدم الحديث طول ٤١عاما. وكلاهما جاء في البلاد من

البلاد الأجنبي . مات كلاهما أيضا في هذا البلاد , ورقد كلاهما في العاصمة . فشرف الدين في العاصمة القديمة " شونارغاون" و الخوتني في العاصمة الجديدة " دكا" أعني في المقبرة الجديدة في عظيمبور . وجدير بالذكر أن الشيخ الخوتني لما وصل سرسينة و رأي الشيخ نثار الدين أحمد تعجب و تفكر كيف يمكن أن يكون هذا ؟ لأنه لما جلس تحت شجرة في شاطئ النهر للاستراحة وقت الهجرة من تركستان حين طرده جنود الشيوعيين فنام نومة و رأى في المنام هذا الرجل الصالح و أنه كان يقول له في منامه : "لا تخف! اعبر النهر و تعال". فلما شاهده واقعيًا واتفق منامه و مشاهدته مع الواقع فرح فرحا عظيما و شكر الله كثيرا. وأحس الخوتني مقام الشيخ نثار الدين أحمد في العالم الروحاني و فهم أن الله عين له هذه المنطقة للخدمة. ولهذا فقط لم يذهب الشيخ الخوتني من سرسينة مع الاقتراحات الغالية الفاتنة بل رد كل الاقتراحات واشتغل في خدمة الحديث في سرسينة حتى وفاته.

بيعة الخوتني بيد الشيخ نثار الدين و اشتغاله في ممارسة التصوف:

ولما رأي الخوتني الشيخ نثار الدين و وجد الرجل الذي رآه في المنام فرح و أحس مقامه العالي . ولكنه ما كان راغبا في التصوف . فذات يوم قال الشيخ نثار الدين للعلامة الخوتني أيها الشيخ اشترك معنا بعد مغرب اليوم في حلقة الذكر . فاشترك ولما انصرف من الذكر سأله الشيخ نثار الدين ماذا فهمت ؟ فأجاب : "ما فهمت شيئا". فدعاه الشيخ نثار الدين إلى بيته و قال له ايت إلى الخانقاه بعد العشاء. فلما جاء الشيخ الخوتني وجلس أمام الشيخ نثار الدين . قال الشيخ نثار الدين للخوتنى غمِّض عينيك. ثم أفاض الفيض الاتحادي فلم يصبر الخوتني على فيضه فجعل يصيح و يتخبط على الأرض . فمسه الشيخ نثار الدين بيده فسكن . و بعد الإفاقة لما سأله الشيخ نثار الدين هل فهمت شيئا؟ قال : نعم ، فهمت أشياء . سرت في هذه المدة القليلة إلى مكة والمدينة وإلى غير ذلك من الأمكنة المباركة . سبحان الله! وكان مولانا عبد المالك خادم الشيخ نثار الدين حاضرا هناك في تلك اللحظة فقال : ماذا فعلت به أيها الشيخ . فأجاب العلامة نثار الدين قائلا

اني أفضته فيض الطرق الأربعة معًا.وكمّلْته. وبعد هذه الحادثة تغير الشيخ و تغير لباسه و أخلاقه حتى صار وليا كاملا مؤثرا. وجعل يمارس التصوف كل يوم.

تدريس الخوتني في مدرسة سرسينة:

بعد التعيين في منصب رئيس المحدثين جعل الشيخ يدرس الطلاب الحديث النبوي . وكان يدرّس في أكثر الأوقات صحيح البخاري و درّس جامع الترمذي أيضا وقتا قليلا. وكان الشيخ بحر العلوم و باخرة الحديث . وكان يقرر في الفصل تقريرا طويلا حتى لم يبق للطلاب أي سؤال. وكان تقريره مرتبا و موضوعيا ولا يتكلم على غير الموضوع إلا عند الضرورة إليه.

ومن خصائص تدريسه :

١- كان الشيخ الخوتني لا يدرس في الفصل إلا بالمطالعة. وكان يطالع شروحات كتب الحديث مع متونه طول الليل . وكثيرا مًّا يطالع إلى وقت عميق من الليل و حتى الفجر في بعض الأحايين , وكانت له هذه العادة في أمر المطالعة من زمان الدراسة في دار العلوم . وكان يقول : لا بد من مطالعة ثماني ساعات لتدريس ساعة واحدة ". وكان يطالع كثيرا حتى يُرى أنه يطالع مضطجعا و كتابه على صدره. وكان مشتغلا في البحث والمطالعة إلا في وقت الصلاة والأكل . ومع علمه الغزير في الحديث كان لا يحضر في الفصل إلا بالاستعداد التام. و كان يقول إذا لم يطالع في يوم لعلة :" اليوم لا أدرسكم لأني لم أطالع اليوم." فيقول بعض الطلاب . إنك تدرس صحيح البخاري لوقت طويل . فأي حاجة إلى المطالعة في كل حين ؟ فيجيب . لأنه لو صدر مني غلط فأنتم الذين تحفظونه. لهذا لا يحضر الفصل إلا بالاستعداد التام السابق.

٢- قال طالبه العزيز الشيخ أبو جعفر محمد صالح مفسر مدرسة دار السنة سرسينة حاليا أن الشيخ الخوتني كان يقول : "أنا أطالع أولا ثم أرقد و أرتب ثم أدرس الطلاب ". ولهذ السبب كان تقريره يكون موضوعيا و مرتبا.

٣- وأضاف أيضا أن الشيخ الخوتني إذا شرح حديثا وللحديث معارضٌ يوفق بين الحديثين المتعارضين . وكان يذكر وجوها كثيرة في التوفيق و أحيانا يرجح منهما ما هو موافق بالمذهب الحنفي بذكر دليل عقلي و نقلي على منهج صاحب الهداية.

٤- قال طالبه الشفيق و مترجم حياته الدكتور محمد عبد الرشيد : كان الشيخ الخوتني بعد دخول الفصل و جلوسه على مقعده يقول للطلاب لقراءة العبارة أولا. ثم يصلح العبارة إن أخطأ القاري ببيان القواعد النحوية.وكان يهتم بقول " رضوان الله عليهم أجمعين" عند انتهاء السند و بقول " صلى الله عليه وسلم " عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم . لا يعذر أحدا إن أخطأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل يتغير وجهه غضبا . ولا يسكن غضبه إلا باعتراف القاري خطاءه و بقضاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينصح الطلاب لكي لا يخطئ أحدهم هذا في المستقبل .

٥- وأضاف الدكتور أيضا أن الشيخ الخوتني يشرح سند الحديث أولا فيذكر تراجم الرواة مع بيان الجرح والتعديل و يقرر ما في السند من رفع و وقف و اتصال و انقطاع ثم يترجم الحديث و يشرحه مع بيان ما يتعلق به من الواقعة التاريخية أوالمسائل الفقهية أو العقدية وغيرها بالتفصيل .

٦- وأضاف الدكتور أيضا أن الشيخ الخوتني عندما يشرح الحديث و يقرر المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث يذكر أراء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ثم يذكر أقوال أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة مع الدلائل من القرآن والسنة مشيرا إلى صفحات الكتاب المذكور فيها دلائل ذلك المذهب . ويظن الطلاب حينما يقرر مذاهب الأئمة مع دلائلهم أن هذا المذهب هو الحق ولا دليل عند المخالفين. هكذا إذا ذكر مذهبا بالدلائل يظن السامع أن هذا المذهب هو الصواب . ويذكر في الأخير مذهب الإمام الأعظم مع الدلائل و يرد على أراء

المخالفين و يرجح المذهب الحنفي على المذاهب الأخرى بالدلائل النقلية والعقلية فحينئذ يعلم الطلاب أرجحية المذهب الحنفي .

٧- وقال الدكتور أيضا أن الشيخ الخوتني يقرر على بعض الحديث طويلا. فيشرح الحديث شهرا او شهرين ثم يأخذ الآخر ولا يعيد الكلام في التقرير الا نادرا للضرورة . وإنه شرح مرة حديث النية إلى ثلاثة أشهر . فكان في الأصل بحر العلوم . سبحان الله .

٨- وقال تلميذه الآخر الأستاذ مولانا ابو القاسم صفة الله " أن الشيخ الخوتني حينما يدرس يتعجب الطلاب لغزارة علمه و لقوة ضبطه . وإنه إذا كان يشرح حديثا يذكر معه ما يوافقه من الأحاديث في اللفظ أو المعنى في الكتب الأخرى مع ذكر الكتاب والباب والصفحة. فكأنَّ الشيخ كان حاسوبا آليا. كأنّه ينظر إلى الشاشة ويذكر الأحاديث. لو أمكن حفظ دروسه في الشريط السمعي أو المرئي لصار موسوعا في الحديث بلا شك . " أقول بل كان الشيخ عالما موسوعيا.

٩- وأضاف الأستاذ أيضا أن الشيخ الخوتني كانت عادته جميلة في الرد. وكان إذا ذكر أقوال العلماء يذكر أسماءهم بالأدب التام وإن كانوا مخالفيه في المذهب. وكان لا يميل إلى أحد عند ذكر المذاهب بل ينزل منزلة القاضي العادل المنصف فيرجح بين المذاهب بالدليل. فيتعجب الطلاب من صنيعه.

١٠- وكان الشيخ يرجح المذهب الحنفي إذا كان الحديث متعلقا بالفقه وإذا كان متعلقا بالعقيدة يرجح المذهب الماتريدي فإنه كان حنفيا في الفروع و ماتريديا حنفيا في الأصول . وقال المدير أبو الخير محمد أبوبكر الصديق إن الشيخ الخوتني إذا شرح الحديث فان كان لحديث متعلقا بعلم الهيئة يشرح بطريق عالم الهيئة و أحيانا يذكر أسباب الكسوف والخسوف مع بيان حكمته بضوء الكتاب والسنة .

١١- وكان الشيخ يراعي الأدب التام عند تدريس الحديث . وكان دائما يدرس في حالة الوضوء . وكان يجلس جلسة التشهد عند التدريس سواء كان صحيحا أو مريضا. وكان يتوكأ على اليد اليسرى واليد اليمنى يضعها على المكتب يأخذ بها الكتاب . ويجلس في حالة واحدة ولا يتحول يمينا ولا شمالا و قد كان تمضى ساعة أو ساعات. وكان يكثر المطالعة و قراءة صحيح البخاري في غرفته حتى أنه كان يختمه في السنة مرارا.وكان يراعى هذا الأدب أيضا في غرفته عند المطالعة . فيُرى أحيانا أنه يمشي كالأعرج معتمدا على رجل واحد حين ذهابه إلى المسجد وقت الفجر بعد سهر الليل في مطالعة الكتاب على حالة واحدة وذلك كما أظن كان لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم و لتعظيمه فقط .والله أعلم.

١٢- وقال الدكتور عبد الرشيد أحد تلاميذه الشفيق أن أهم خصائص درس الخوتني أنه كان مملوءا بالروحانية. وكان إذا يقرأ الحديث كأنّ وجهه يتنور بنور صاحب الحديث صلى الله عليه وسلم . تظهر الروحانية في قراءته و في كلامه عند شرح الحديث . لهذا يتأثر الطلاب فيستمعون إليه ولا يُسمع أي صوت أجنبي في الفصل غير صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم . كأن الطلاب يعملون بقول الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } [الحجرات: ٣]

١٣- وأضاف الدكتور أيضا أن الشيخ الخوتني كان يحسب عمل التدريس أمانة . لهذا لا يغيب عن التدريس في الفصل أدنى مرض . أحيانا نراه يذهب إلى المدرسة وهو لا يحسن المشي . ربما يحضر في الفصل وفي قلبه غم شديد و حزن عديد لكنه لما فتح الكتاب و جعل يقرأ لا يُرى في وجهه أثر الغم . كأنه رجل صحيح فارغ الغم. وقال الأستاذ صفة الله. أن الشيخ الخوتني لا يغيب عن التدريس إلا عند المرض الشديد . ولم يمرض شديدا قط إلا قبيل الوفاة . وكان لا يحضر في الفصل متأخرا قط. بل يراعي الوقت دائما. وقال المدير أبو الخير

محمد أبو بكر الصديق :إن الشيخ ا لخوتنى يظن تدريس الطلاب مسؤولية له و أمانة عليه .ولما مرض مرضا شديدا قبل وفاته والتحق بالمستشفى فلما أتاه طلابه ليعودوه قال لهم الشيخ : لا تحزنوا، إني أن شاء الله إذا قلّ مرضي وصرت صحيحا أذهب إلى المدرسة و أدرسكم كثيرا كثيرا و أختم النصاب.

أشهر تلاميذه:

درّس الشيخ الخوتني في مدرسة سرسينة ٤١ عاما. وتخرّج على يده في هذه المدة ٢٨٥٨ طالبا على ما ذكر في سجل المدرسة. ومن أشهر تلاميذه الدكتور محمد مستفيض الرحمن ، الدكتور على حيدر المرشدي ، الأستاذ عبد المالك ، الأستاذ أنصار الدين، الدكتور عبد الرشيد، الدكتور الأستاذ يحيى الرحمن ، الدكتور الأستاذ أبو البيان محمد صديق الرحمن، المدير الثاني لمدرسة سرسينة مولانا الشريف محمد عبد القدير، المدير الثالث لمدرسة سرسينة محمد عبد الرب خان ، المدير الرابع لمدرسة سرسينة المفتى محمد أمجد حسين، المفتي أحمد الله، المفتى محمد مصطفى الحميدي، المدير الخامس لمدرسة سرسينة الدكتور سيد شرافت على ، مولانا عبد الرشيد الصوفي ، مولانا الشاعر روح الأمين خان، مولانا نور محمد خان ، مولانا كفيل الدين سركار الصالحي ، مولانا محمد عبد الودود، مولانا رضوان الكريم، مولانا أبو القاسم محمد صفة الله، الأستاذ أختر فاروق، مولانا محمد على سركار، مولانا أبو جعفر محمد صالح و غيرهم، و مدير مدرسة دارالنجاة بدكا ابو الخير محمد ابو بكر الصديق وإن لم يكن من تلاميذه في الفصل لكنه من طلابه في المعنى الحقيقى خارج الفصل ، لأنه كان من خدّام الشيخ الخوتني فرآه من قريب و سمع كلامه من قريب وإن لم يسمعه في الفصل لكنه جلس في حفلته للسبق الافتتاحي مرارا في مسجد سرسينة. فكان من طلابه أيضا بهذا المعنى.

مؤلفاته :

لم يوجد أي مؤلّف للشيخ الخوتني . ولكن يسمع من أفواه بعض تلاميذه أنه كان كتب شرحا للصحاح الستة في سبع مجلدات باللغة العربية وكان عدد صفحاته ٣٤٧٢.وقال

الدكتور عبد الرشيد إني رأيته في بيته ب شَمُولي عند زوجته . وقال الأستاذ الدكتور يحيى الرحمن : رأيت ثماني مخطوطات مكتوبة بيد الشيخ الخوتني نفسه. وكلها باللغة العربية في شرح الحديث وبعضها في الفلسفة. ولكنه لا يوجد تراثه الآن .

زواجه في بنغلاديش:

بعد مجيئ الخوتني في سرسينة بسبع سنين بادر مدير المدرسة مولانا تجمل حسين خان لتزويجه . لأنه ترك أسرته في خوتن و هاجر ، وكانت زوجته السابقة ماتت حين الوضع. كما ذكرنا سابقا. فقال المدير للتاجر المشهور فضل الحق لإتمام هذا العمل المهم يعني تزويج الخوتني. فسعى سعيا مشكورا ، واشترط الشيخ كون العروس ماهرة باللغة الأردية فهما وكلاما و كتابة . وفي الأخير تزوج الشيخ الخوتني بنت القاضي أفتاب الدين سنة ١٩٥٣/١٩٥٢م بعد محاولة كثيرة. ومكث في بيت الصهر خمسة عشر يوما ثم رجع إلى المدرسة. و بنى له الشيخ نثار الدين أحمد بيتا جديدا في سرسينة. فجاء الشيخ الخوتني بزوجته ودخل في بيت جديد بعد شهرين من النكاح. وولدت له هذه الزوجة سبع بنات وهن: (١) فاطمة صديقة (٢) خالدة صديقة (٣) رابعة صديقة (٤)حميراء صديقة (٥) رقية صديقة (٦) عائشة صديقة (٧) بلقيس صديقة.

رحلة الشيخ الخوتني للحج:

قال مترجِم الخوتني الدكتور محمد عبد الرشيد أن الشيخ الخوتني حج بيت الله الحرام سنة ١٩٧٤م نيابة عن الغير. وكان قد حاول للحج سبع مرات قبل هذا ولم يفلح . وفي سنة ١٩٨٠ لما كان يرجع من سفر بغداد ذهب إلى مكة و المدينة فاعتمر وزار روضة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية . وكان يظهر حزنه و يقول متأسفا: "ليتنى أحج في كل سنة! ولو أرسلنى أحد للحج ولو نيابةً."

عبادته و زهده:

كما كان الشيخ الخوتني مولعا بالعلم كذالك كان راغبا في كثرة العبادة . وكان لا يترك الجماعة قط حتى في مرضه أيضا يذهب إلى المسجد فيمشي معتمدا على رجل واحد

كالأعرج. وكان يواظب على صلاة التهجد ويهتم بالنوافل من الصلاة والصيام و يجتنب عن الأفعال المكروهة خوفا من ارتكاب الحرام. ومع كثرة مطالعة العلم و كثرة العبادة كان الشيخ زاهدا عن زهرة الدنيا . فكان لا يقصد المال. لهذا لم يذهب من سرسينة مع اقتراح غالٍ للراتبة الكثيرة من مدارس شتى. بل بقي في خدمة الحديث في سرسينة حتى الوفاة.

أخلاقه الرفيعة:

١- كان الشيخ الخوتني يراعي حقوق العباد و يهتم بها ولهذا لا يحضر في الفصل متأخرا وكان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

٢- وكان محبا للفقراء والمساكين خصوصا إذا كانوا صغارا أيتاما. ذات يوم سمع صوت بكاء فإذا هو صبي يبكي في ناحية المسجد في سرسينة وقد جاء هذا الولد من محافظة بعيدة أعنى بغورا للالتحاق ولكنه فقد نفقته . فلما سمع منه هذه القصة أخرج من محفظته نقودا و أعطاها أياه .

٣- وكان الشيخ متواضعا بل كان مثالا لاحترام الأستاذ في العالم. وقصته أنه كان لا يدري اللغة البنغالية مع أنه يحبها . فعين تلميذا لتعليمه اللغة البنغالية . فكان هذا التلميذ كلما ذهب إلى غرفته قام احتراما له . ويخاطبه بِ" يا أستاذي" . قال التلميذ على الاستحياء : لا تفعل هكذا ايها الشيخ . ولكن الشيخ لم يترك تعظيم هذا الأستاذ الطالب حتى الوفاة. وكان يقول. من علمني حرفا واحدا فهو أستاذي و عليَّ تعظيمه .سبحان الله . ومن قصته تواضعه أنه ضرب ذات يوم تلميذا بالنعل لنظره في غرفته بدون إجازة . فلما أحس الشيخ الخوتني أن التلميذ لم يفعله متعمدا . أراد أن يذهب إليه ويطلب منه العفو. فجاء الطالب للاعتذار واستغفر عند الأستاذ فقال الخوتني . يا ولدي : خذ هذا النعل و اضرب به على ظهري قصاصا كما ضربتك .(سبحان الله) فبكى التلميذ و وقع على قدم الشيخ فعانقه الشيخ و بكيا جميعا.

٤- كان شفيقا للطلاب. وفي هذا قصة عجيبة رواه مترجمه الدكتور محمد عبد الرشيد. وهي أن الطلاب تظاهروا يوما أمام المطعم للطعام الجيد و تركوا الأكل في الصباح وذهبوا إلى المدرسة بدون أكل شيئ. فسعى المعلمون ليفهموهم ولكن الطلاب كانوا على دعواهم مستقمين.وزعم بعض المعلمين أن الطلاب غضبوا الآن و ينطفئ الغضب بعد قليل ثم يأكلوا . لكن الوقت مضى ولم يأكلوا و في وقت الظهيرة عطلت الدراسة للصلاة . فلما ذهب الطلاب إلى المسجد للصلاة أجلسهم المعلمون بعد الصلاة و خطبوا أمامهم و سعوا لتفهيمهم ولكن الطلاب كانوا مستقمين على دعواهم. فقام في المرة الأخيرة شيخ الحديث العلامة الخوتني . وخطب أمامهم و أسمعهم قصة حياته من ملاقاته المشقة في طلب العلم خصوصا مشقة الأكل. وأعلمهم قصة بعض المحدثين و نصحهم نصحية بالغة ثم أمرهم لترك الدعوى و للذهاب إلى المطعم للأكل. فخرج الطلاب من المسجد ولكنهم لم يأكلوا شيئا . ووصل هذا الخبر إلى أذن الخوتني فترك طعام الغداء حتى نهى أهله عن طبخ الطعام في البيت . فجاع و جاع معه أهله حتى بناته الصغيرة لم يأكلن شيئا. وقال لأهله: لا تأكل أحدى بناتي و لا أكل أيضا ولا يأكل من أهل بيتي أحد حتى يأكل طلابي. فلما سمع الطلاب هذا الخبر العجيب تركوا دعواهم و ذهبوا إلى المطعم للأكل. فتأمل أيها القارئ الكريم ! كيف كان هذا الأستاذ !

٥- وكان الشيخ الخوتني متبعا للسنة النبوية في سيرته و صورته وفي لباسه أيضا. فكان يلبس القميص إلى نصف الساق. ويلبس الإزار والسراولة الى نصف الساق. وكان يحب اللون الأبيض. وكان يلبس العمامته دائما ، في الصلاة و في غيرها. وكانت عمامة سبعة أذرع وكان لونها أسود أو أبيض أو أخضر.وكانت قلنسوته مدورة لازقة بالرأس . وكان لباسه نظيفا . لم يراه أحد قط أنه ذهب في الفصل بلباس قذر. و كان فراشه أيضا نظيفا. وكان يبسط على فراشه رداء أبيض قبل النوم و يطويه بعد اليقظة .

٦- وكان الشيخ الخوتني بشاشا متبسما قليل الكلام. يخاطب الناس بالاحترام . وكان يذهب إلى السوق و يشتري لنفسه و لأهله. وكان يقري الضيوف و يحترمهم . فكان يطعمهم بنفسه. ويأتي بالطعام و أوانيه من داخل البيت بنفسه.

٧- كان الشيخ تاجرا صدوقا أمينا.وكانت له تجارة صغيرة . فكان يتجر بالسنة و يراعي حقوق الغير . قال الشريف محمد عبد القدير مدير مدرسة سرسينة : ذات يوم ذهبنا إلى السوق لنشتري ما نحتاج ولما نقدنا البائع نقص من الخوتني ٥٠ فلسا فقط. فأديته من جانبه . فلما رجعنا إلى المدرسة و اشتغلنا في أعمالنا ونسيت أنا أمر الفلوس. لكن الشيخ الخوتنيلم ينس فترك العمل و اهتم باداء القرض أولا فأتى غرفتي بتلك الفلوس الخمسين بعد قليل. ثم أعطانيها . سبحان الله!

٨- وكان مربيا شفيقا للطلاب. وكانت المعاملة بينه وبين الطلاب كمعاملة الأب الشفيق مع أولاده. فكان أحيانا يرسل الرسائل إلى الطلاب و ينصحهم فيها. وقد أرسل رسائل كثيرة بكتابة نفسه إلى تلميذه الشفيق الدكتور الأستاذ يحيى الرحمن . ومن رسائله : أنه كتب بيده إلى بعض الطلاب الرسالة التالية التي ذكرها مترجمه الدكتور عبد الرشيد فكان فيها. "بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم بما كنتم تعلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و حياتك وقبل مماتك.(كتب الشيخ هذه الرسالة في ٢٥/١١/١٩٨٤م)

ولايته و كرامته:

ماكان الشيخ الخوتني عالما حقانيا فقط بل كان عالما ربانيا و وليا كاملا أيضا. قال تلميذه العزيز المفتي أحمد الله رحمه الله . رأيته وليا كاملا رفيع المقام عالي الدرجة. وكان يهتم بالنوافل والمستحبات بجانب الفرائض والواجبات ويترك المكروهات خوف ارتكاب

الحرام. والشيخ نثار الدين أحمد قال له كما ذكرنا سابقا : أني أفضته معا بفيض الطرق الأربعة . فصار وليا كاملا وصاحب الكرامة العالية. ومن كرامته أن كان في غرفته و دخل في بيته بعض المحاربين ليقتله. فلما رآهم الشيخ دعا الله لينقذه و قرأ بعض أيات من سورة يس و نفث في التراب ثم نثره في الغرفة . سبحان الله ! فلما دخل المحاربون في غرفته لم يراه ثم خرجوا و أنجاه الله من شرهم . وكانت هذه الواقعة بعد استقلال بنغلاديش. ومن أعظم كراماته أنه كان مستقيما على السنة النبوية عقيدة وعملا في جيمع حياته . ولم يراه أحد أنه خالف السنة قط.

وفاته :

كل نفس ذائقة الموت. وإذا جاء أجل أحد لن يؤخر له ابدًا . وما كان الخوتني أرفع منه . فنزل الموت عليه . وقصة الموت أنه أحس المرض بعد الامتحان الشفوي لطلاب الكامل سنة ١٩٨٦م فذهب إلى بيت صهره جانب (مسجد النجوم) يعني تارا مسجد في دكا. وبعد أيام اصيب بداء الكُلْيَة فجيئ به إلى "المستشفى المشترك العسكري" في دكا. فصح قليلا ثم مرض، فنقل من ذلك المستشفى إلى مستشفى كلِّية الطب في دكا و سجَّل اسمه للمعالجة فيه وجلس الأطباء للمشاورة و حاولوا كثيرا ولكن الله يفعل ما يشاء فتوفاه الله في التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٨٦ في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في الساعة الخامسة و خمس دقائق الموافق ٢٤ صفر سنة ١٤٠٧هـ. (إنا لله وإنا إليه راجعون) ونشر خبر موته سريعا في سائر البلاد بالإذاعة والتلفاز والجريدة. وصلى عليه الشريف محمد عبد القدير مدير مدرسة سرسينة في بيت المكرم الجامع الوطني في الثلاثين من نفس والشهر والسنة بعد صلاة الظهر. ودفن في المقبرة الجديدة بعظيمبور.

ظهور الكرامة قبل الوفاة :

قد ذكر سابقا أن الشيخ الخوتني كان وليا كاملا رفيع القدر والمقام صاحب الكرامة . وله كرامات عديدة . ومن كرامته قبل وفاته أنه كان نائما في فراش المستشفى ولا يقدر على الكلام مع الغير . وإذا جاء أحد من تلاميذه أو محبيه ينظر إليه فقط و تدمع عيناه .

ولكنه يوم وفاته في الساعة الخامسة إلا عشر دقائق لما سمع صوت المؤذن لصلاة العصر خلع من أنفه أنبوب الأكسوجين و صلى العصر بالإشارة وجعل يذكر الله جهرًا حتى اجتمع عليه الناس و يقولون متعجبين : هذا الذي لا يقدر على الكلام فكيف يذكر الله الآن ؟ سبحان الله . وبعد ذكر الله خمس عشرة دقيقة تقريبا انخفض صوته تدريجا. وفي الوقت المعين كما ذكرنا سالفا سكت الشيخ ولم يقدر أن يذكر و انتقل إلى جوار الله تعالى : اللهم اجعله من سكان الفردوس الأعلى . أمين.

تقييمه :

كان الشيخ الخوتني متصفا بصفات عالية عديدة. ولكن الباحثون قيّموه كما يلي :

١- إنه كان مهاجرا كما أسلفنا . والله تعالى قال في حق المهاجرين : {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١٠٠] وقال النبي صلى الله عليه وسلم :المهاجر من هجر ما نهى الله عنه [صحيح البخاري، رقم الحديث:١٠] فكان الشيخ الخوتني مهاجرا باعتبار كلا المعنيين.

٢- إنه كان مجاهدا كما ذكرنا سابقا. فكان في سبيل الله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع " . رواه الترمذي . وقال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ } [البقرة: ١٥٤] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض [صحيح البخاري ، رقم الحديث : ٢٦٣٧]

٣- إنه كان معلما كما هو مشهور. وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير [سنن الترمذي، رقم الحديث : ٢٦٨٥].

٤- إنه كان محدثا كما هو مشهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : نضَّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها [المستدرك على الصحيحين للحاكم ، رقم الحديث: ٢٩٤]

الختام :

أقول في الختام أن الشيخ العلامة نياز مخدوم الخوتني إنسانا كاملا و وليا رفيع المقام و محدثا شهيرا و مجاهدا للدين و مهاجرا في سبيل الله و كل من هذه الصفات فضيلة محمودة . أرجو إلى الله ان يدخله الله الجنة بهذه الأعمال الصالحات و أني يوفقنا الله تعالى للتأسي بما في حياته من الأخلاق الحميدة . والله الموفق والمعين.

مصنف:

محدث، مدرسة دار النجاة الصديقية للكامل

Life Sketch of a Great Islamic Scholar of Asia
Allama Niaz Makhdum Khutani R.

Muhammad Badruzzman Riad

Allama Niaz Makhdum Khutani R. was one of the most renowned Islamic scholars in Bangladesh. Almost all of his life was devoted to obtaining knowledge and teaching. He was a fantastic personality in his era. The great scholar Khutani R. had special and perfect knowledge in Tafseer (explanation of Al Quran), Hadith, Fiqh (Islamic law), Qalam (logic), Adab (Arabic literature), History, Astronomy, Medical science, Art of warfare, in fact, in every branch of knowledge. He was a towering figure of Islamic revival and the most eminent religious figure of his time, a creative lecturer, and believed to be the greatest teacher of Hadith. He led a very active life by teaching, preaching, writing, lecturing, and making occasional journeys. A brief sketch of his life is given below:

Birth and family background

Allama Niaz Makhdum Khutani R. was born in the village of Khutan (a famous town of People's Republic of China) in 1914 AD. His family was well-respected and held an eminent position in the town. His father, 'Muhammad Siddique R. was a wealthy businessman, a committed Muslim, and a respected citizen of Khutan. His mother Ayesha Khatun was also very pious woman in her time. At the early age of five he lost his father and in the very next year lost his mother also. He was then brought up under the care of his uncle Mawlana Muhammad Qasem R., who was the Chief Justice of the town. Under his care the boy Khutani acquired primary knowledge perfectly.

Upbringing

Allama Khutani's educational life was divided into two parts. Firstly as a member of an aristocratic family he got education on family and local basis, secondly after a pathetic period of his life he went to India and got education from Darul Ulum Deuband, one of the most prominent Islamic institutions.

During his boyhood Khotani studied at **Khalak** madrasah, which was situated in Khutan until his age was twelve. Here he studied Al-Quran, Turkey and Arabic language, Fiqh and Math. After that he went to historical institution of Islamic knowledge **Kashghar** to earn knowledge. Here he was introduced to famous Islamic scholar Allama Abdur Rahman Kashghari R.

In Kashghar, he spent over seven years to become a scholar on Hedaya and other branches of Islamic knowledge. Allama Khutani R. possessed sharp talent and deep wisdom since his boyhood. From his childhood Allama Khutani R. possessed good health; he was also laborious and endurant. He was also interested in games like fighting, boxing, swimming, and horse-racing; all these were his favourite games. He was liberal from his childhood and a very fond of Islamic ideology. For this reason it was not possible for him to complete his education without any break.

Joining the Military Force

When the Chinese people attacked the Turkish inspired by the revolutionary spirit of Russia, Allama Niyaz Makhdum Khutani R. was studying at Kashghar. He was deeply

aware about the need of military education to sustain the freedom of his motherland and to retain the unique quality of Islam. For this reason he joined the military force of his country in 1934.

Because of his skills on that ground, within a few days he was appointed as the commander of his team. While working in the military force he used to spread Islamic ideology among the soldiers. Under his touch and cordial endeavor many of the soldiers became the good followers of Islam.

In The Battlefield

It is known to us that the Soviet Russia was established over the corpse of fifty million Muslims. To get rid of the oppression of communists, he jumped into the war field. When his first child was born, he managed vacation for a few days but at that time the communist force barricaded the castle of his state, so the vacation was cancelled. After a long period of one month of obstruction, the provision was finished. Khutani R. took the risk, depending on Almighty he jumped from the third floor of the castle and luckily he was saved.

He took a horse ride and reached the bank of a nearby river. He crossed the river on his own as the horse was dead. He reached an unknown territory which was not under the power of communist. It is assumed that it was a part of China. He got admitted in the local military force but due to their faith in communism beliefs and tradition he resigned.

Way to Darul Ulum Deuband

After resigning the military force, following the tradition of migration he came to India in 1935 AD to begin his life

from a new point of view. His search for an ideal institution helped him to reach at the prestigious Darul Ulum Deuband Madrasah. He got admission in this institution in the same year. He was an attentive and devoted student. He became the centre of attraction to all the teachers due to his sharp memory and extra-ordinary qualities. He used to stand first in every class in his study life in Deuband. Here he studied for eleven years with full dignity and devotion.

Among his teachers were Mawlana Qari Tayyeb, Mawlana Shibbir Ahmad Usmani, Mawlana Hussain Ahmad Madani R. The spiritually charged atmosphere of Darul 'Ulum Deuband, coupled with brilliant teachers and Allama Khutani's own intelligence and piety, together contributed to the excellence of theory and practice that was manifested in his personality. He possessed unmatched linguistic skills and mastered the Arabic, Persian, and Urdu languages by the same age.

As a Professor in Sarsina Madrasah

To get appointed as the head of the department of Al-Hadith in Sarsina Madrasah was a special part of his life. It is the biggest and most ancient residential Islamic Institution in Bangladesh which was extablished in Pirojpur under the Barishal division in 1950 by the great saint Shah Sufi Nesaruddin R., the khalifa of Allama Abu Bakar Siddiqi Al Quraishi R., a great saint of Furfura Sharif.

Due to a letter sent by the founder of Sarsina Madrasah Allama Nesaruddin Ahmad R., the authority of Deuband Madrasah decided to send Allama Khutani R. to Sarsina as the head of the department of Al-Hadith in 1945.

Teacher of the Teachers:

Allam Khutani R. was a great ocean of knowledge with a mind thirsty of knowledge. He used to spend every second in searching information. The students used to maintain pin-drop-silence during his lecture and used to hear them with huge curiosity and interest. He used to prepare himself greatly before giving a lecture; it included reading and searching various books on that topic. He served as a teacher in Sarsina Madrasah from 1945 to 1986. He permitted 2858 students to narrate Hadith for a long period of four decades.

Some of his renowned students are as follows:

- The present pir (saint) of Sarsina Darbar Maulana Muhammad Muhibbullah.
- The former principal of Sarsina Madrasa and the only life-long representative of O.I.C in Bangladesh Maulana Sharif Muhammad Abdul Qadir R.
- The former professor of Dhaka University and the honourable Vice Chancellor of Islamic University of Kushtia Dr. Muhammad Mustafizur Rahman.
- The present Khatib of national masjid Baitul Mukarram Muhammad Salauddin.
- The co-editor of The Daily Inqilab Maulana Ruhul Amin Khan.
- The professor of Karachi University Dr. Ziaul Haque.
- Renowened educationist Maulana Akhter Faruque R.
- The former principal of Sarsina Madrasah Maulana Abdur Rab Khan R.
- The former principal of Sarsina Madrasah Maulana Amzad Hussain R.

- The present principal of Sarsina Madrasa Maulana Dr. Syed Sharafat Ali.
- The present principal of Nesaria Kamil Madrasa, Dhaka Maulana Kafiluddin Sarker.
- The former vice principal of Sarsina Alia Madrasa Maulana mufti Mustafa Hamidi.
- The former head muhaddis and mufti of Sarsina Madrasa Hazrat Maulana A.M.M Ahmadullah R.
- The former muhaddis and mufti of Sarsina Madrasa Hazrat Maulana Redwanul Karim R.
- The former muhaddis of Sarsina Madrasa Hazrat Maulana Sufi Abdur Rashid.
- The professor of the department of Islamic studies in Dhaka University Dr. Ali Haider Murshidi.
- The professor of the department of Islamic studies in Dhaka University Dr. Abdur Rashid.
- The professor of the department of Arabic literature in Dhaka University Dr. Fazlur Rahman.
- The professor of the department of Arabic literature in islamic University of Kustia Dr. Yahyar Rahman.
- The former vice principal of Tamirul Millat Kamil Madrasah Maulana A.K.M. Sifatullah.
- The present principal of Jhalokati N.S. Kamil Madrasah Maulana Muhammad Khalilur Rahman.
- The former professor of the department of Arabic literature in Islamic University of Kustia Dr. Abul Bayan Muhammad Siddiqur Rahman.
- The presenter of popular TV program Kafela and channel I Maulana Shahid Nurul Islam Faruqee R.
- The present principal of Darunnazat Siddikia Kamil Marasah Maulana Abul Khair Muhammad Abu Bakar Siddiq.

Spiritual Training under Pir Nesaruddin R.

The Messenger of Allah (May Allah bless him and give him peace) said, "Make the company of 'ulama' compulsory upon yourselves and listen to the words of the wise, for Allah Most Exalted restores life to dead hearts by the light of wisdom just as He makes alive the dead earth by rain". Companionship of a pious, Allah-fearing shaykh is necessary for each and every Muslim. Through the knowledge of books, one's external self is reformed, and through the companionship of a shaykh, one's internal condition is purified. Allama Niaz Makhdum Khutani took companionship of Pir Nesaruddin R. and purified his soul. Once, his shaykh Allama Nesaruddin gave him the miraculous Fayez of four tariqah together at a time. As a result of this Fayez a special atmosphere was created and Allama Khutani was able to travel spiritually through holy Mekka and Madinatul Munauwwarah. This branch of knowledge enriched his life greatly.

Getting the Title of Bahrul Ulum:

In the year of 1965, Allama Niyaz Makhdum Khutani was accepted as a most renowned muhaddis of this country. At that time the additional D.D.P.I was a scholar of 22 languages. He decided to come in Sarsina Madrasa after hearing about the name and fame of the teachers of that madrasah. Getting this news the Pir Saheb Qibla became a bit tensed and ordered Allama Khutani to prepare himself to face the D.D.P.I. Allama Khutani had complete faith upon his knowledge and he was calm. There was a debate between the two and at last Khutani won. The D.D.P.I was compelled to admit the fact that he had never seen a scholar like Khutani in his life and he gave him the title Bahrul Ulum after admitting him as his teacher.

One of His Wonderful Miracles

It is an event of after-war period. At that time Khutani R. used to stay in his in-laws house which was in Armanitola, Dhaka. One day some terrorists came in the house while Khutani R. was gossiping with one of his students Maulana Abdul Halim (present Vice Principal of Kuwatul Islam Kamil Madrasah, Kushtia). They started to search Khutani R., Khutani told his students that they had come to kill him. He took some sand from the old wall of the house and threw it towards the terrorists after reciting these verses of the Quran-

After a while they came in the room where Khutani R. and Abdul Halim were seated but they were unable to locate them. Both of them were safe by the grace of Almighty. The terrorists gave some threat and departed.

Guest of Baitullah

To visit Mekka and Madina for Hazz is a dream of every pious Muslim. From the year 1914 to 1974 Khutani spent his time in Khalak Madrasah, Kashghar, in the battlefield, in Darul Ulum Deuband and in Sarsina. So he couldn't get the opportunity to perform hajj. At last, in the year 1974 he got this opportunity. He reached Mekka by air and along with performing hajj, he visited all the memorable places of Islam.

Treatment towards the Orphans

Allama Khutani R. was a symbol of affection and love. He was very much sympathetic towards the sorrows and sadness of his students and used to try his best to remove them. It is an event of the year 1982, a little boy was crying sitting in the corner of the masjid of Sarsina. It took the attention of A.K.M Abu Bakkar Siddiq (present principal

of Darunnazat Siddikia Kamil Madrasah) who was a student at that time. He came to know that the boy had come from a long way of Bagura. He was studying at a local madrasah, and he lost his father in his childhood. The boy heard about the Sarsina Madrasah and the privileges students getting here. He spent all the money to reach his destination and then he was penniless. He said that he didn't know anybody here and was worried about how he would return home that was the reason of his crying. Hearing the whole event A.K.M Abu Bakkar Siddiq took him to Khutani R., Allama Khutani gave the boy some money instantly and told him to buy some food. Later he asked his students to help the boy as per their capacity and by talking to other teachers he managed a fund for that orphan so that he could buy some clothes, books and other necessary things and could reach home safely. It is an example of his sympathetic mind.

Gentle Outfits

Allama Khutani was very fond of normal, clean and gentle outfits. He didn't like pompous and luxurious outfits. He was aware of wearing clothes according to the need of environment. He used to wear round Panjabi above the ankles. White was his favourite colour but he used to wear other colours too. His outfits also included lose trousers and longyi. After becoming a follower of Allama Nesaruddin R. he almost avoided the clothes with collar. In case of outfits, he was a full follower of Sunnat. He used to wear turbans which were 10.5 feet in length and the colour of these turbans was black, white and green. Most of the time he used the black one. He also used to wear round cap all the time as he considered it as Sunnat.

Food Habits

Allama Khutani used to put emphasize on healthy body and mind for saying prayers. Even he used to say to his students to take good foods. Khutani R. maintained a balanced diet and a regular routine in case of taking foods and never blame about the foods. Whatever was given he considered it as the food selected for him by Allah Almighty and remained satisfied. Beef got preference over fish to him and bread over the rice.

Manner of Talking

Allama Khutani (R) used to talk less; he carried a smile in his face while talking. He dislike meaningless babble. He used to maintain modesty while talking; there is no example that he hurt someone through his speech. When someone went to meet him, he used to sit from lying position and attend to that person attentively. Sometimes he used to make some fun but there was always a teaching hidden on those funds. Everyone got fascinated by his nice behavior.

Responsible Towards Duties

Allama Khutani R. was very much cordial towards his duties; he fulfilled all the duties led upon him correctly. His behavior with his co-workers and his students is an example, he never did any mistake intentionally towards his duties. He was fully obedient towards the madrasah authority and his lifelong service in one madrasah is the burning proof of this.

Respect to Teacher

To possess respect for the teachers is a crucial factor for a person to achieve success. Khutani's respects to his

teachers were incomparable. Even when he was a respected teacher, he showed respect towards his teacher. An event can be described which is related to this fact-being a foreigner Allam Khutani R. was unable to speak and read Bengali. But he was deeply interested and curious to this language. So he appointed a talent student of Sarsina who belonged to primary class. Surprising fact is that, whenever that student went to his room in order to teach him Bengali, he used to stand up to show respect towards that boy. The boy was ashamed of his teacher's behavior and requested him a lot not to do that but Allama Khutani R. kept standing to show respect towards his teacher till his death.

Days in Hospital

Allama Khutani R. came to Dhaka in 1986 leaving his workplace Sarsina Sharif. On mid-August, suddenly he was captured by serious illness. Following the consult of the doctors he was admitted to Dhaka Medical College. An operation was needed but he was too weak for that task, even he was unable to walk. Later when he somehow managed to walk a little, he was shifted to Military Hospital where on 16th September a successful operation was done by Dr. Cornel Sirajul Zinnah. He returned home on 22nd September, 1986.

Death

Each and every creature is bound to have the bitter taste of death and Allama Khutani R. is not out of them. He became ill again and was admitted to Dhaka Medical for second time with extreme fever and weakness. There was no improvement in his condition rather he was becoming

ill day by day. The doctor informed that both of his kidneys were damaged. He fell to death on 29th October 1986, it was a Wednesday, salat-al-Asar was being held, he opened the syringe of saline himself and started to pray his asar prayer by indication, after that he started ziqir and fell to death (Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiuun). This news reached Sarsina by the news of Radio Bangladesh at 11o'clock at night. His funeral was held on 30th October after the Zuhar prayer at Baitul Mukarram Masjid at the present of thousands of people. He was buried in New Azimpur Graveyard, Dhaka.

Rose Fragrant Grave

The dear one of Almighty never dies, they live forever through their works and heroic deeds. Dr. Ali Haider who was a disciple of Allama Khutani (R) narrated this event. He went to the grave of Allama Khutani for ziarat and suddenly he felt that a beautiful fragrance of rose was coming out from his grave. This fragrance was incomparable to any other fragrance of this world; it was not the fragrance of any ordinary rose but the rose of paradise. May Allah keep Allama Khutani R. fascinated by this fragrance till the Day of Judgment. Ameen.

Writer :
Muhaddis, Darunnazat Siddikia Kamil Madrasah.

খোল মুখ কও কথা

– অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির র.

(শাইখুল হাদীস আল্লমা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. স্মরণে)

হে দেয়াল তুমি যুগ যুগ ধরে, দাঁড়িয়েই রলে মুক
দেখলেই শুধু, কইলেনা কথা, খুললেনা কভু মুখ।
মন্দ ও ভালো উভয়ে দেখেছো, দেখেছো আঁধার আলো
হিমেল –উষ্ণ বাতাস সয়েছো, দেখেছো ধবল–কালো।
মূর্খ দেখেছো, আলিমও দেখেছো, দেখেছো মহান–হীন
মিলন–বিরহ হাসি ও বিষাদ, গাফিল ও জাকেরীন।
এতো সব দেখে পূর্ণতা পেলো, তোমার অভিজ্ঞতা
এবার জওয়াব দিয়ে দাও ভাই, খোল মুখ কও কথা।
খোতানী হুজুরে দেখেছো কি তুমি, দেখে যদি থাক কও
ঠিক বলি আজি, অথবা মিথ্যে, মুখ খোল বলে দাও।
দীর্ঘ শরীর, আয়তলোচন, চাঁদহাসা মুখখানি
কাঁচা সোনা যেন জ্বল জ্বল করে , অধরে মধুর বাণী।
তফসীর–হাদীছে, ফিকহ্ ও কালামে, মহাজ্ঞানী পারাবার
সে জোয়ার নীরে নায়ালো সবারে, গুলে গুলে গুলযার।
তাকওয়া আর পরহেজগারী, সুনানের পায়বন্দ
সবগুণে গুণী, চেহারা নূরানী, রাসূলের দিলবন্দ।
খোতানী হুজুর ধন্য করেছে, বাংলার যমীনেরে
নিয়ায দানিয়ে সরস করেছে, হাদীছের বাগানেরে।
মাখদূম তিনি বঙ্গ ভুবনে, হাজারো মুহাদ্দিছ
তাঁরই তাকরীর আওড়ায় সবে, দরসে অহর্নিশ।
দেয়ালের ভাসে দেয়ালিকা কয় সত্য ও সুন্দর
সকলই দেখেছি খোতানীর মাঝে– আল্লাহু আকবর।

হে নিয়ায মাখদূম

– মুহিব্বুল্লাহ জামী

(ছারছীনা মাদরাসার শিক্ষক শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. কে নিবেদিত)

বুখারী শরীফ সম্মুখে নিয়ে বসি
দুই নয়নের অশ্রুরা পড়ে খসি
'বুখারী রয়েছে, বুখারীর মহান উস্তাদ বেঁচে নেই'
আমার প্রাণের উস্তাদরা যে জপে শুধু তোমাকেই।
হে নিয়ায মাখদূম!
তোমার স্মরণে হৃদয়ে যে বয় সাহারার সাইমুম
মোহময় সংবাদে
যাঁকে দেখি নাই তাঁর নামে মন অস্থির হয়ে কাঁদে
কী যে সুমধুর স্বাদে
অস্থির মন কাঁদে।
পথিক যখন পথ পায় নাই রাতে
নাজাতের কোন উপায় ছিল না হাতে
সেদিন পথের বাঁকে বাঁকে তুমি জ্বালিয়েছ মিশকাত
অকাতরে বিলি করেছ দু'হাতে ইলমের সওগাত
সে দিন এ বাংলায়
হাজারো মুহাদ্দিস জন্মেছে দ্বীনের ছত্রছায়
তাই তো ইলম বেঁচে রবে যতো দিন
বঙ্গে–ভারতে তোমার পতাকা ততকাল উড্ডীন।
যবনিকাপাত করব এ কবিতার
বাক্য খরচ করব না আমি আর
তার আগে বল হাদীসের বাণী "ভালোবাসবে যে যাকে
জীবনে না হোক, হাশরে – মীযানে কাছে পাইবে সে তাকে"
তাহলে তোমার ফয়েয হইতে কেন হব মাহরুম?
হে নিয়ায মাখদূম!

আল্লামা খোতানী হুজুর র. কে নিবেদিত কবিতা

অমর

মুহাম্মাদ শফীউদ্দীন

হে ভাস্বর মানবতার প্রতীক
সত্যের দিশারী,
বজ্র কণ্ঠে গর্জে উঠা
সৈনিক, তৌহিদী বীর ব্যক্তিত্ব।
রাসূলের বাণীর মশাল
গেলে জ্বালায়ে,
যে বহ্নি রাখ নাই তুমি
নিজ বক্ষ মাঝে দাবায়ে।
তব তৌহিদী বজ্রকণ্ঠ নিনাদ
সর্ব গৃহের হাজিরা
খাতায় বলছে "লাব্বায়িক।"
সত্যি কি তুমি নেই?
তবু এ দিশেহারা ছেলেগুলো
তোমারে খুঁজে কেঁদে ফিরছে,
কেঁদে ফিরছে এরা, এদের হাড় ও মজ্জা,
আকাশ-বাতাস প্রকৃতির
ঠিক মধ্যখানে
যেখানে তুমি নেই।
অথচ সকল হৃদপিণ্ডের
শোণিত স্রোত স্পন্দনে,
লুকিয়ে রয়েছ অমর হয়ে।

ইলমে দীনের মহানসাধক

মু. মুমিনুল ইসলাম হাশেমী

ইলমে দীনের মহান সাধক
নিয়ায মাখদুম খাত্তানি,
আল্লাহপাকের অশেষ কৃপায়
খুবই ছিলেন সন্ধানি।

খাতান থেকে হিন্দে এসে
নিলেন দীনি শিক্ষা,
অবশেষে বাংলাদেশে
ছড়ালেন তার দীক্ষা ।

হাজার হাজার ছাত্র তাঁহার
নেছারবাগের অঙ্গনে,
ইলমে হাদিছ চর্চা করেন
তারই একক রঙগণে।

যেমন ছিলেন আলেম তিনি
তার চে বেশি বিনয়ী,
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি
ছিলেন সদা বিজয়ী ।

দেখিনি জীবনে শুনেছি বহু
বাবার ওঠরে বারবার,
অনেক বড় আলেম ছিলেন
অনেক ছিল ধৈর্য তাঁর।

ইলমে দীনের এইযে সাধক
ছিলেন অনেক গুণবান,
বহু যুগ ধরে লিখিলেও তা
রয়ে যাবে অফুরান।

দোয়া চাহি সাথী হতে যে
এইসাধকের বিচার দিন,
যিনি ছিলেন অসীম আশেক
রাসুল পাঁকের চিরদিন।

"هذه قصيدة نونية في شأن المحدث علامة نياز مخدوم الخطّاني (رح)"

أشرق نور من الله

محمد مؤمن الإسلام هاشمي الأزهري

أشرق نورٌ مِّن الله النوراني * أظهر دين من الله الربّاني.
وهو عالمٌ جليلٌ محدّثٌ فاضل * علّامة نياز مخدوم الخطّاني.
شهر صيته عالم التركستاني * تعلّم علومَ الدين والفرقاني.
من خير بُقعة هناك مولده * وصار عالما عارفا بالإتقاني.
بدأ التدريسَ في ريعان شبابه * حديثا مدرّسا لكل الإنساني.
وصل إلي دار السنة السرسينة * وضمّ إليه طلاب الرحماني.
سعِدْنا به ومن لاقاه معا * وصار بصحبته عارفا المناني.
رضيته سرمدا ومن معي * ما دام الأرواح في الأبداني.
جئناك مؤخرا وكنت فينا * تزودنا المعاني عارفا بلا ريباني.
سكنه الله جنة الفردوس نزلا * ما جرت الأقلام ينبوعا ببنياني.

التاريخ: ٢٠١٥/٣/٧ (مدينة البعوث الإسلامية) الساعة: ٩:٠٠ صباحا

العلامة نياز مخدوم الخوتني

محمد حبيب الرحمن

سمعت اسمك الشريف ولم أرك * يا خادم السنة نياز مخدوم الخوتني
مولدك في الخوتن من تركستان * ونشأت في أسرتك في ذلك المكان
كنت مجاهدا خالصا في سبيل الله * جاهدت الشيوعية لإنقاذ الوطن
قدمت هندا لتحصيل العلم * حصلت منه كثيرا بغير حسبان
ثم صرت محدثا لهذا البلاد * في أرض سرسينة ذات الشأن
أفنيت عمرك لنشر السنة * وتَبَوَّأْت مقعدك في خير الجنان
كنت محدثا ورعا عن الشبهات * متبع الشرع زاهدا عن الفاني
طلابك كثيرة لا تحصى عددها * صاروا مشهورين في هذا الزمان
درست الطلاب صحيح البخاري * خدمتك مقبولة عند المنان
طوبي لأرض أنت دفينه * وهي عظيمبور غني عن العرفان

শাইখুল মুহাদ্দিসীন উস্তাদুল আরেফীন আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা
নিয়ায মাখদূম খোতানী তুর্কিস্তানী র. এর ইন্তিকালে

শোকোচ্ছ্বাস

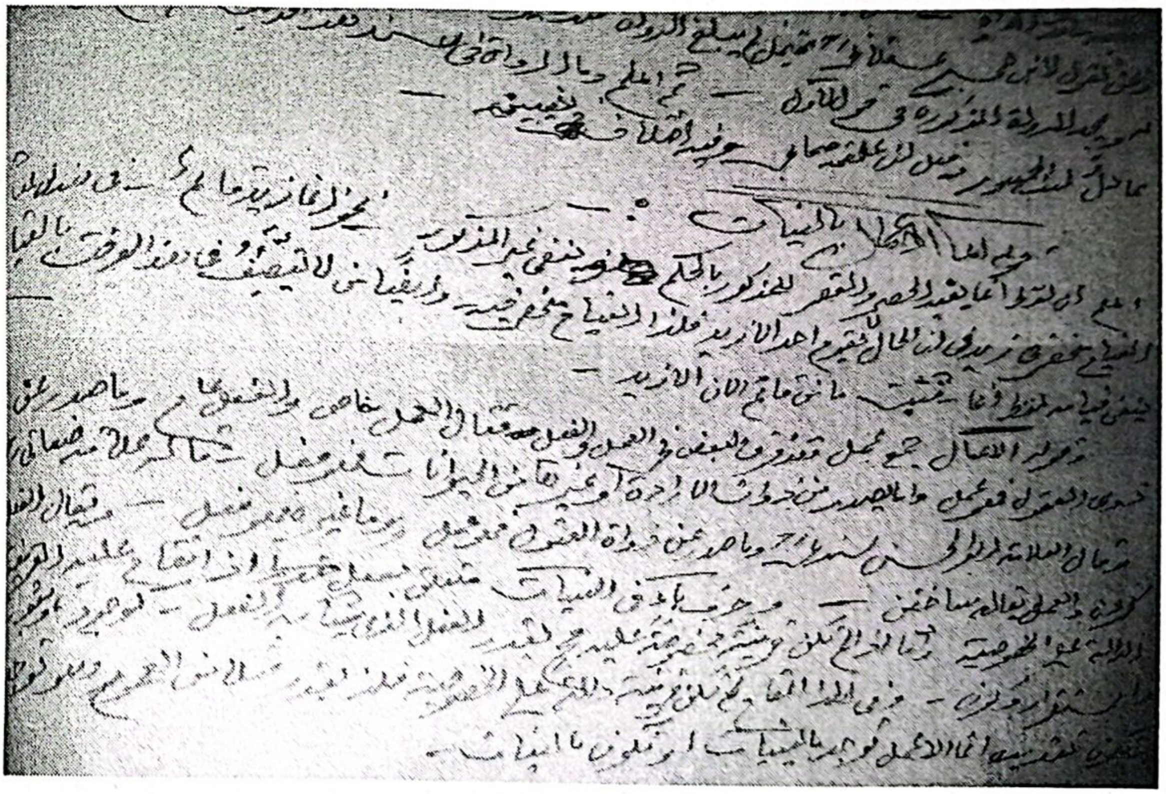
– মুহাম্মদ রিযওয়ানুল করীম

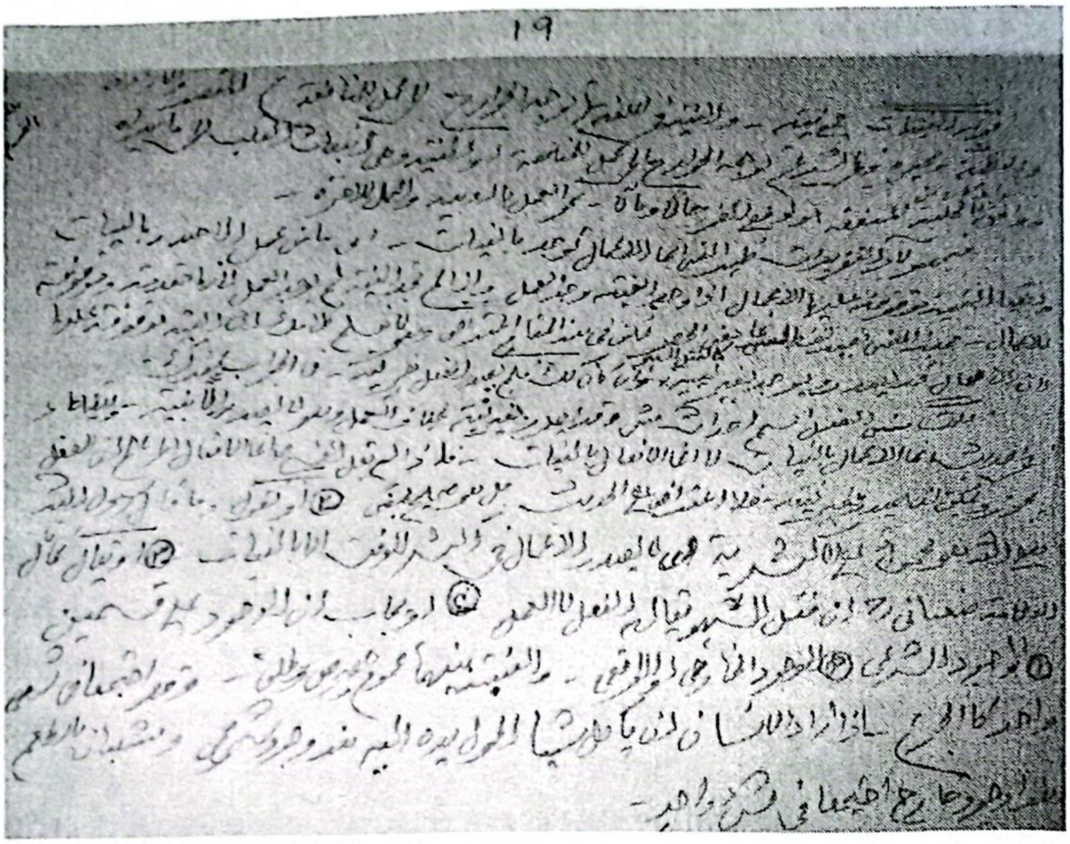
کیوں یہ جفا آئي هے !
چھل سال پیتے آئے جس کھاٹ سے هم اب حیات
کیوں چھین گئے همارے مورد کیوں یہ جفا آئی هے ؟
سونگتے تھے هم تیری هی خوشبو مهکتا گوشه دار السنت
فدا هیں هم تیرے هی واسطے پر کیوں یہ جفا آئی هے ؟
هم هیں شیدا تیرے علوم کا فنون میں ملی عظیم دولت
فن حدیث کائے نهر بےتاب بول کیوں یہ جفا آنی هے ؟
لبوں میں تھی تیری مسکراهٹ نگاهوں میں ٹپکتی الفت
گرویده هیں هم تیرے هی واسطے پرکیوں یہ جفا آنی هے ؟
جنت الفردوس هو جائے پناه دربار پڑداں رب العزت
فریاد هیں تیرے هی عشاق کا پر کیوں یہ جفا آئی هے ؟

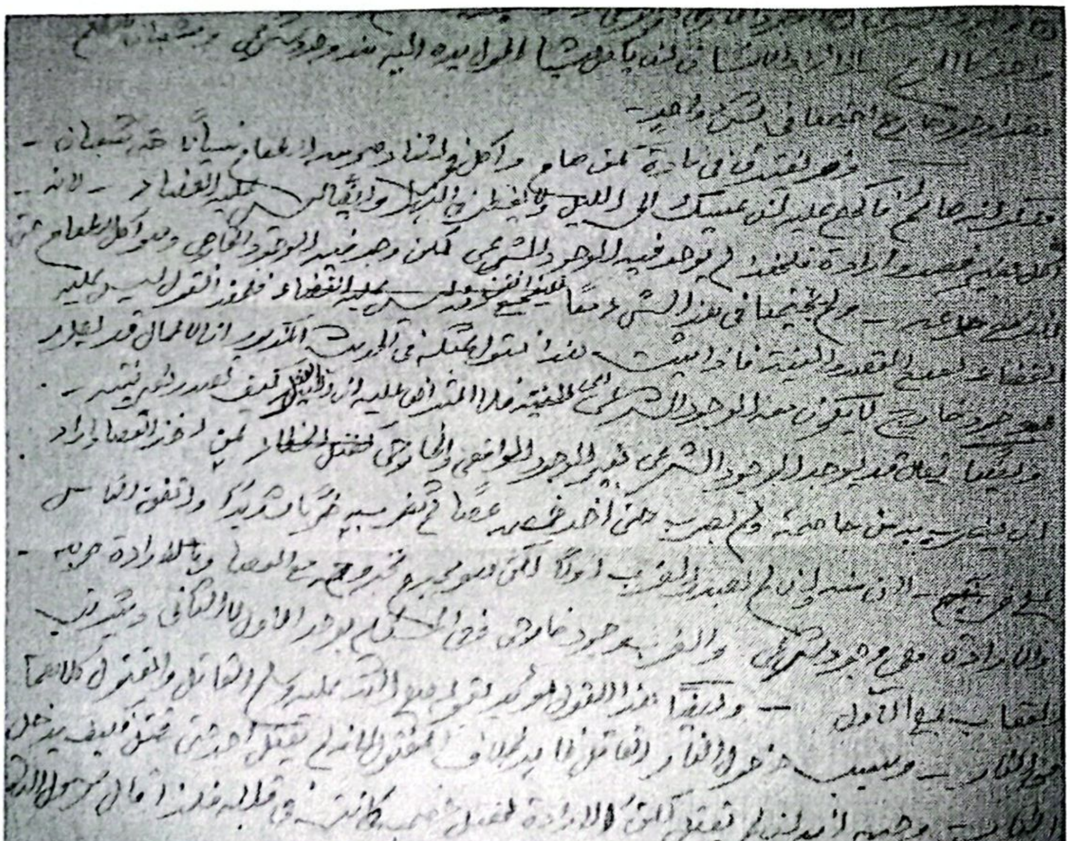
তাকরীরে আল্লামা খোতানী

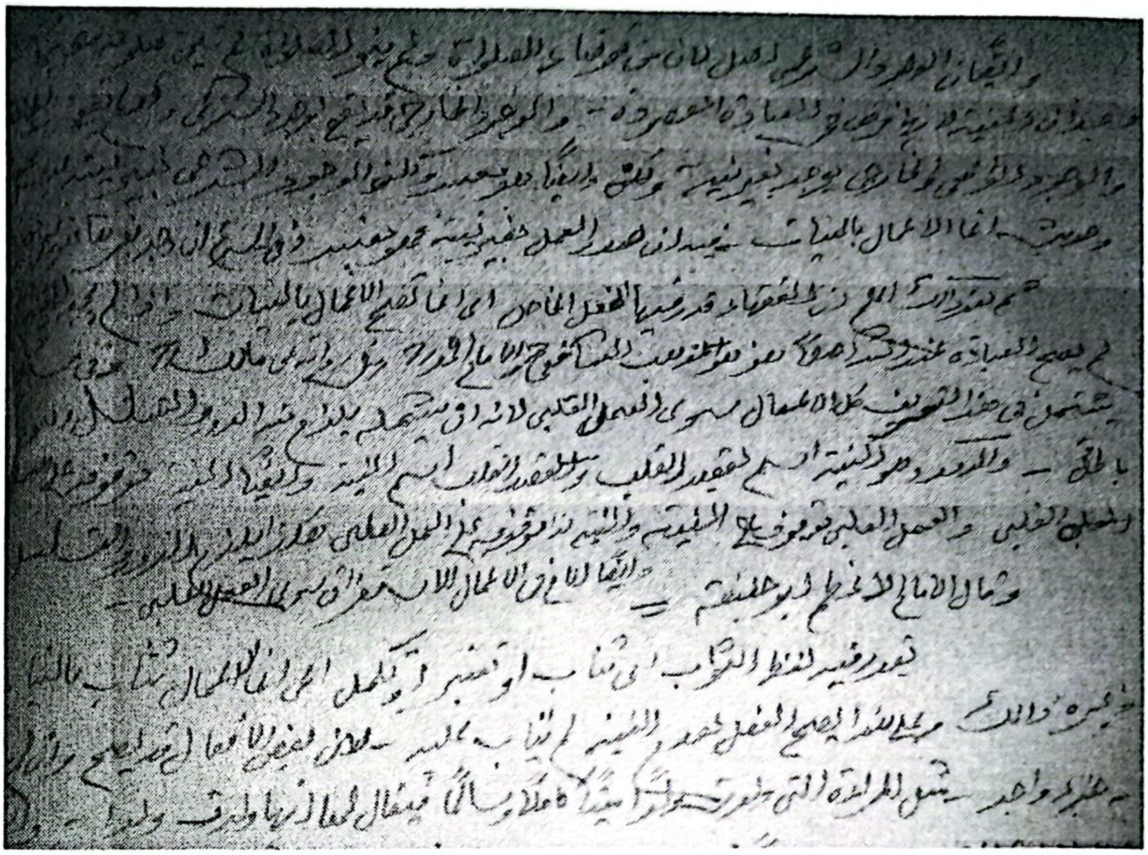
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ছারছীনা শরীফে দীর্ঘ ৪১ বছর হাদীসের দরস প্রদান করেছেন। তার দরসের সারগর্ভ তাকরীর যোগ্য শাগরেদদের কাছে লিখিত আকারে সংরক্ষিত আছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা এ তাকরীরগুলো সংগ্রহ করে অনুবাদ করে জাতির সামনে পেশ করার। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং সকলের দুআ ও সহযোগিতা কামনা করি।

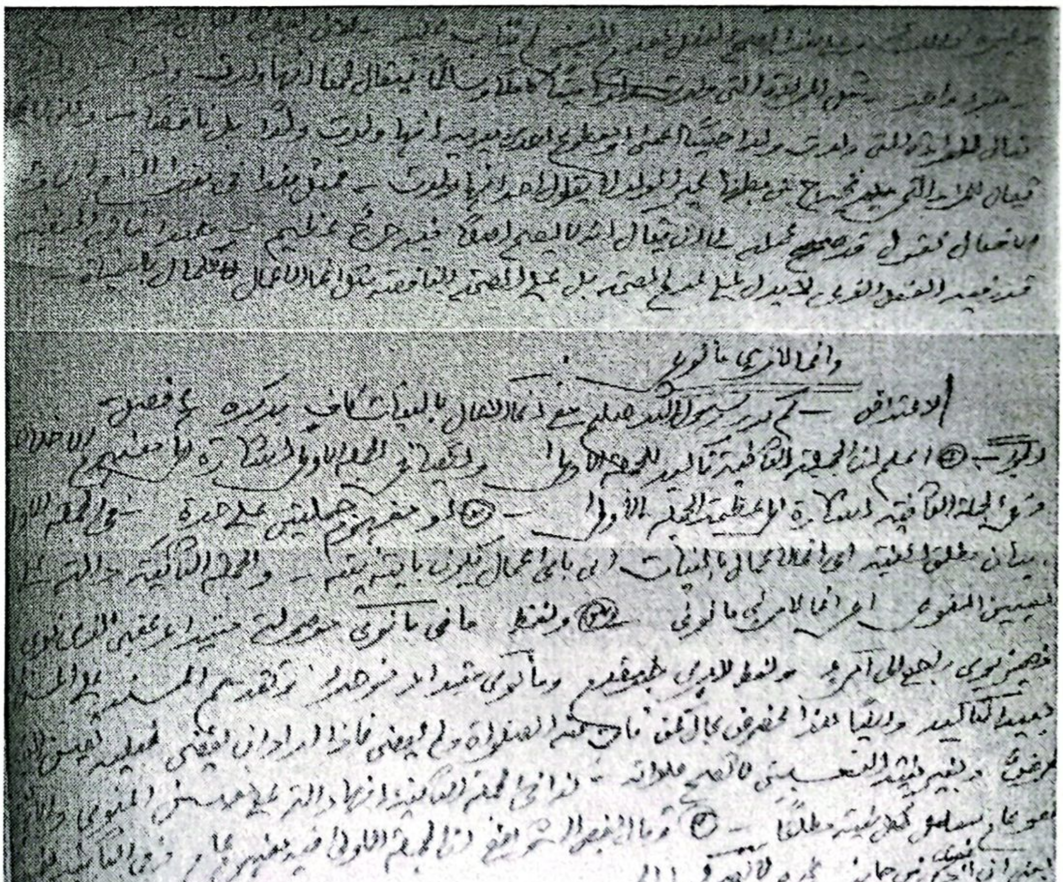
আল্লামা খোতানী র. এর অন্যতম শাগরিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ কাফিলুদ্দীন সরকার। তার স্বহস্তে লিখিত আল্লামা খোতনী র. তাকরীরের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে। তা থেকে গুরুত্ব বিবচেনা করে তিনটি হাদীসের তাকরীরের অংশ বিশেষ নিম্নে হুবহু মুদ্রণ করা হল। প্রথমত: বোখারী শরীফের প্রথমের নিয়তের হাদীস, দ্বিতীয়ত ১৯৮৩ সনের ৯ ফেব্রুয়রি ক্লাসে দরসে প্রদানকৃত কিতাবুল ইলমের একটি হাদীস, এবং মিরাজের হাদীসের ৬১ পৃষ্ঠা তারকীরের কিছু অংশ-

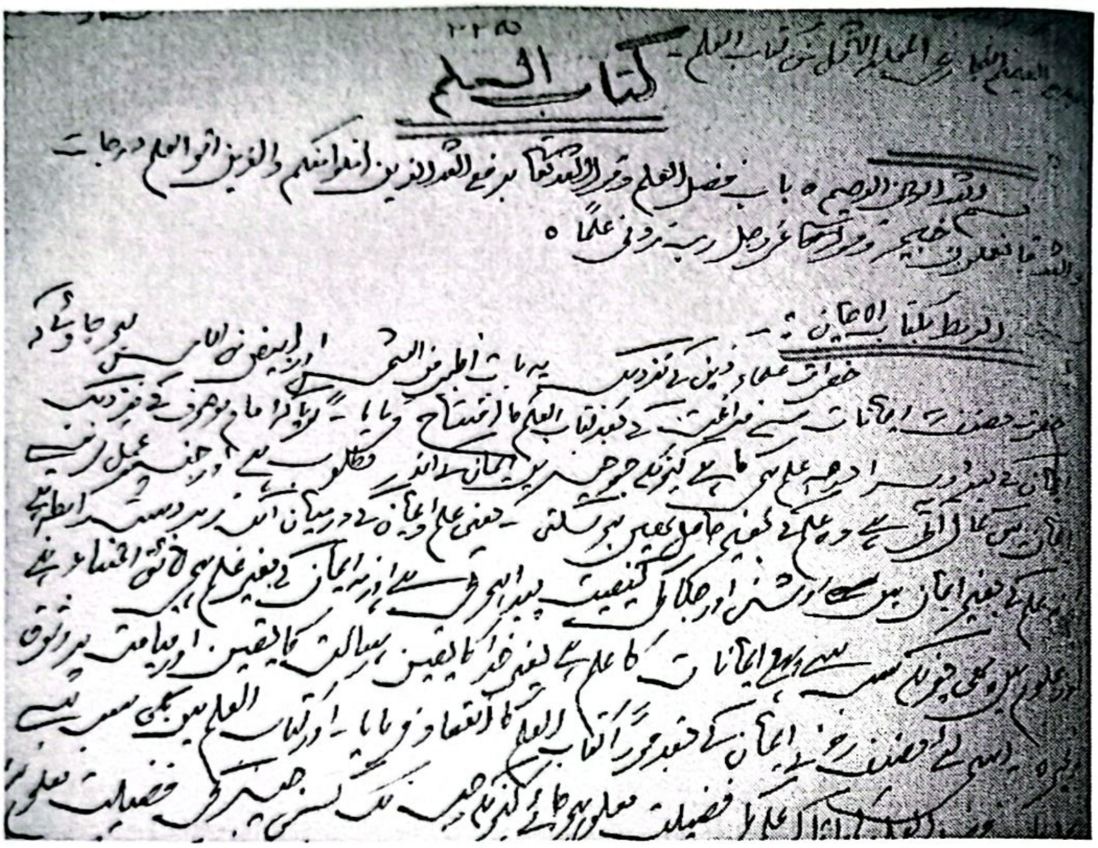



١٩





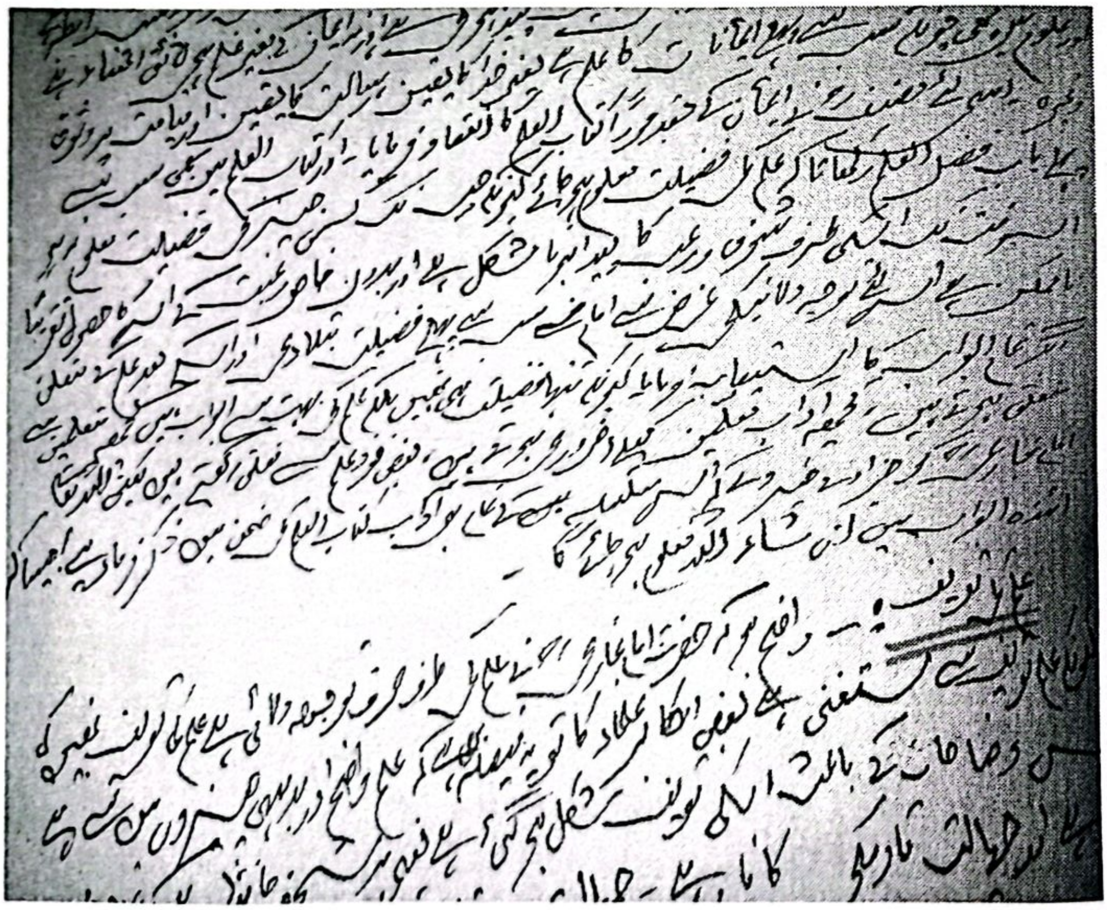




۲۲۵

كتاب العلم

باب فضل العلم وقول الله تعالىٰ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما



[illegible]

امام بخاری کے جو فوائد ہیں ... اسی سلسلے میں کے بجائے ہو گی کتاب العلم کے ضمن میں جو زیادہ لیے اچھا ہے

اشدہ ابواب میں ان شاء اللہ معلوم ہو جائے گا۔

علم کی تعریف ہے۔ واضح ہو کہ حضرت امام بخاری نے علم کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی ہے علم کی تعریف نہیں کی کیونکہ علم کی تعریف سے مستغنی ہے بعض اکابر علماء کا تو یہ خیال ہے کہ علم واضح اور بدیہی چیزوں میں سے ہے مزید بسط وضاحت کے باعث اسکی تعریف مشکل ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محقق جانتا ہے کہ علم جہالت کی ضد ہے اور جہالت تاریکی کا نام ہے۔ جہالت میں تمام چیزیں چھپی رہتی ہے اور جب علم کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو وہ چیزیں واضح ہونے لگتی ہے۔ اس لیے مصنف نے خود تعریف سے کوئی بحث کیا۔ شارحین کا خیال ہے کہ یہ کتاب چند حقائق بیان کرنے کے لیے ترتیب دی ہے لہذا تعریف بہت لمبی ہے۔

اختلاف تراجم اور الزام تکرار:-

... نسخہ عینی شود کہ باب فضل العلم کا یہ ترجمہ بعض نسخوں میں اور بعض میں نہیں ہے۔ باب قول اللہ عز وجل کتاب العلم سے متعلق ہے اور عبارت اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم وقول اللہ الآیۃ کیونکہ امام بخاری کی عادت میں سے ہے کہ جس کتاب میں تو ایک مناسب آیت لاتے ہیں جس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں آیت بالا جیسے کہ اس کے ذیل میں جو مقصود ہے آرہے ہیں وہ سب اس ماخوذ اور منبع سے متعلق باب فضل العلم نہ ہو تو قول اللہ کتاب العلم سے متعلق رہیگا۔ اور اگر باب فضل العلم ہو تو پھر اسکے نیچے کیا ہی جلکہ خود مصنف نے ایک باب و فضل العلم، ہی کے عنوان سے قائم کرے گا اسکے بعد ایک باب ذیل میں وہ حدیث بھی فضیلت علم ہی پر دال ہے اس لیے اگر فضیلت علم ہی کا مسئلہ یہاں بھی ہو تکرار ہو گا جو مصنف کی شان سے بعید ہو گا۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے علامہ عینی نے ارشاد یہاں مقصود علماء کی فضیلت کا بیان ہے گویا باب فضل العلم سے مراد باب فضل العلماء ہے۔ ایک جگہ علم کی فضیلت ہے اور دوسری جگہ علماء کی۔ اب تکرار نہیں رہا۔ تکرار سے بچنے کی یہ راہ ... درست ہے لیکن علامہ ... سے ... زیادہ غیر مناسب بات [illegible]

یہاں بعض علماء نے [illegible] فضیلت [illegible] علماء [illegible]

اور یہ حکم علم کی فضیلت ہے اور [illegible] یا وہ غیر مناسب بات

کیونکہ حدیث میں ورثہ ہے لیکن علماء [illegible] کا تعلق فضل علماء سے ہے [illegible] فضل علم [illegible]

نے اسے کیسے دلیل بیان کی ہے قرآن آیات [illegible] علماء کا [illegible] فضیلت [illegible]

اگر مان لی جائے تو ہم علامہ [illegible] یہ سوال [illegible] علماء میں فضیلت کہاں [illegible]

علاوہ اور تو ہے۔ پھر اگر علم کی فضیلت [illegible] با جود پیغمبر علیہ السلام [illegible]

آپ [illegible] فضیلت سے متعلق ہے [illegible]

[illegible] علم کا حکم دیا جاتا رہا ہے۔ [illegible] علم کی فضیلت [illegible]

فضل العلم کا باب [illegible]

[illegible] علامہ عینی [illegible] بات دل لگتی نہیں ہے

الف۔ زیادہ کا صحیح جواب || [illegible]

[illegible] علامہ عینی رح نے جواب دیا ہے اس سے اچھی اور مناسب بات [illegible] فضل کے معنی

کیا جائے [illegible] میں گنجائش بھی ہے تو یہ بات [illegible] واضح ہو جاتی ہے۔ فضل کے

معنی ہیں ① ایک فضل یعنی فضیلت ② دوسرے فضل بمعنی ما فضل یعنی زائد۔ یہاں فضل

کے معنی ہیں [illegible] سے معلوم ہوتا ہے [illegible] فضل بمعنی ما فضل [illegible]

جیسا کہ ارشاد الٰہی [illegible] حافظ ابن حجر [illegible] بمعنی اختیار [illegible]

سنن النسائی، المجلد الاول، کتاب الصلوٰۃ

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

من المسجد الحرام — المسجد الاقصیٰ — السدرۃ المنتہیٰ — الی عرش اللہ

عن ابی ھریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرای فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتھا ... وقد رأیتنی فی جماعۃ من الانبیاء فاذا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قائم یصلی ... الحدیث

(الف)

اجمالی تبصرہ:— الاسراء او سبحان اللہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ

واضح ہو کہ معراج حضور ﷺ کی خصوصیت میں سے ہے جو آپ سے قبل کسی انبیاء علیہم السلام کو نصیب نہیں ہوئی اور حضور ﷺ کی خصائص [illegible] ... ہے جس میں رب العالمین نے آپ کو [illegible] نماز کو [illegible] عنایت فرمایا اور [illegible] دوسری خصوصیت [illegible] حضور اقدس ﷺ [illegible]

معنی الاسراء والمعراج لغۃ و اصطلاحاً:—

معنی الاسراء والمعراج لغۃً واصطلاحاً :-

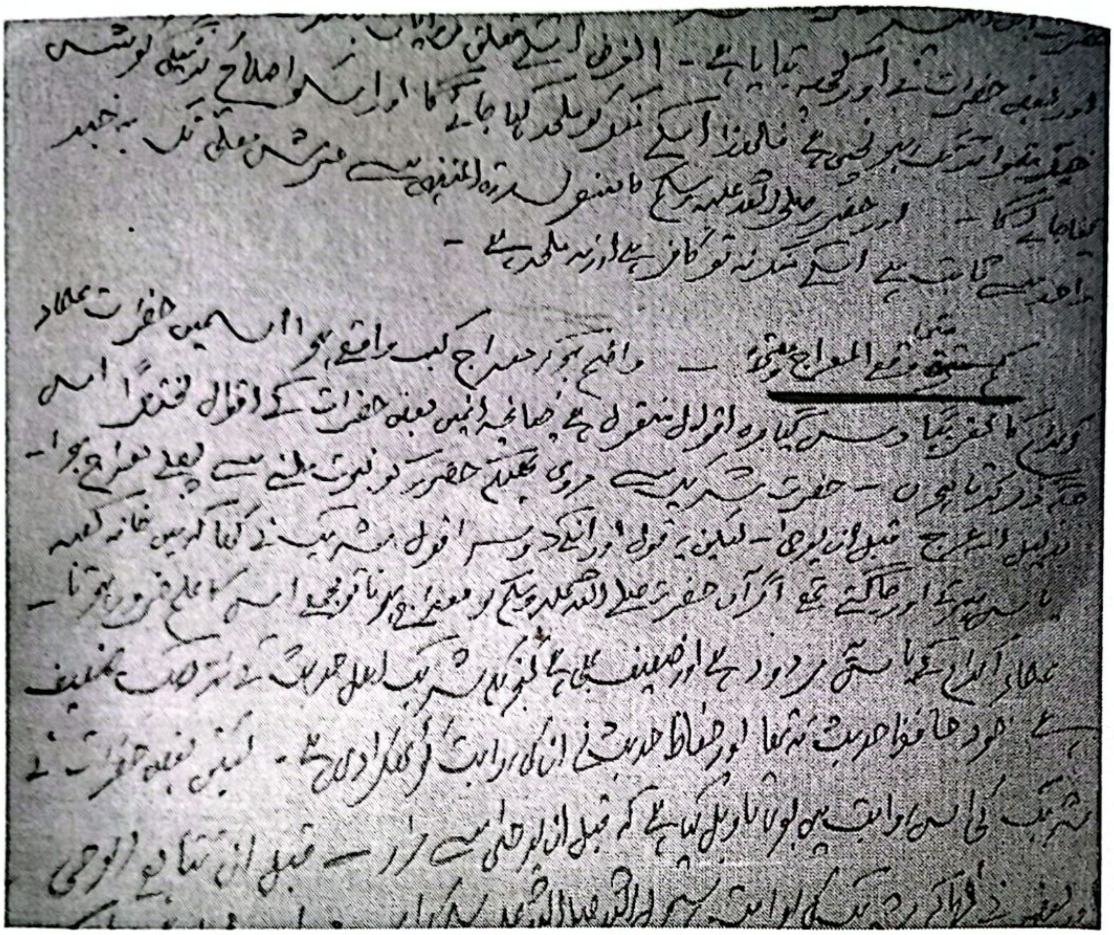
علامہ ابن حجر شرح متین کے باب ... من الاسراء ہو چلے اور اسراء کے لغوی معنی رات کو چلنا ہے یا چلانے یا لے جانے کے معنی لغت کے اعتبار سے شائع و صادق ہے جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے — سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الخ — چنانچہ اس میں اسراء کا معنی ایک زمین سے دوسری زمین تک لیجانے کے معنی میں مستعمل ہے — اور انہی جیسے سفر کو اسراء سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ یعنی حضرت [illegible] کو یہ جیسے [illegible] آیا تھا اس لیے اسکو اسراء کہتے ہیں — اور اصطلاح شریعت میں حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے بیت المقدس تک شریف لیجانے کو اسراء کہتے ہیں —

معراج — واضح ہو کہ لفظ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی سیڑھی کے آتا ہے یعنی جس کے ذریعہ سے اوپر کی طرف چڑھا جاتا ہے اسکو معراج کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم آلہ کا صیغہ ہے یا معراج کا معنی عروج الی الاعلی ہے — چونکہ احادیث میں آپ صلے اللہ علیہ وسلم سے لفظ عرج بھی مروی ہے اسی لیے اسکا نام معراج ہوا — اور اصطلاح شریعت میں حضور صلعم کا مسجد اقصی سے عرش الٰہ تک سفر کرنیکو معراج کہتے ہیں — نیز حضور صلعم کے اس سفر کو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بھی کہتے ہیں —

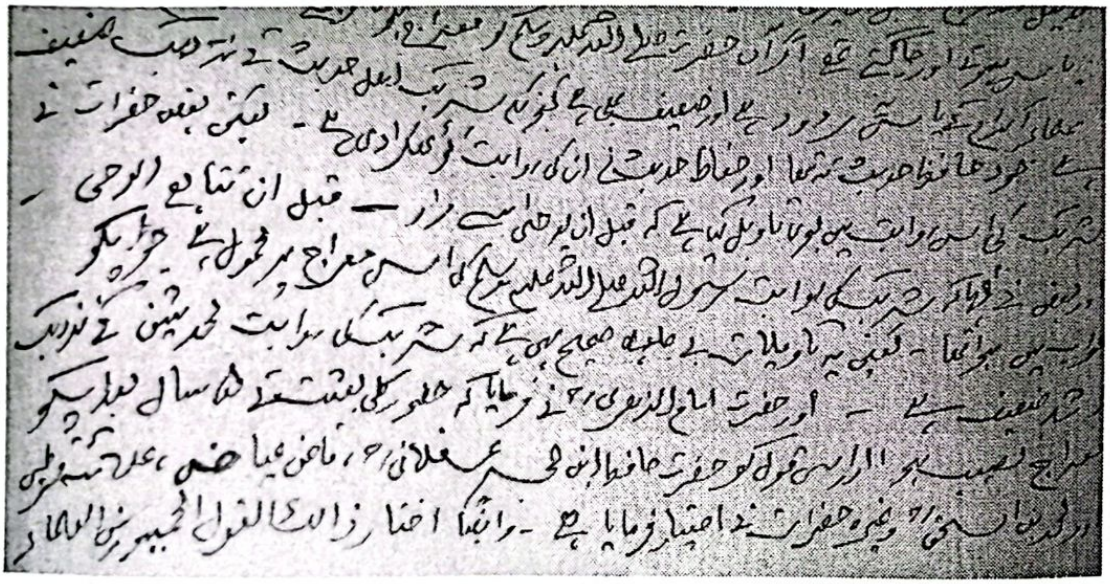
الحکم للمنکر بین الاسراء رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم :-

حضرات فضلاء کے مابین میں یہاں پہنچ کر [illegible] حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لیجانا یہ دلیل قطعی — سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الآیۃ — سے ثابت ہے اسکے منکر کو باتفاق جمیع علماء کافر بولنا صحیح اور درست ہے — باقی نبی پاک کا سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک بہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے بلکہ خبر متواتر سے ثابت ہے لہذا اس سفر من المسجد الاقصی الی سدرۃ المنتہی کی حدیث کی رواۃ کے متعلق جو شمار کیا گیا ہے تو انکی تعداد [illegible] تک پہنچی ہے حضرت ابن کثیر نے رواۃ اسراء المعراج کی تعداد چوبیس ۲۴ بتایا ہے — اور بعض حضرات نے چھبیس ۲۶ اور بعض حضرات نے اور کچھ بتایا ہے — الغرض اسکے متعلق روایات بالکثرت موجود ہیں جو حد تواتر تک پہنچی ہے فلہذا اسکے منکر کو ملحد کہا جائے گا اور اسکو اصلاح کی تنبیہ کوشش کیا جائے گا — اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہی سے عرش تک [illegible] سے ثابت ہے [illegible]



اور بعض حضرات نے اسکو صحیح بتایا ہے۔ الغرض اسکے متعلق ... اور اسکی اصلاح و تبدیلی کوشش
حقیقت معلوم نہیں ہو سکی ہے فالحاصل اسکے منکر کو ملحد کہا جائے گا اور اسکو ... معراج تک بہ جسد
کیا جائیگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول سدرۃ المنتہیٰ سے عرش معلیٰ تک
احادیث سے ثابت ہے اسکے منکر نہ تو کافر ہے اور نہ ملحد ہے۔

مسئلہ: معراج کب واقع ہوئی — واضح ہو کہ معراج کب واقع ہوئی اس میں حضرات علماء
کرام کا کافی اختلاف ہے اس بارہ میں اقوال منقول ہیں چنانچہ انہیں بعض حضرات کے اقوال مختلفاً اسمیں
ذکر کرتا ہوں — حضرت شریک سے مروی ہے کہ حضور کو نبوت ملنے سے پہلے معراج ہوا۔
قبل المعراج ... لیکن یہ قول اور انکے دوسرے اقوال ... نے کہا کہ میں خانہ کعبہ
یا ... ہوا اور جاگتے تھے اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتا تو ... کا علم ضرور ہوتا۔
علمائے کرام نے کہا یہ قول مردود ہے اور ضعیف بھی ہے کیونکہ شریک اہل حدیث کے نزدیک ضعیف
ہے ... حافظ حدیث نہ تھا اور حفاظ حدیث نے ان کی روایت کو رد کر دیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے
شریک کی اس روایت میں ... تاویل کیا ہے کہ قبل ان یوحیٰ الیہ سے مراد — قبل ان یتتابع الوحی
بعض نے ذکر کیا شریک کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ...



یا ... ہوا اور جاگتے تھے اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ... شریک ضعیف
علمائے کرام نے کہا ... مردود ہے اور ضعیف بھی ہے کیونکہ شریک اہل حدیث کے نزدیک ... لیکن بعض حضرات نے
ہے ... حافظ حدیث نہ تھا اور حفاظ حدیث نے ان کی روایت کو رد کر دیا ہے۔
شریک کی اس روایت میں ... تاویل کیا ہے کہ قبل ان یوحیٰ الیہ سے مراد — قبل ان یتتابع الوحی —
بعض نے ذکر کیا شریک کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمیں معراج پر محمول ہے جو آپکو
خواب میں ہوا تھا۔ لیکن یہ تاویلات بے جا ہیں صحیح یہی ہے کہ شریک کی روایت محدثین کے نزدیک
شاذ ضعیف ہے — اور حضرت امام الزہری ... نے فرمایا کہ حضور کی بعثت کے ۵ سال بعد آپکو
معراج نصیب ہوا اس قول کو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی ... قاضی عیاض ... علامہ قرطبی
و علامہ نووی ... وغیرہ حضرات نے اختیار فرمایا ہے۔ وانما اختار ذالک القول الجمہور من العلماء

মাকতুবাতে আল্লামা খোতানী

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন; আদর-স্নেহ করতেন তাঁর ছাত্র-শাগরিদদের। নিজ হাতে চিঠি লিখে তাই ব্যক্তিগতভাবে অনেকের খোঁজ-খবরও নিতেন তিনি। আমাদের ইচ্ছা আছে হুজুরের স্বহস্ত লিখিত সেই চিঠিগুলো অনুবাদ করে প্রকাশের। বক্ষমান স্মারকে খোতানী হুজুরের বিশিষ্ট শাগরিদ প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমানকে লিখা কতিপয় চিঠি হুবহু মুদ্রিত হলো;

۷۸۶

حضرت اصل الشرف ــ ومفخر السلف والخلف مولانا ابوالحسنات
محمد یحیی صاحب حفظه الله تعالی عن الآفات والمصائب۔
و ابلغ الی ما یتمناه من المقاصد والمآرب ۔
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ بفضله تعالی آپ لوگوں کی
دعاؤں کی برکت سے خیریت سے ہے ۔ خداوند کریم آپ لوگوں کو انکی
تمام احکام و مقاصد میں کامیاب کریں آمین ۔ دیگر عرض یہ ہے کہ ایک
گرامی نامہ پرُاز اخلاص ومحبت ۲۵ مارچ کو دست یاب ہوا خوشی
سے دل باغ باغ ہو گیا ہے خداوند کریم آپکے عمرہ مبرورہ کو اور تمام نیک دعاؤں کو قبول
فرماویں آمین ۔ میں نے مولانا حافظ سلیمان صاحب اور خانصاحب کے متعلق
کچھ لکھا تھا آپنے حافظ صاحب کیلئے انتظام فرمایا میرا درخواست قبول فرمائیگا
شکریہ ۔ حافظ صاحب کا ریاض جانیکا منتخب بھی ہو گیا انشاء اللہ آئندہ
ریاض بھی جائیگا ۔ میں نے حافظ کیمعرفت آپکے والدہ اور اہلیہ محترمہ
اور لخت جگر نو مولود ہ کی بھی حالات دریافت کیا سب بخیریت
سے ہیں ۔ دیگر عرض یہ ہے کہ مولانا محمد حسین صاحب ... سے
کامل حدیث ۔ کامل فقیہ پاس کرکے آپکے مدرسہ میں مدرس بھی رہا
قابل شخص ملک کے حالات کے زمانہ میں ایک پاؤں میں گولی لگ ایک
پاؤں کو شہید کردیا گیا ہے لاٹھی کیذریعہ سے چلتا ہے میں آپکے
خط میں ایک خط مولانا محمد حسین صاحب کے نام پر دیا ہے اگر ممکن ہو انکو بلوالیا
دیں تو مہربانی ہوگی ریاض یونیورسٹی میں تعلیم حاصل
کرنا چاہتے ہیں چونکہ انکے ادریس معلوم نہیں لکھا تھا محمد عبد الله
صاحب کیمعرفت ایکسو روپیہ روانہ کیا براہ راست خط
لکھ نہیں ادریس معلوم نہیں اسلئے آپکے معرفت خط
لکھدیا ہے ۔ الداعی محمد نیاز مخدوم ختنی ۔ انشاء الله تعطیل کے
بعد دعا کرنے جاونگا آپکے سلام سبکو پہونچادونگا
میرا دعا کہ سب ... جائیں حافظ صاحب
اور مولانا ابو السلام سب ۔ دعا ورد کرتے ہیں ۔
الداعی محمد نیاز مخدوم ختنی ۔ ۳۰ ... ۱۵ رجب المرجب ۱۴۱۲

جناب محترم ومکرم احبینا فی اللہ الحاج مولانا محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عن الآفات والمصائب وابلغہ الی ما یتمناہ من المقاصد والمآرب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض ہے آپکے اخلاص ومحبت سے لبریز مکتوب گرامی ملا پڑھکر بیحد مسرت حاصل ہوئی آپنے مجھکو مشورہ کا اہل سمجھکر استفسار فرمایا شکریہ اللہم وفقہ لما تحب وترضا۔ آپنے اپنے والد محترم کیطرف حج کیا ہے اللہم اجعلہم حجا مبرورا وعمرۃ متقبلۃ۔ آپنے اپنے صحت کیمتعلق فرمایا میں آپکی صحت کاملہ وصحت عاجلہ کیلئے دعا کیا ہے۔

مولانا المحترم آپ جیسا بھی ہو ریاض کی ملازمت کو ترک مت کیجئے۔ اسمیں بہت سے فوائد میرے نظر میں معلوم ہوتا۔ جن ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر سال حج عمرہ کرسکینگے بنگلہ دیش سے حج کرنے میں کم از کم چالیس ہزار روپیہ کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ مولانا نور الہدیٰ صاحب ملازمت کر لیا ہے لیکن مولانا حافظ سلیمان صاحب اور تیسرے ابھی تعلیم میں مشغول ہرچہ خراجات کیضرورت ہے آئندہ نکاح شادی کی قصہ ہے۔ اپنے والدین پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے آپ ہی کرنا پڑیگا لہذا آپکا ریاض میں ملازمت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اسکی علاوہ عربی وانگریزی زبان مہارت تامہ حاصل ہوگی۔ اور آپکو کچھ زمین جائداد کرنا بھی ہوگا بعد بقیہ ملازمت کے بعد کی زندگی آرام سے گذار سکتے۔ لہذا فی الحال

مولانا الحاج مدنی حسن صاحب سلام مسنون عرض ہے

ریاض میں رہنا مناسب سمجھتا ہوں۔

عید میں میں ڈھاکہ گیا تھا۔ میں نے محترم مولانا حافظ سلیمان صاحب، آپکے والدین مکرمین اور آپکے اہلیہ محترمہ اور آپکے صاحبزادی مدظلہما کی حالات دریافت کیا سب خیریت سے ہیں۔ آپکے والد محترم مدظلہ العالی مولانا نور الامین صاحب اور مولانا حافظ سلیمان صاحب کی شادی کے متعلق مجبور کر رہا ہے۔ مولانا نور الامین صاحب کی شادی تو فی الحال ضرور کرانا چاہئے چونکہ تعلیم سے فارغ ہو چکی اور کمائی کی صورت بھی ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ سلیمان صاحب فی الحال فارغ نہیں ہوا ابھی پڑھ رہا ہے فراغت کے بعد شادی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپکا ارادہ کیا؟ اگر آپ متفق ہے تو والد محترم کو مطلع کیجئے حافظ صاحب کی شادی فراغت کے بعد ہونا چاہئے۔ شاید مان جائیگے بھی ارادہ ہے۔ باقی آپ جو مناسب سمجھے وہی کیجئے۔

دیگر عرض یہ کہ آپنے میرے ساتھ محبت و خیر سگالی کرنا یا کہ ریاض میں رہنے کے متعلق مشورہ طلب کر کے میرے عزت افزائی فرما یا۔ آپنے اس سے پہلے بھی کئی بار اس قسم مشورہ طلب کیا۔ اگرچہ میں مشورہ دینے کی قابل نہیں ہوں۔ صرف آپنے میرے لئے عزت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپکو بھی عزت و احترام و آرام اور ترقی دارین سے مالا مال کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ فقط۔ والسلام

محمد شیاز کشمیر عفی عنہ۔ آپکے مسئلہ کا انشاء اللہ دعا کہ مسئلہ ہو جائیگا دو مہینے کے بعد

جناب محترم اخی فی اللہ مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدکم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہے آپ کی
خیریت خداوند کریم سے مطلوب ہیں۔ ایک خوش خبری یہ ہے
جناب پیر صاحب قبلہ یکم دسمبر ۳½ بجے خلاص پا کر
سرسینہ پہونچا محفل میں شریک ہوا مریدین و متعلقین خوش
کیوجہ سے سرسینہ کے [illegible] اطراف و اکناف للائق دید تر
دیگر عرض یہ ہے کہ ۲۵ نومبر بمعرفت شریف صاحب دو عدد سیو
اور چشمہ کی غلاف موصول ہوا۔ ۳۰ نومبر بمعرفت مولانا عبد اللہ
صاحب اور صوفی صاحب ایک عدد لحاف دو عدد ڈاو ایک سیر اور
ایک پونڈ مٹھائی پان ملا ہے۔ اور خط بھی ملا ہے۔
دیگر عرض یہ ہے کہ ایک خط جناب الحاج شرف الدین صاحب
کی خدمت میں روانہ کر دیا ہے اگر آپکا تقرر ہو گیا ہے تو خط
اپنے پاس رکھ لیجئے خط حاجی صاحب کو مت دیجئے اور میری
طرف سے سلام عرض کیجئے اگر تقرر نہیں ہوا اور امید ہے تو خط
حاجی صاحب کو دیدیجئے۔ آپکا ایک کارڈ بھی ملا ہے میں بکر اور
عید الاضحیٰ سے ایک ہفتہ پہلے ڈھاکہ جانے کا ارادہ ہے محفل کے بعد
شرف دو روز کے تعطیل ہے۔ دوست احباب کی خدمت میں
مسنون عرض ہے۔ محمد ضیاء و غیرہ خادم دار السنت مدرسہ عالیہ
سرسینہ ۲ ۱۲/۷۳
شریف صاحب کی معرفت کمبل ملا ہے۔

بخدمت جناب اُخیینا فی اللہ مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہے اور آپ لوگوں کی خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہے دیگر عرض یہ ہے کہ آپ جب سے ڈھاکہ گیا اپنے حالات سے مطلع نہیں کیا۔ امامت کی قصہ کیا ہوا مطلع فرمائے۔ ۲۳ر نومبر مولانا عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ۲۴ر کو ڈھاکہ جا رہا ہے آپ سے ضرور ملاقات ہو جائیںگے۔ میرا مندرجہ ذیل سامان مولوی عبد الرحیم صاحب کی معرفت کرے تب بہی اچھا ہے وہ صوفی صاحب اسسال محفل میں آئیگا یا نہیں معلوم نہیں محفل کے بعد صرف تین روز کے تعطیل اس تعطیل میں ڈھاکہ جانا شاید مشکل ہوگا عید الاضحی کے تعطیل میں ڈھاکہ جاؤنگا مولانا عبد الرحیم صاحب کی معرفت مندرجہ ذیل سامان ان کو گھر سے منگاکر روانہ کر دیجئے ایک عدد توشک دو عدد سیرو ۔۔ چشم کی غلاف ایک ٹین کا جار تین عدد ڈاو۔ ایک پونڈ ساجو پان ایک سیر ادرک (ادھا) روانہ کر دیجئے سنٹری امتحان ہو رہا ہے جدید کامل جماعت بہی شروع ہو گیا ہے میرا اسباق جاری ہے اور حضرات سب کام میں مشغول ہے۔ جناب الحاج شرف الدین صاحب کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے آپکا خادم محمد ضیاء الشمس محمود

۲۴/۱۱/۷۳

جناب محترم ومکرم اخی فی اللہ مولانا محمد یحییٰ صاحب

حفظہ اللہ تعالیٰ عن الآفات والمصائب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیر وعافیت میں ہے۔ خداوند کریم آپکو بھی خیر وعافیت کیساتھ تمام اغراض ومقاصد میں کامیاب کریں آمین۔ دیگر عرض یہ مدرسہ میں عالم فاضل کامل کا امتحان ہوچکا ہے امتحان میں بہت تشدد عمل ہوا ہے تین دن میں ۲۴ طلبہ ایکسپیل ہوگئیں۔ آئندہ کیا ہوگا! مدرسہ میں جدید عالم فاضل کامل اسباق جاری ہے۔ ۲۲ مئی سے چھٹی ہے۔ باقی داخل جماعت چھٹی نہیں ہے وہ لوگ ایام تعطیل پڑھینگے جو نیے مدرسین کا بھی چھٹی نہیں۔ حافظ سلیمان صاحب بھی خیریت سے ہیں۔ ۲۰ر مئی وہ گھر جائینگے۔ میں انکو ملاکر کے آپکو خط کو ملکر بھیجنے کیلئے لکھا ہے۔ جناب الحاج شیخ فخر الدین صاحب وشہاب الدین صاحب اور محمود صاحب اور جماعتوں کیخدمت سلام مسنون عرض ہے۔ میں الداعی محمد نیاز مخدوم غفرلہ۔ ۱۴ ۵/۲۶

حامل مکتوب مولانا علاء الدین صاحب ہمارا معمار بہت مخلص شاگردوں میں سے ہیں انکا خیال رکھیئے۔ محمد نیاز مخدوم غفرلہ۔ ۱۴ ۵/۲۶

جناب محترم مولانا محمد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ
بندہ خیریت سے ہے۔ آپکی خیر و عافیت
خداوند کریم سے مطلوب ہے۔
۱۶ کو ایک شخص کیمعرفت دو سو روپیہ
روانہ کیا تھا شاید ملا ہوگا۔
دیگر عرض یہ ہے کہ فاضل اول کے مولوی عبدالحق
صاحب کیمعرفت ۲۰۰ روپیہ روانہ اسکے لئے
[illegible] والا [illegible] دو [illegible]
روانہ کر دیئے۔ اور حافظ صاحب
صاحب پڑھنے میں مشغول ہیں۔
باقی سب خیریت سے ہے۔
آپکا خادم محمد نیاز [illegible]
۱۹/۲/۷۶ نہایت عجلت سے
لکھا ہے۔

جناب مولانا محمد یحییٰ

ابو الخیرات روڈ

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیر و عافیت سے ہے۔
خداوند کریم سے آپکی خیر و عافیت مطلوب ہیں۔
دیگر عرض یہ ہے کہ میں نے لڑکیوں کے قلم اور کتاب کیلئے بیس روپیہ
اور سیری کیلئے ستر روپیہ علیحدہ دیکر آیا تھا کیا ہوا۔ مطلع فرماویں۔
پیر صاحب ۱۲ جون کو سرسینہ سے چار بجے شام چلا گیا اور اسکے بعد حافظ علیم
دو روز قیام فرمانے کے بعد سرسینہ روانہ فرماویں گے اگر کچھ
روانہ کرنا ہے اسکی معرفت روانہ کر سکتا ہے۔ آپکا بھائی حافظ
صاحب خیریت سے ہے۔
جناب الحاج شرف الدین صاحب اور محترم ماسٹر صاحب اور [illegible]
صاحب کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے۔ الداعی محمد نیاز [illegible]
۸/۶/۷۶۔

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ عن الآفات
والمصائب و وفقہ اللہ الی ما یحبہ من المطالب و المآرب

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہو آپکے
خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہیں۔ آمین۔
دیگر عرض یہ ہے کہ حافظ سلیمان صاحب مدرسہ میں
داخل ہو گیا ہے شاید اسنے خط لکھا ہوگا۔
چونکہ داخلہ کیلئے امتحان دینا شرط ہے۔ میں نے پرنسپل
صاحب سے بھی کہا ہے حافظ صاحب مولانا محمد یحییٰ صاحب کے بھائی
ہیں۔ مولانا صاحب نے سرٹیفیکیٹ بھیجا ہے۔ متعلق مولانا
عبد القادر صاحب کھلتوی تھا ان سے بھی میں جاکر کہا
مولانا محمد یحییٰ صاحب کی بھائی حافظ سلیمان صاحب امتحان
دینے کیلئے آرہا تھا خیال رکھیگا۔ میں حافظ صاحب
سے بھی کوئی تکلیف ہو۔ یا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو
میرے پاس آئے کہا لیکن ابتک کوئی شکایت سنے بغیر
مشکل آیا ہے۔ میں الراقی محمد [illegible]

۱۹ [illegible]

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ

بعد از [illegible] مسنون عرض ہے کہ بندہ خیریت سے ہے۔ آپ لوگوں کی خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہیں۔ دیگر عرض یہ ہے کہ ابو جعفر شمس الدین صاحب کی بات میں [illegible] دیا تھا ڈھاکہ کا خانہ میں ذوالحجہ کیلئے مذکور لفافہ میں مکان [illegible] [illegible] مکان میں نہیں ملا ہے۔ دیگر عرض یہ ہے کہ میرا ڈھاکہ میں ایک چھوٹی [illegible] اور [illegible] کی غلاف رکھ گیا ہے اگر سبر سینہ آنے والا ہے تو انکی معرفت [illegible] ~~[illegible] جانے کیلئے ڈھاکہ گیا ہے ایک [illegible] عبدالمجید [illegible]~~ [illegible] انکی معرفت [illegible] روانہ کر سکتے ہیں۔ باقی پہلا خط میں [illegible] واپس آیا ہے۔ دیگر عرض یہ ہے کہ میں نے پہلا خط میں تو [illegible] کی لیلئے کہا تھا اب ضرورت نہیں ہے۔ آپکے اہلیہ محترمہ کی علاج کی معاملہ کہاں تک ہوا حافظ سلیمان صاحب پڑھنے لکھنے میں مشغول ہیں۔ باقی خیریت۔ الداعی محمد ضیاء [illegible]

۱۰ اپریل ۷۶

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون بندہ خیریت سے ہے۔ آپکے خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہے آمین۔ دیگر عرض یہ ہے کہ مدرسہ محمدیہ کے بعد یکم فروری تعطیل ہونے والی تھی تعطیل منسوخ کر دیا گیا ہے اب ڈھاکہ جانا نہیں ہوگا۔ آپکے پاس شہاب الدین صاحب کا ایک خط اسکو شہاب الدین صاحب کو پہونچا دینگے۔ مگر ہم ابتک کوئی خط نہیں ملا ہے۔ الداعی محمد ضیاء [illegible]

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ من الآفات والمصائب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہے۔ آپکی خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہیں آمین۔ دیگر عرض یہ ہے کہ میرا ایک [illegible] کمبل دہانہ میں بھول سے رہ گیا ہے اسکو آپ کسی معروف [illegible] سے روانہ کرا دیجیے۔ اور [illegible] فی الحدیث میں [illegible] کیا خبر ہے مطلع کیجیے حافظ [illegible] ۲۲ تاریخ [illegible] آیا ہے آپکے خادم [illegible] ۲۳ ۱۱/۸۷ [illegible] نہایت عجلت میں [illegible] لکھا گیا ہے۔

۷۸۶

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ من الآفات [illegible]

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہے۔ آپکی خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہیں آمین۔ دیگر عرض یہ ہے کہ آپکی اہلیہ محترمہ کی [illegible] حال ہیں؟ اور آپکی درخواست جو سوداں [illegible] کر مدینہ منورہ جانکے متعلق کیا ہوا ہے؟ اور آپکا ارادہ اب کیا ہے؟ مطلع فرماویں گے حافظ [illegible] مدرسہ میں اپنی پڑھائی میں [illegible] مشغول ہیں۔ یہاں کی حالات ایک قسم خیریت ہے۔ اسباق جاری ہیں۔ [illegible] الحاج شرف الدین صاحب خالد [illegible] شہاب الدین [illegible] سب کی خدمت [illegible] سلام مسنون عرض ہے [illegible] محمد [illegible]

۲۰/۸/۲۰۰۶ء۔

بخدمت جناب مخدوم و مکرم مولانا محمد یحییٰ

صاحب. حفظہ اللہ تعالیٰ من الآفات والمصائب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ

خیریت سے ہے۔ آپ لوگوں کی خیر و عافیت

خداوند کریم سے مطلوب ہیں۔ دیگر عرض یہ ہے کہ

آپکا خط ملا ہے پڑھکر مسرت حاصل ہوئی

آپنے جو صورت اختیار کیا ہے بہت اچھا ہے

خداوند کریم اپنے فضل وکرم سے کامیاب

آمین۔ سانگیرہ کی سیلاب کی حالات سنکر دل میں

تکالیف ہوا۔ خداوند کریم نعم البدل عنایت کرکے صبر

جمیل کے توفیق کے توفیق دیں۔

دیگر عرض یہ ہے پیر صاحب قبلہ ۱۷ اکتوبر رات کو حج

کو جا رہا ہے پھر لاگ سرسینہ سے الوداع کہنے کیلئے

دھاکہ جائینگے۔ میرے گھر سے دیڑ سیر سویا بین

تیل دینگے مذکور تیل کو سرسینہ آنے والا کیساتھ معرفت

سرسینہ روانہ کردیجے گا۔ حافظ سلیمان کے خط

ان کو حوالہ کردیا ہے حافظ صاحب پڑھنے لکھنے میں

مشغول ہے۔ چند روز آگے حافظ صاحب نے آپکے پاس

لکھا تھا شاید ملا ہوگا۔ ابھی کامل اول طلبہ سے

۸۴ تک ہوگیا ہے اور داخل ہو رہا ہے شاید

۱۰۰ تک جائیگا۔ الراقم محمد نیاز مخدوم غفرلہ۔

جناب محترم و مکرم مولانا محمد یحیی صاحب حفظہ اللہ تعالی ...

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون بندہ خیریت سے ہے آپکی خیر و عافیت ...
سے مطلوب ہیں آپکا گرامی نامہ ملا ہے پڑھکر مسرت حاصل ہو...
حافظ کو بھی خط دیدیا ہے شاید حافظ صاحب بدہ کو روانہ ...
ارادہ کیا ہے۔ دونوں لڑکوں کو بھی مدرسہ میں داخل کردیا ...
یہاں کی حالات ایک قسم خیریت سے ہے۔

جناب مولانا المحترم مولانا عبد المالک صاحب اور شہاب الدین ...
اور الحاج شرف الدین صاحب اور الحاج خانصاحب اور پٹیل ...
... سلام مسنون عرض ہے۔ الداعی محمد نیاز ...

۲۲ / ۱ / ۷۹ء

جناب محترم ومکرم الحبیب فی اللہ الحاج مولانا محمد یحیی
صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عن الآفات والمصائب۔
واوصلہ الی ما یتمناہ من المقاصد والمآرب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اخلاص ومحبت وعقیدت بھرا سلام مسنون قبول فرماویں
بفضلہ تعالیٰ آپکی دعاؤں کی برکت سے بندہ مع توابعات
خیر وعافیت سے ہیں۔ خداوند کریم آپ لوگوں کو بھی صحت
وسلامت خیر وعافیت کیساتھ تمام اغراض ومقاصد میں کامیاب
کریں آمین ثم آمین۔ دیگر عرض یہ ہے کہ ۱۱ فروری کا محبت نامہ
۲۳ فروری کو ملا تھا پڑھکر بیحد مسرت ہوئی اور آپریشن کی
خبر سنکر دل میں بیحد اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی۔
بعد از صلوٰۃ فجر مدرسہ کی مسجد میں ختم یونس پڑھوا کر خداوند کریم
کے حضور تضرع وعاجزی کیساتھ آپکی صحت کاملہ وعاجلہ کیلئے
دعا کیا اور کرایا گیا پھر خداوند کریم کیطرف سے دل میں تسلی واطمینان
نصیب ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ فوراً خط سے اطلاع کرونگا افسوس کہ
بعض مشغولات کیوجہ سے فرصت نہیں ملی۔ مذکورہ خط کو لیکر ڈھاکہ
گیا تھا کہ وہیں سے خط لکھونگا۔ افسوس کہ وہاں پر بھی کوئی موقع نہیں
ملا۔ مولانا حافظ سلیمان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی معرفت آپکے
حالات سے مطلع ہوتا رہا اسلئے بھی کہتا میں خط لکھ رہا ہوں ایک خط
لکھ دیجئے لیکن میں نے فرصت نہ ملنے کیوجہ سے خط نہیں لکھ سکا۔ فاطمہ کی ماں
نام کی بہن آپکی ایک خط تھا اس نے خط لکھنے کیلئے کہی تھی میں نے بھی کہا
تھا خط لکھ دیجئے میں بھی خط لکھنے والا ہوں ایک ساتھ روانہ کیا جائیگا
لیکن انکی صحت اچھی نہیں تھی اور میرا بھی صحت بہت خراب اور کثرت مشاغل
کیوجہ سے فرصت نہیں ملی۔ آپکے والدین مکرمین اور آپکے اہلیہ محترمہ
اور آپکے صاحبزادگان بھی سب خیریت سے ہیں اللہ سب کی حیات
دراز کریں اللہم وفقہم لما تحب وترضاہ۔ دیگر عرض یہ ہے کہ
آپنے اپنے والد مکرم کو عمرہ کرانے کی ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپکے اس
ارادہ کو پورا کریں جزاء جزیل عنایت فرماویں آمین۔ احسن کما احسنا
آپ سے اور اخوان کرام قوی امید ہے ہمارے لئے صالحہ طریقہ حرمین کی خدمت کرنیکا
توفیق عنایت فرماویں اور خاتمہ ایمان کیساتھ ہوں اسلئے دعا کا درخواست

—১১

کرتا ہوں۔ آپ سے قوی امید کرتا ہوں کہ مقامات مقدسہ
میں میرے لئے اور میرے اہل وعیال کیلئے دعا فرماوینگے
خداوند کریم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرماویں
شریعت پر چلنے کی اور ہدایت عنایت فرماویں
دیگر عرض یہ ہے کہ۔ تفسیر میں تفسیر کبیر للامام الرازی
وتفسیر آلوسی روح المعانی۔ اور تفسیر الجواہر
للامام الغزالی۔ اگر شروحات الحدیث کے متعلق ہوں
عینی۔ فتح الباری۔ مرقات۔ مسند احمد بن حنبل
دار قطنی۔ بیہقی۔ (فقہ) فتح القدیر۔
مبسوط۔ جامع صغیر جامع کبیر۔ زیادات وغیرہ
تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ وتاریخ ابن جریر
وغیرہ باقی ادب کے متعلق آپ جو پسند فرماویں گے
دیگر عرض یہ ہے کہ ۱۵ / ۳ / ۸۴ کو بھی آپکا ایک مفصل خط
ملا ہے خط پڑھکر خداوند کریم کو شکریہ ادا کیا ہے۔
بھائی صاحب بیماری مؤمن کیلئے یا تو کفارہ ہے
گناہوں کیلئے یا ذریعہ ہے رفع درجات کیلئے۔ صحت کو
غنیمت سمجھکر شکریہ ادا کرنا چاہئے بیماری میں صبر
کرنا چاہئے۔ قبل از ماہ رمضان المبارک بنگلہ دیش
تشریف لائینگے یا نہیں؟ ۔ مولانا الحاج مدثر حسین
صاحب کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے۔ ان سے
بھی دعا کا درخواست کرتا ہوں۔ مدرسہ ۱۶ مارچ کو
تعطیل ہوئی اور ۱۰ اپریل کو کھلے گی میں ۱۳ اپریل کو
سلہٹ آیا ہوں ڈھاکہ میں علاج کی سلسلہ میں رہنگا۔
جناب مولانا حافظ سلیمان ڈھاکہ میں کہیں ایک جگہ میں امامت
کیلئے کوشش کر رہا ہے شاید ہو جائیگا۔ آپکے نہایت میں
بڑا ہمت تعاون کرتا ہے۔ اللہم وفقہ لما تحب وترضاہ۔ میں یہ خط
لکھ دیا تھا مولانا رضوان الکریم جب میرے پاس آیا انہوں نے کہا میں لکھ کر رہا ہوں
پھر انہیں دیدیا میرے لفافہ دار العلوم مولانا صاحب کو دیدیا ہے ورنہ میرا
ارادہ خود روانہ کرونگا۔ الداعی محمد نیاز محمود ۱۴۲۱/۲/۱۶
—

حالات مناسب نہ ہوں تو آپ ڈھاکہ آکر ڈھاکہ میں
علاج کرا دیجئے چونکہ یہاں کی ڈاکٹروں میں بہت بے پرواہی
زیادہ ہوتی ہے ہم یہاں خدمت کیلئے حاضر ہیں۔
اگر کمپنی کی طرف سے اپنے ملازمین کیلئے خصوصی سہولت کی ساتھ
اور ہمارے ڈاکٹروں کی فیس وخرچہ کو موازنہ کر کے
ریاض سے ڈھاکہ آنے جانے میں جو اخراجات ہوتی ہیں موازنہ
کر کے کام کیجئے۔ ڈھاکہ میں علاج کرانے میں سہولت ہوتی ہے
اگر اس قسم سہولت وہاں میسر ہوں اور خرچہ بھی برابر
یا کم ہو تو وہاں علاج کرانا بھی مناسب ہے بعض وجوہ
کے اعتبار سے باقی استخارہ کر کے کام کیجئے۔ دیگر عرض
ڈیڑھ برس سے وجع المفاصل یعنی دونوں گھٹنوں
میں درد کی شکایت ہے۔ اس دفعہ چار جنوری سے ۱۲
جنوری ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا لیکن زیادہ فائدہ معلوم
نہیں ہوتی۔ گھر میں بلقیس کی ماں کی بھی طبیعت
اچھی نہیں ہے۔ آپ حضرات سے دعا کیلئے درخواست
گذار ہوں۔ دیگر عرض یہ ہے کہ مولانا الحاج مدثر حسین
صاحب کے ایک خط رکھا ہے ممکن ہو تو انکو حوالہ کیجئے گا
محترم حافظ سلیمان صاحب بخیر و عافیت آنکے والدین مکرم والا
اور طلبہ بخیریت ہیں اور صاحب زادی بھی خیریت سے ہیں
الداعی محمد نیاز مخدوم مختر لہ: ۲۹/۱/۸۴

نیشنل وقت [illegible] ہے۔ میرے اہلیہ کی معرفت [illegible] معلوم ہوا ہے
کوئی خاص شکایت نہیں ہے مصلحت اچھے ہیں شاید ولادت [illegible]
میں آئی ہے۔ باقی مفصل حالات [illegible] حافظ سلیمان [illegible]
دیکھئے اس سے معلوم ہوا ہوگی۔ میرا [illegible] برس [illegible]
ہے۔ علاج برابر چل رہا ہے لیکن [illegible]
[illegible] فرمائے اللہ اپنے فضل وکرم سے [illegible]
عنایت فرماویں۔ مولانا [illegible] صاحب [illegible]
کی خدمت میں سلام [illegible] عرض ہے آپکے [illegible]
[illegible] بعض [illegible]
[illegible] یہ عرض ہے کہ ریاض میں [illegible]
سے رہنا ممکن ہے شروع رمضان سے پہلے [illegible] سال [illegible]
اندلس بھی مسیر ہوگا۔ اور مالی اعتبار سے بھی [illegible]
اپنے یونیورسٹی کا اساتذہ بھی آپکے خیر خواہ ہیں ضرور [illegible]
ہو سکتی۔ اور سب [illegible] سے کام ختم کرکے بنگلہ دیش [illegible]
یونیورسٹی [illegible] پرنسپل کی عہدہ پر [illegible]
[illegible] یونیورسٹی میں رہنا مناسب سمجھتا ہوں [illegible]
بنگلہ دیش کب آئینگے مطلع فرماویں [illegible]
الداعی محمد نیاز مخدوم ترکستانی ختنی۔
[illegible] اپریل
[illegible] میں حافظ سلیمان صاحب کی [illegible] گیا
معلوم ہوا کہ والد محترم اور آپکے اہلیہ محترمہ اور صاحبزادی
سلمہم اللہ کیساتھ دیش میں تشریف لے گیا ہے ملاقات نہیں
ہو سکا۔ اور سب خیریت کیساتھ مکان تشریف لے گئی اطمینان ہے
[illegible] الداعی محمد نیاز مخدوم غفرلہ۔

جناب محترم و مکرم الحاج مولانا محمد یحییٰ
صاحب جو حفظہ اللہ تعالیٰ عن الآفات والمصائب
والبلیۃ الیٰ ما یتمناہ من المقاصد والمآرب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ مع اہل
وعیال کے بفضلہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں
کی برکت سے خیریت سے ہے۔ خداوند کریم آپ کو
بھی تمام آفات ومصائب وامراض سے محفوظ
فرمادیں آمین دیگر عرض یہ ہے کہ آپکے خط کرسمس میں
آیا اس وقت میں ڈھاکہ میں تھا بذریعہ دستی ڈھاکہ
میں ملا۔ خط پڑھکر مسرت بھی حاصل ہوئی۔ لیکن
آپکے بیماری کی خبر سنکر نہایت مغموم ہوا اور آپکی صحت
عاجلہ وکاملہ کیلئے دعا کیا۔ تازہ مسجد میں بھی میلاد
شریف کے بعد آپکی صحت کیلئے دعا کیا۔ میں ۱۸ر جنوری
[illegible] آیا ہوں ۲۴ر جنوری بعد از عصر ختم خواجہ
گان کیا ۲۵ جنوری بعد از صلوۃ فجر ختم یونس پڑھکر
تمام اساتذہ اور طلبہ ملکر آپکے صحت کیلئے خاص
دعا کیا ہے۔ بھائی صاحب وہاں کی ڈاکٹروں کی
حالت کیسی ہے مریض کی علاج ومعالجہ کیسی کرتی
ہیں مناسب ہوں تو وہاں علاج کرنا مناسب
سمجھیں وہاں علاج کرا دیجئے اور اگر وہاں

بخدمت جناب اخینا فی اللہ مولانا محمد یحییٰ صاحب زید مجدہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ بفضلہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے خیر و عافیت سے ہے۔ خداوند کریم آپ کو بھی خیر و عافیت کیساتھ رکھیں آمین۔ دیگر عرض یہ ہے آپکے خطوط ۱۳/ جنوری کو ملا۔ اور دو عدد پیرہ پان بھی ملا ہے۔ متعلقہ مولوی نورالدین صاحب کیلئے میں نے یہاں پر پرنسپل صاحب کو راضی کر یہاں آنا انکا داخلہ ہو جاتا تاخیر مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔

الحاج مشرف الدین صاحب اور مودن صاحب اور میاں محمد میتھیا صاحب کیخدمت میں سلام مسنون عرض ہے۔ پان کی قیمت بھی فت صوفی صاحب ارسال خدمت ہے۔ (۳۰) آپکا خادم محمد نیاز

$\frac{2}{24}$ ۲ یہاں کی ایصال ثواب کی محفل میں بہت بڑا اجتماع ایوب خان و منعم کی آمد کیوقت جتنا بھیڑ ہوا تھا اس دفعہ زیادہ ہوا ہے۔ الحمدللہ فی الحال طلبہ کو دونوں وقت بھات مل رہا ہے۔ ایک وقت بھات ایک وقت روٹی ملیگا۔ مدرسہ کی مالی حالت میں ترقی معلوم ہوتی ہے۔ امید ہے ۰۰۰ ۳۵ من چاول کا اپیل کیا ہے اس سے زائد ملنے کا امید ہے۔ سلہٹ پچھپائی نواب گنج سے تقریباً ایکہزار اشتہارات طریقہ رغبت کرکے آیا ہے۔ محمد نیاز عفی عنہ ۲ $\frac{2}{24}$

(۲) صوفی صاحب جانے کیوقت بھی ملاقات نہیں کیا۔ یہ خط پان کی قیمت صاحب سے روانہ کرنیکا ارادہ تھا لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہوا۔ میں رمضان میں ادا کردونگا

مذکور سامان کو آپ گھر سے
نکالکر مولانا عبدالرحیم صاحب
سے روانہ کر دیجئے

۳ ساچی پان اور ادرک کے
(ادھا) کیلئے ۵ پانچ روپیہ
دیا ہے جس روز مولوی صاحب
روانہ کرینگے اسی روز پان
بھیجئے - آپکے پاس پان کی روپیہ ہے
اسکو مولانا عبدالرحیم صاحب
کے بعد اور شخص روانہ کیجئے
مولانا عبدالرحیم صاحب کے پاس جو
روپیہ ہے ایک ادرک لینے کے بعد
جو روپیہ بچیگا اسکو ساچی
پان خرید مولانا کی معرفت
روانہ کر دیجئے - محمد ضیاء الدین

۲۴ / ۱۱ / ۴۷

جناب محترم ومکرم الحاج مولانا ابو خالد محمد یحیی صاحب حفظہ اللہ
تعالی عن الآفات والمصائب واوصلہ الی ما یتمناہ من المقاصد والمآرب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد از سلام مسنون عرض یہ ہے کہ بندہ خیریت سے ہے اور
آپ لوگوں کی خیر و عافیت خداوند کریم سے مطلوب ہیں آمین۔
دیگر عرض یہ ہے کہ آپکا ایک مکتوب گرامی ۱۱/ اگست کو موصول ہوا
اسوقت ایک طرف مدرسہ میں درس تدریس اور آئندہ کل ۱۲ جولائی
کو ڈھاکہ جانا ہے ایجوکیشن بورڈ سے پرچے لینا ہے اور جلد ممکن
ہونے کے امتحان سے ممتحنین حضرات کیلئے پرچے تقسیم کرنا اور انکو کچھ
پرچے دیکھنے کے متعلق کچھ کہنا ہوگا۔ اور ممتحنین کیلئے ہدایات
بھی لکھنا ہوگا۔ اسوقت میرے ذہن میں جو جتنا یاد تھا اسمیں سے
کچھ لکھکر روانہ کر دیا ہے ڈھاکہ میرے پاس کتاب نہیں ہے
اسوقت کتاب مطالعہ کرنیکا بھی فرصت نہیں ہے۔
انا ابن الذبیحتین ایک نبی کریم کے والد عبد اللہ ہے۔ اسکا
تفصیل ذکر کا مأخذ میں مذکور ہیں دوسرے ذبیح سے مراد
اسماعیل علیہ السلام ہے تفصیل ذکر کا مأخذ میں مذکور
ہے ہاں اسماعیل علیہ السلام کے قصہ معروف ہے اسوقت
بیحد پریشانی ہے ڈھاکہ تمہید نمبرہ کتابیں تلاش کرنے
کی فرصت بھی نہیں ہے ڈھاکہ کتاب نہیں ہے۔

اسوقت خط کو اور مختصر جواب کو مولانا حافظ
سلیمان صاحب کو حوالہ کر دیا دوسری
تفصیلی خط دوسرے مولانا صاحب سے لکھوا دیا تھا کچھ
تحریر میں خامی ہے تو میں حافظ صاحب کو بتا دیا ہے

এক নজরে আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র.-এর পাঠদান পদ্ধতি

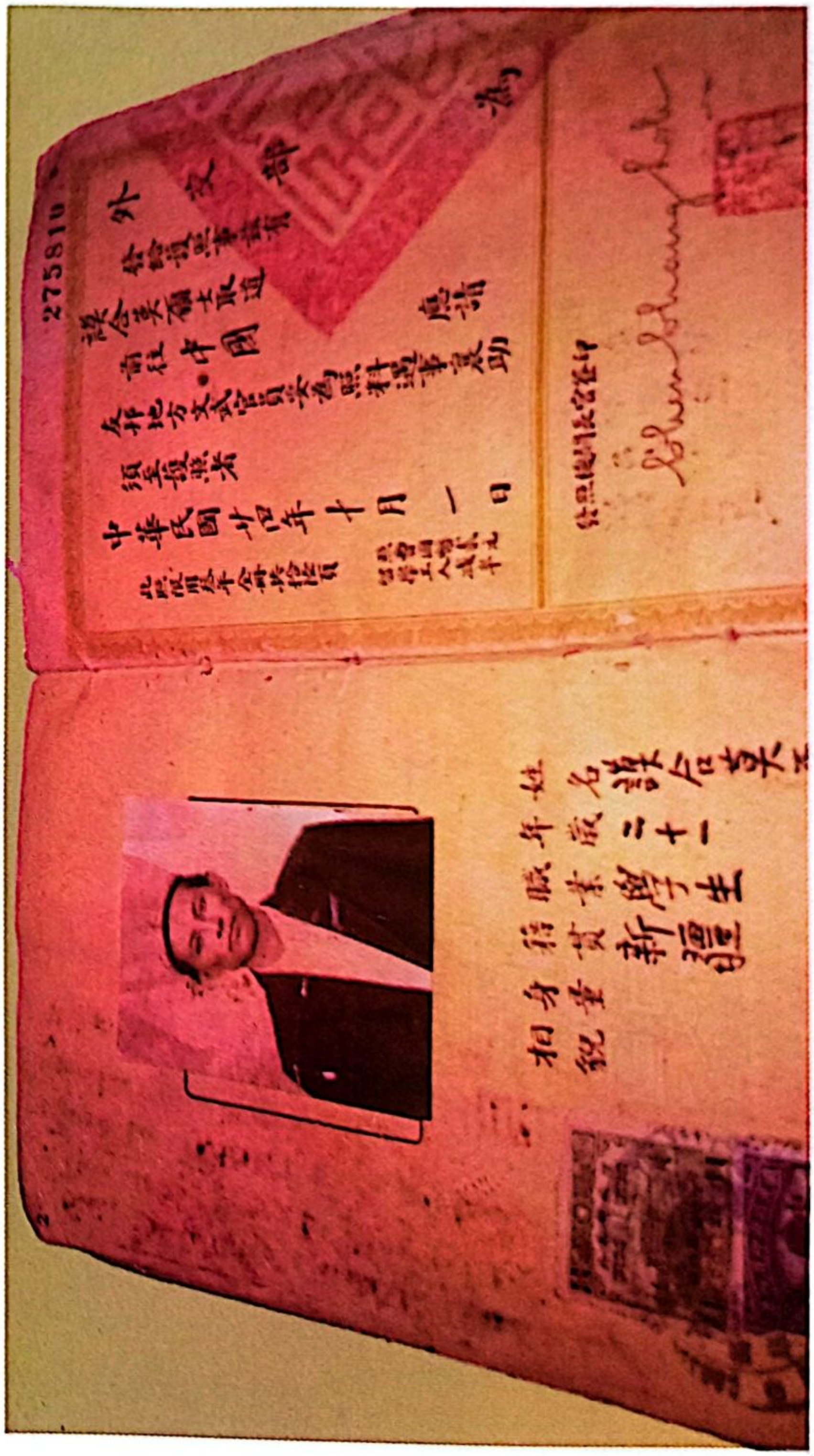
- তিনি সাধারণত বুখারী শরীফ পড়াতেন।
- বিনা মুতালায়ায় কিতাব পড়াতেন না। এমনকি জীবনে একটি ঘণ্টাও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পড়াননি।
- সর্বদা সময়মত ক্লাশে যেতেন।
- নিয়মিত দীর্ঘ রাত পর্যন্ত মুতালায়া করতেন।
- মুতালায়ার জন্য সব ধরনের হাদীছের কিতাব দেখতেন।
- তাঁর দরসে হাদীছের পদ্ধতি ছিল ছাত্রদেরকে ইবারত পড়তে বলা।
- ইবারত পড়ার সময় 'রাদিয়াল্লাহু আনহু', 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' ও 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ইত্যাদি পড়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। ছাত্ররা ভুলে না পড়লে তিনি রাগ করতেন এবং ভবিষ্যতে ভুল না করার উপদেশ দিতেন।
- ইবারতে ভুল করলে নাহু ছরফের নিয়ম উল্লেখ করে তিনি তা শুধরে দিতেন।
- হাদীছের আদব রক্ষার্থে ক্লাসে পিনপতন নীরবতার জন্য গুরুত্বারোপ করতেন।
- প্রতিটি ক্লাশে সর্বপ্রথম তিনি নিয়্যতের হাদীস দ্বারা শুরু করতেন।
- এলোপাতাড়ি তাকরীর করতেন না; বরং তার তাকরীর ছিল সুবিন্যস্ত।
- হাদীছের ইবারত পাঠ শেষ হলে তিনি প্রথমত সনদ নিয়ে আলোচনা করতেন। এক্ষেত্রে রাবীদের জীবনী, খাসায়েস বলতেন, তারপর মতনের দিকে দৃষ্টি দিতেন।
- বিনা প্রয়োজনে এক কথা দু'বার বলতেন না।
- মতনের ব্যাখ্যায় প্রথমত হাদীছের তরজমা বলতেন।
- পরে হাদীছের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ পেশ করতেন।
- ঐতিহাসিক ঘটনা থাকলে তা উল্লেখ করতেন।

- তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীছের মুনাসাবাত অবশ্যই উল্লেখ করতেন।
- একটি হাদীছ পড়াতে গিয়ে তার ব্যাখ্যার অন্যান্য কিতাবের অসংখ্য হাদীছ উল্লেখ করতেন এবং তা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ বলে দিতেন।
- হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনে বিজ্ঞান, দর্শন, বায়োলজী, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতেন।
- কোন হাদীছ থেকে কী মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয়েছে তা বর্ণনা করতেন।
- ফিকহী মাসয়ালায় ইমামদের মতামত দলীলসহ উল্লেখ করতেন এবং সবশেষে হানাফীদের পক্ষ থেকে পূর্বোক্ত দলীলসমূহের জবাব দিয়ে হানাফীদের দলীল উল্লেখ করত তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতেন।
- অন্য মাজহাবের মত বর্ণনার সময় শালীন ভাষা ব্যবহার করতেন এবং ইমামদের নাম অত্যন্ত আদবের সাথে ছিফাতসহ উল্লেখ করতেন।
- কোন কথা পুনরোল্লেখ করা ছাড়াই কোন কোন হাদীছের ব্যাখ্যা (বিশেষ করে নিয়্যাতের হাদীছ) একাধারে তিন মাস পর্যন্ত করতেন।
- নিজে দৈনিক তেলাওয়াত করে করে বহুবার তিনি বুখারী শরীফ খতম করেছেন।

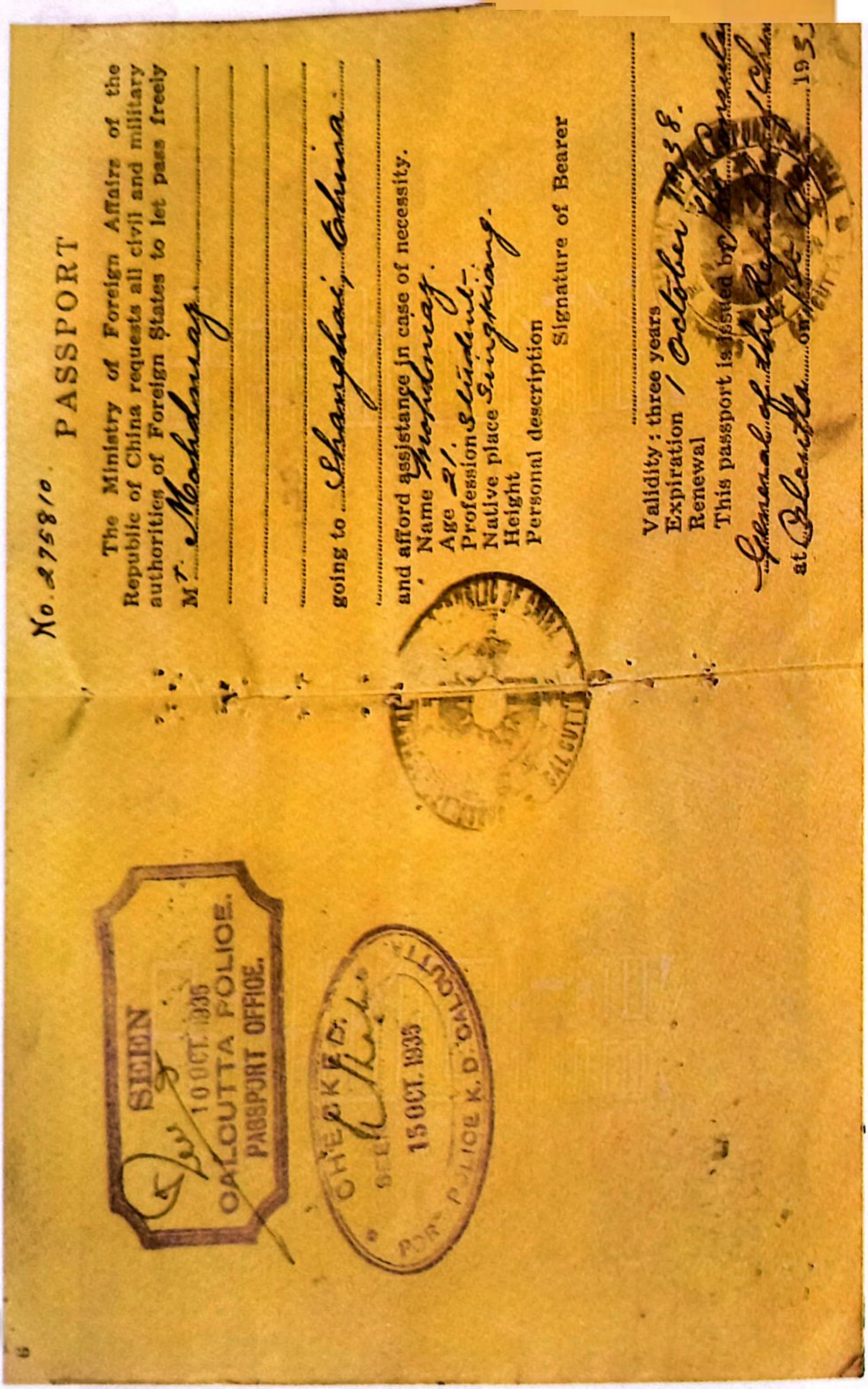
–মুহাম্মদ মাকছুদুল হক

"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির চেহারাকে (কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে মুখস্থ করে, অতঃপর তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।" (আল হাদীছ)

আল্লামা খোতানী র. এর স্মৃতিবিজড়িত কিছু ছবি



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর স্বদেশী পাসপোর্টের একাংশ।
ভারতবর্ষে হিযরতকালে এটি তাঁর সাথে ছিল।


No. 275810 PASSPORT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China requests all civil and military authorities of Foreign States to let pass freely

Mr. Mohdniaz

going to Shanghai, China.

and afford assistance in case of necessity.

Name Mohdniaz.

Age 21.

Profession Student

Native place Sinkiang.

Height

Personal description

Signature of Bearer

Validity: three years

Expiration 1 October 1938.

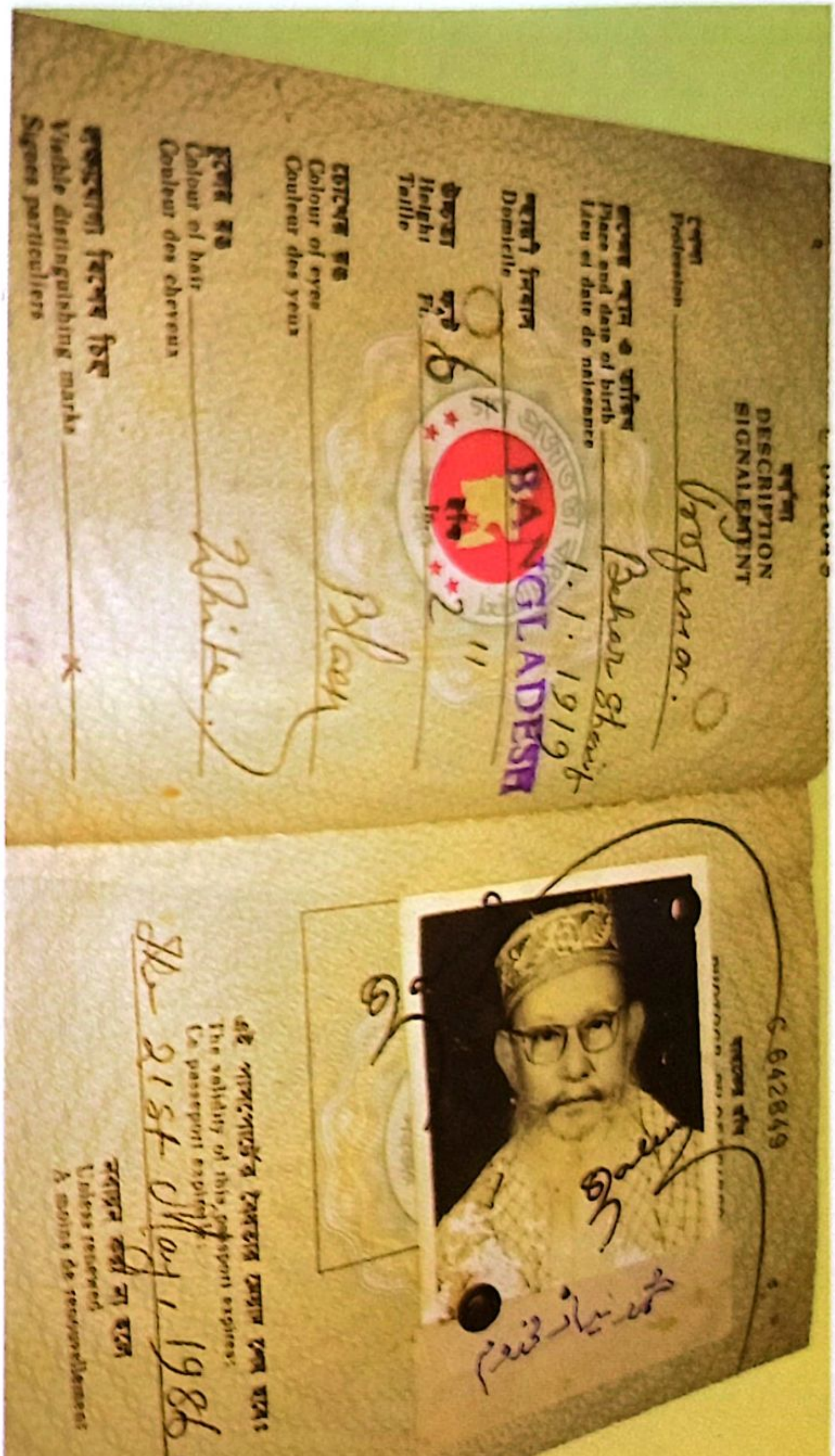
Renewal

This passport is issued by the Consul General of the Republic of China at Calcutta on .... 193..

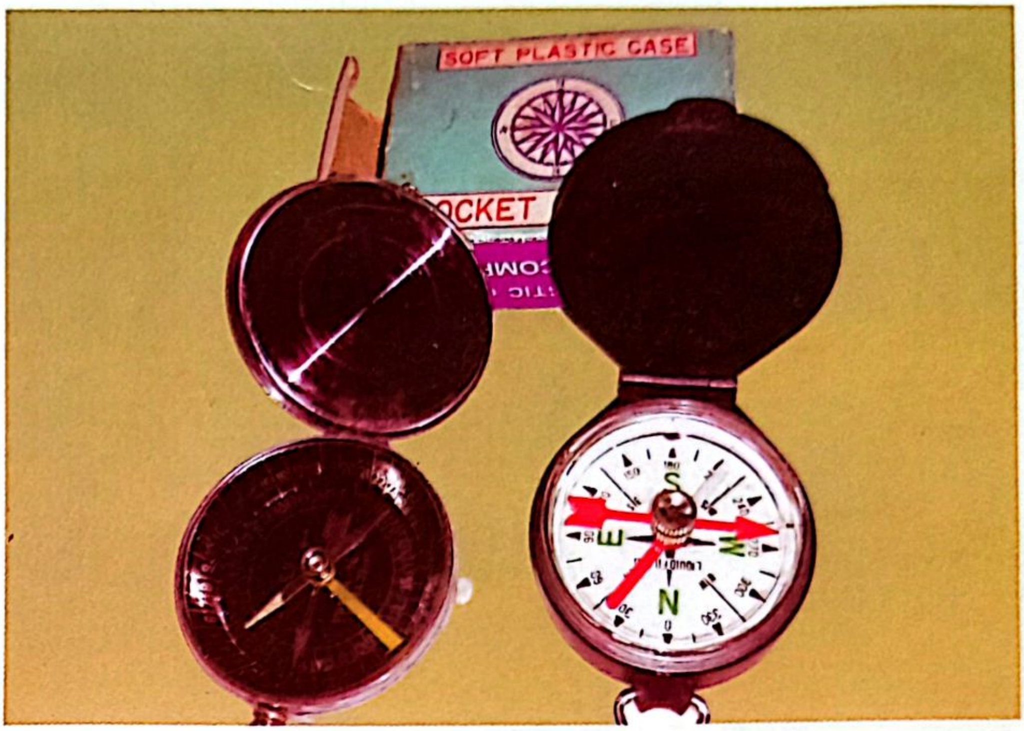
SEEN
10 OCT. 1935
CALCUTTA POLICE.
PASSPORT OFFICE.

CHECKED
SEEN
15 OCT. 1935
PORT POLICE K.D. CALCUTTA

আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর স্বদেশী পাসপোর্টের একাংশ।
ভারতবর্ষে হিযরতকালে এটি তাঁর সাথে ছিল।



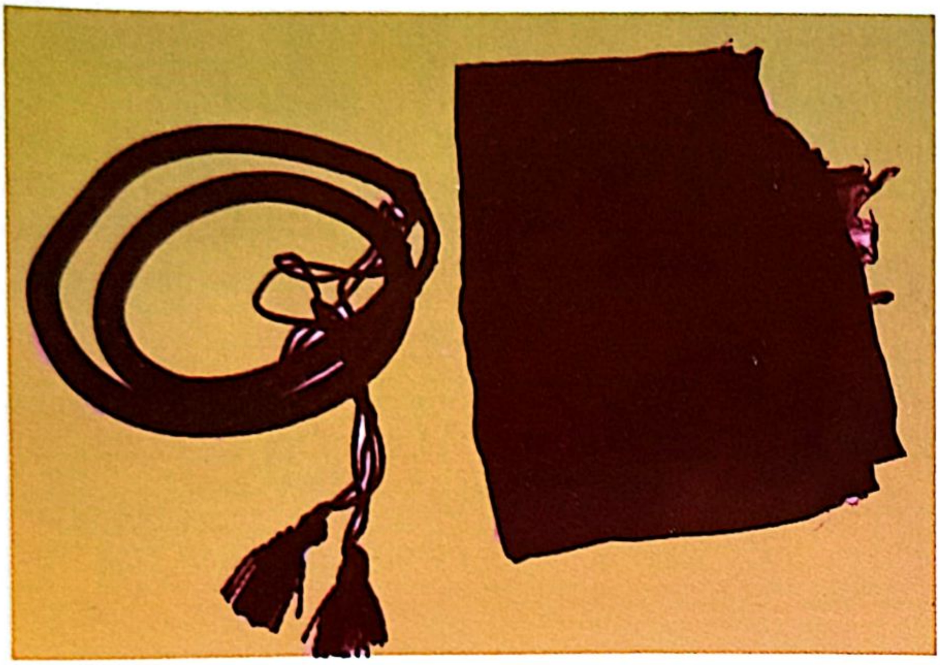
আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর একটি পাসপোর্ট।
উমরা ও বাগদাদ সফরের উদ্দেশে তিনি এ পাসপোর্ট তৈরি করেন।



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ব্যবহারকৃত দুটি কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র। এগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্ণয় করে নামাযের কেবলা ঠিক করতেন।



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ব্যবহারকৃত রেডিও। এর মাধ্যমে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ শুনতেন।



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ব্যবহারকৃত পাগড়ি ও বেরুয়া। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ অধিকাংশ সময় তিনি উক্ত পাগড়ি ব্যবহার করতেন



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. এর ব্যবহারকৃত চশমা ও রুমাল। এই চশমা পড়ে তিনি হাদীসের দরস দিতেন এবং প্রয়োজন হলে রুমাল ব্যবহার করতেন।



আল্লামা নিয়ায মাখদূম খোতানী র. ভবন। আল্লামা খোতানী র. এর স্মৃতির উদ্দেশে দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসায় এ ভবন নির্মিত হয়েছে। এখানে ইলমে হাদীসের দরস প্রদান করা হয়।



আল্লামা খোতানী র. এর মাযার শরীফ। আজিমপুর নতুন কবরস্থানের এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।